নৈতিকতার ক্ষেত্রে যুক্তি ও আবেগের ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের

অধীনে পি.এইচ.ডি. উপাধির শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অপর্ণা সাধু

দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়

প্রফেসর দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৭

Certified that the Thesis entitled

নৈতিকতার ক্ষেত্রে যুক্তি ও আবেগের ভূমিকা

(Naitikatar Kshetre Jukti O Abeger Bhumika)

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Aparajita Mukhopadhyay,

Professor, Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata

and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor

Dated :

Candidate

Dated:

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৭
প্রথম অধ্যায়	
নৈতিকতায় বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার : বিভিন্ন দার্শনিক অভিমত	৮-৫৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
নৈতিক আদর্শ : ব্যক্তিনিরপেক্ষ না ব্যক্তিসাপেক্ষ?	৫৮-১০১
তৃতীয় অধ্যায়	
নৈতিক কর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়	১০২-১৪০
চতুর্থ অধ্যায়	
আবেগ গ্রহণীয় না বর্জনীয়?	১৪১-১৭৩
পঞ্চম অধ্যায়	
আবেগের নৈতিক মূল্য	১৭৪-২২২
সিদ্ধান্ত	২২৩-২৪১
গ্রন্থপঞ্জি	২৪২-২৫৪

মুখবন্ধ

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের লক্ষ্যই হলো বুদ্ধি অনুসারে কর্ম পালন করা। একইভাবে নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রেও আমরা বুদ্ধির পথ অনুসারে কর্ম পালন করাকেই যথাযথ বলে মনে করি। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যাতেও লক্ষ্য করা যায় নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকেই মাধ্যমরূপে গণ্য করার প্রবণতা। আমরা বুদ্ধির আধিপত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে চাই কারণ আমরা ন্যায়ের পথ অনুসরণ করাকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক সময় মনে হয় এককভাবে বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তি মনের বিশেষত্বগুলি সিদ্ধান্তের মধ্যেই প্রতিফলিত হলে তবেই মানসিক তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হয়। সেকারণেই আমার মনে হয়েছিল পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমরূপে আবেগকে বর্জন করে বুদ্ধিকে স্বীকৃতি দানের মনোভাবটি বিচার করা প্রয়োজন। এ কারণেই আমি এই বিষয়টি আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছি। অধ্যাপনা করার সময় এ্যারিস্টটল এবং ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক মতবাদের মধ্যে মতপার্থক্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। এই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আমি আমার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করি।

নবীন গবেষকরূপে আমাকে গবেষণার অঙ্গনে প্রবেশের সুচারু পথের অনুসন্ধান দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন। তথ্যসূত্র তাত্ত্বিকীকরণ করতে, অনুসন্ধানমূলক মানসিকতার অন্তর্গঠন করতে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, যুক্তিসংগত পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপদেশ আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি গবেষণা পত্রের প্রতিটি অধ্যায়ের, তথ্যসূত্রগুলির ত্রুটি সংশোধন করে এবং সংযোজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করেছেন। আমার এই কাজে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সস্নেহে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে বাসন্তী দেবী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ড. মৈত্রেয়ী বর্ধন রায়, ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীমতি মুখার্জী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা রুমা ঘোষ দস্তিদার, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক পলাশ মণ্ডল গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়ে

আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গার্গী গোস্বামী আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন, তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার কাজে যে সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতায় উপকৃত হয়েছি, তা হলো কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, যাদুবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের গ্রন্থাগার, বাসন্তী দেবী কলেজের গ্রন্থাগার, লক্ষ্ণৌ আই. সি. পি. আর গ্রন্থাগার— এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁদের সহযোগিতায় এই গবেষণার কাজ শেষ করতে পেরেছি।

দীর্ঘ পাঁচ বছর এই কাজে মনোবল ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার বাবা আশুতোষ সাধু ও মা শান্তা সাধু। তাঁদের প্রেরণা ছাড়া এই কাজ শুরু ও শেষ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। আমার দিদি সুপর্ণা সাধু, বোন ঝর্ণা সাধু, এবং আমার স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ সমাদ্দার আমাকে সবসময় উৎসাহিত করেছে। আমার পাশে সদাসর্বদা থেকে আমায় মনোবল জুগিয়েছে ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার এই গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আমার মেয়ে মামের (শ্রীপর্ণা সমাদ্দার) প্রতি একটু অবহেলা করেছি, কিন্তু ও সবসময় আমার পাশে থেকে উৎসাহ দিয়ে আমার এই গবেষণার কাজ শেষ করতে সাহায্য করেছে, ওর জীবনের সাফল্য কামনা করি।

পরিশেষে আমার এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত সকল অনুপ্রেরণাকারী ব্যক্তিবর্গকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ঢাকুরিয়া
কলিকাতা-৩১
২০১৭

(অপর্ণা সাধু)

ভূমিকা

আমাদের কর্তব্যগুলি আমরা কীভাবে নির্ধারণ করি? কর্মগুলিকে কি ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় বলে শ্রেণীকরণ করা যায়? কর্মগুলির কি নিজস্ব কোন শক্তি থাকে যা তার ন্যায্যতাকে প্রতিপন্ন করে? সে কারণেই কি এগুলি সর্বজনগ্রাহ্য হয়? যদি তা না হয় তবে আমরা নিজ নিজ কর্তব্যগুলি নির্বাচন করি ব্যক্তিসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমাদের স্বীকার করতে হবে কর্মগুলি ন্যায্য বা অন্যায্য হয় না, ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিস্থিতি কর্মটির ন্যায্যতার নির্ধারক হয়। কর্তব্য নির্ণয়ের পদ্ধতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে এরূপ পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। একদল দার্শনিকেরা মনে করেন, যখন আমরা যুক্তি প্রয়োগ করে আচরণের মূল্য বিচার করি তখন সেই যুক্তিটি নিঃসৃত হয় আমাদের মনে উপস্থিত মূল নৈতিক কাঠামো থেকে। এই নৈতিক কাঠামো কতকগুলি নিয়ম প্রদান করে, যার ভিত্তিতে আমরা নিরপেক্ষ যুক্তি প্রদানে সমর্থ হই। দার্শনিকেরা মনে করেন, এই নৈতিক কাঠামো ব্যতীত নৈতিক যুক্তি গঠন করা সম্ভবই হয় না, যেহেতু এই কাঠামোটিই যুক্তির আকার নির্ধারণ করে। নৈতিক অবধারণগুলি সে কারণেই কোন ব্যক্তিগত পছন্দকে প্রকাশ করে না, বরং এটি একটি বিচারমূলক বৌদ্ধিক পদ্ধতি অনুসারে গঠিত সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। এই নৈতিক যুক্তি দুটি নিয়মকে অনুসরণ করে, যেগুলি আবার নৈতিক অবধারণের প্রকৃতিকেও স্পষ্ট করে। এই নিয়ম দুটির কারণে নৈতিক যুক্তি প্রথমত নির্দেশমূলক হয় এবং দ্বিতীয়ত সর্বজনীন হয়। যখন আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য যুক্তি প্রয়োগ করি তখন তার দ্বারা যে কর্মটি নির্ধারিত হয় সেটি অবশ্যই আদেশরূপে গ্রহণীয়, যেহেতু সেটি আমাদের নৈতিক কাঠামো থেকে নিঃসৃত। আবার যে কর্মটিকে আমরা আদেশ বলে গণ্য করি সেটি একই পরিস্থিতিতে সকলের নিকট আদেশ বলে গ্রাহ্য হবে—এমন প্রত্যাশা আমাদের থাকে। সর্বজনীন বলে স্বীকার না করতে পারলে সেটিকে আমরা কর্তব্য বলেও স্বীকার করি না। যখন আমরা যুক্তি প্রদান করি তখন ঐ যুক্তি নিঃসৃত সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অবশ্যপালনীয় বলে প্রতীত হয়। দার্শনিকেরা যখন নৈতিকতাকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁরা মনে করেন, বুদ্ধিই সেটির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে এবং সেজন্যই সেটিকে সত্য বলে মনে করেন। তাঁরা নৈতিক নিয়মগুলিকে সম্পূর্ণ ন্যায্য, আদর্শমূলক এবং স্বয়ংসিদ্ধ বলে গ্রহণ করেন। এটির আদর্শমূলক মূল্য সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত বলেই যুক্তি নিঃসৃত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করার কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। এ কারণেই আমরা যুক্তি নিঃসৃত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে বাধ্য থাকি। রবার্ট নজিকের মতে, "… arguments so powerful they set up reverberations in the brain: if the person refuses to accept the conclusion, he *dies*." [১]

অন্য দার্শনিক মত অনুসারে, যখন আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ণয় করি তখন আমাদের কর্তব্য কী হওয়া *উচিত* আমরা সেটিকে বিচার করি। ফলে মূল্য নির্ধারক অবধারণ—যা আমাদের কর্মকে ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় বলে বিচার করে সেটি বর্ণনাত্মক বচন থেকে পৃথক। কারণ বর্ণনাত্মক বচনগুলি জগতনিরপেক্ষ নয় বলে সেগুলি সত্য বা মিথ্যা হয়। জাগতিক ঘটনা মূল্যাবধারক বচনগুলির সত্যতা নির্ধারণ করতে পারে না। এই অবধারণগুলি ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে। এই দার্শনিক মত অনুসারে, নৈতিক অবধারণগুলি পরিস্থিতিনিরপেক্ষ নয়। সমাজে বর্তমান বিভিন্ন সম্পর্ক যেহেতু বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রতিফলিত হয়, তাই এই সকল সম্পর্কগুলির প্রতিফলন সামাজিক জীবরূপে আমাদের কর্মের নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা কাম্য। আবার যে নৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা নীতিগুলি প্রয়োগ করি, সেই পরিস্থিতিগুলি সর্বদা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কজনিত হয় না, বহুপাক্ষিক হয়। ফলে অবধারণগুলি আবশ্যক এবং সর্বজনীন হবে—এমন দাবি অনেকেই স্বীকার করেন না। ব্যক্তি সামাজিকজীবরূপে কতগুলি কর্তব্য পালন করে, যে কর্তব্যগুলি পালন করতে ব্যর্থ হলে সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তাই ব্যক্তির কর্তব্য কোন সর্বজনীন নিয়মের দ্বারা নয়, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান অনুসারে এবং সেই পদমর্যাদার প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হয়। সিদ্ধান্ত ব্যক্তির ভূমিকা অনুসারে নির্ধারিত হয় বলেই অবধারণগুলি আবশ্যক ও সত্য হবে বলে অনেকেই স্বীকার করেন না। এই অবধারণগুলি যে সকল নিয়ম থেকে নিঃসৃত হয় সেই নিয়মও তাই সমাজ এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে না। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনভিত্তিক নিয়মের দ্বারাই বাস্তবজীবনে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ওয়েস্টারমার্কের মতে, "I am not aware of any moral principle that could be said to be truly self evident."[২]

কর্তব্যকর্ম পালনের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিনিরপেক্ষ হবে, না ব্যক্তিসাপেক্ষ হবে; নৈতিক অবধারণ গঠন করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিনিঃসৃত নীতি অনুসরণ করাই কর্তব্য বলে গণ্য হবে, নাকি ব্যক্তিসাপেক্ষতা সেক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে—তা অন্বেষণ করাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য। আমার আলোচনার মূল বিষয় হলো নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষতা ও ব্যক্তিসাপেক্ষতা। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় আমার আলোচনার বিষয় হলো নৈতিক অবধারণ গঠনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং আবেগের ভূমিকা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। কারণ ব্যক্তিনিরপেক্ষবাদী দার্শনিকেরা বুদ্ধিকে গুরুত্ব দানের সাথে সাথেই আবেগকে বর্জন করার পক্ষপাতী। বিপরীতপক্ষে, ব্যক্তিসাপেক্ষতায় বিশ্বাসী নীতিদার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের ব্যবহারকে কাম্য বলে মনে করেছেন। এই আলোচনায় আমি প্রধানত সেই সকল দার্শনিকদের মতামত উল্লেখ করেছি যাঁরা ব্যক্তির

মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তির মন, ইচ্ছা, প্রবণতা—ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সদ্‌গুণবাদী দার্শনিকদের মতই আমার আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। এঁদের পূর্বপক্ষরূপে কর্তব্যবাদী নীতিদার্শনিকদের মধ্যে প্রধানত জন স্টুয়ার্ট মিল এবং কান্টের বক্তব্যকেই গ্রহণ করেছি। তার কারণ হলো সদ্‌গুণবাদী দার্শনিকেরা কর্তব্যবাদী দার্শনিকদেরই তাঁদের পূর্বপক্ষ বলে মনে করেন। রোসালিণ্ড হার্স্টহাউস বলেছেন, "Virtue Ethics is now quite widely recognized as at least a possible rival to deontological and utilitarian theories." [৩]

পাশ্চাত্য নীতিতত্ত্বগুলি ব্যক্তি এবং তার কৃত কর্মের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বুদ্ধি নির্দেশিত পথ অনুসরণই কেবলমাত্র যথাযথ কিনা, আবেগের সেক্ষেত্রে ভূমিকা কী—এ বিষয়ে বিবিধ মনোভাব ব্যক্ত করেছে। গ্রীক দর্শনে সুষ্ঠুভাবে নৈতিক আলোচনার সূচনা হলেও, তার পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা যে নৈতিক আলোচনাকে একেবারে উপেক্ষা করেছেন—এমন নয়। তাঁরাও নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে আমি প্রাক্-সক্রেটিক যুগ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িককাল পর্যন্ত্য নৈতিকতায় বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকেরা কীরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন সে বিষয়েই আলোচনা করেছি। আমার গবেষণাপত্রে আমি মূলত কর্তব্যবাদ এবং আবেগ ও বুদ্ধির ভূমিকাকে গুরুত্বপ্রদানকারী বর্তমানকালের দার্শনিকদের মতের আলোচনা করলেও, প্রাক—গ্রীকযুগ থেকে বর্তমানকালীন যুগ পর্যন্ত্য এই বিষয়ক ইতিহাসকে পর্যালোচনা না করলে আমার মনে হয়েছে আমার গবেষণা অসম্পূর্ণ থাকবে। সে কারণে আমি প্রথম অধ্যায়ে পাশ্চাত্য নৈতিক ইতিহাস আলোচনা করেছি। এই বিষয় আলোচনার জন্য মূলত পাঁচটি সময়কালের দার্শনিক মতকে বোঝার চেষ্টা করেছি। প্রাক-সক্রেটিক যুগ (৪৩০ বি.সি), ২) সক্রেটিক—প্লেটোনিক—এ্যারিস্টটলীয় যুগ (৩২২ বি. সি), ৩) মধ্যযুগ (১১০০ এ. ডি—১৬০০ এ. ডি), ৪) আধুনিক যুগ (১৬৮০-১৭৮৯), এবং ৫) সমসাময়িক যুগ (বিংশ শতাব্দী)। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সামাজিক পরিকাঠামো থাকার ফলে এই সকল দার্শনিকদের মতের মধ্যে বহু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নৈতিক আচরণ নির্ধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি বলেই আমি এই সকল দার্শনিকদের সময়কাল অনুসারে বিভাজন না করে, আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের নিরিখে বিভাজন করেছি। আমার আলোচনার সুবিধার্থে এই সকল দার্শনিকদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি। যাঁরা ঈশ্বরের আলোচনাকে নৈতিক আলোচনার সাথে যুক্ত করেছেন তাঁদের মত প্রথমে আলোচনা করেছি। এরপর আমি সেই সকল দার্শনিকদের কথা বলেছি যাঁরা নৈতিকতাকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত করেননি। তবে

এই সকল দার্শনিকদেরকেও আমি দুটিভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। প্রথম অংশে রেখেছি সেই সকল দার্শনিক অভিমত যাঁরা ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে নৈতিক আলোচনা থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী এবং পরবর্তী অংশে আমি সেই সকল দার্শনিকদের মতামত আলোচনা করেছি যাঁরা আচরণকে ব্যক্তির প্রভাব মুক্ত বলেননি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নৈতিক আদর্শ ব্যক্তিনিরপেক্ষ না ব্যক্তিসাপেক্ষ—এই বিষয়ে আলোকপাত করেছি। নৈতিক কর্ম সম্পাদন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শ উপস্থিত থাকা আমরা জরুরী বলে মনে করি—যার আলোকে আমরা আমাদের কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হই। আমাদের আচরণগুলিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী করার জন্য, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যক্তির আচরণ একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে হওয়াই কাম্য। একটি মানদণ্ড বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তির আচরণকে সেই আদর্শের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, সকল ব্যক্তির আচরণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা। সে কারণে প্রচলিত নীতিতত্ত্বগুলি কোন একটি নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়—যা আমাদের দৈনন্দিন নৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই আদর্শের উৎস কি? এটি কিভাবে নির্ধারিত হয়? এটি কি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বুদ্ধি নির্দেশিত, অপরিবর্তিত ধারণা, না ব্যক্তির মানসিকতা, আবেগ, প্রবণতা, সামাজিক পরিস্থিতির শর্তাবলি দ্বারা নির্ণীত একটি পরিবর্তনশীল মানদণ্ড? নৈতিকতা বিষয়গত না ব্যক্তিসাপেক্ষ—এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই পাশ্চাত্য নীতিতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে আমার উদ্দেশ্য হলো নৈতিক আদর্শ গঠনে বুদ্ধির ভূমিকা এবং আবেগের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের অভিমত আলোচনা করা। এই অধ্যায়টিকেও আমি দুটি অংশে ভাগ করেছি। প্রথমে যে সকল নীতিদার্শনিকেরা আদর্শ ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলে দাবি করেছেন তাঁদের মতবাদ আলোচনা করেছি। এই সকল দার্শনিকেরা আদর্শকে বুদ্ধি নির্ভর, যুক্তি দ্বারা গঠিত একটি স্থায়ী, সর্বজনীন মানদণ্ড বলে গণ্য করেছেন। দ্বিতীয় অংশে আদর্শ ব্যক্তিসাপেক্ষ—এমন দাবি করেন যাঁরা তাঁদের মত উল্লেখ করেছি।

নৈতিক বিচারের পশ্চাৎপটে কতকগুলি নৈতিক ধারণা, একটি মানদণ্ড বা আদর্শ উপস্থিত থাকে যার নিরিখে আমাদের বিচার ক্রিয়া চালিত হয়। কিন্তু আদর্শকে স্বীকৃতি দানের সাথে সাথেই কি তার প্রতি বাধ্যতাবোধের ধারণা যুক্ত হয়ে থাকে? এই বাধ্যতাবোধের স্বরূপ কি? আদর্শটি ব্যক্তিসাপেক্ষ অথবা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হওয়ার কারণে কি বাধ্যতাবোধের প্রকৃতিও ভিন্ন হয়ে যায়? এই বাধ্যতাবোধের প্রকৃতি বিষয়ে আমি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কারণ আদর্শটি যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে নির্ধারিত হয় তবে আমরা

সেই অনুসারে কর্ম পালনের জন্য যে জাতীয় বাধ্যতাবোধ অনুভব করি এবং আদর্শটি ব্যক্তিসাপেক্ষ হলে সেটি অনুসরণের জন্য যেরূপ মনোভাব বা বাধ্যতাবোধ আমাদের মনে জাগ্রত হয়, সে দুটি কি সমপ্রকৃতির হয়? যদি আদর্শের ব্যক্তিসাপেক্ষতা অথবা ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বাধ্যতাবোধের ধারণাটিকে কোনভাবেই প্রভাবিত না করতে পারে তাহলে বলতে হয় কর্মপালনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু যদি আদর্শের উৎসটি ভিন্ন হওয়ার কারণে বাধ্যতাবোধের প্রকৃতি ভিন্ন হয় এবং আমাদের কর্ম পালনের বা কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ভিন্নতা দেখা যায়, তবে ব্যক্তিসাপেক্ষতা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সৃষ্টি করে — একথা মানতে হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ম পালনের সময় আদর্শটি অনুসরণের বাধ্যতাবোধেই কর্ম করছি, না কি অন্তরের বাধ্যতাবোধ অনুভব করছি—এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি। আমি এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতায় বিশ্বাসী দার্শনিকদের কথা আলোচনা করেছি এবং তারই বিপরীত মতবাদরূপে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের মত আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অংশে।

আবেগ চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী, ব্যক্তিসাপেক্ষ, বিচারবিযুক্ত হওয়ায় নৈতিক ক্ষেত্রে তার অন্তর্ভুক্তি সর্বজনীনতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হবে—এমন দাবি নৈতিকতার ইতিহাসে অতি পরিচিত। রাগ, ভালোবাসা –এই আবেগগুলির ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যুক্তিবিচার বর্জিত হয়। আবেগসঞ্জাত সিদ্ধান্ত ব্যক্তির ক্ষণিক মানসিক অবস্থার প্রতিফলন হওয়ায় ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্তে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং আবেগের প্রয়োগে গঠিত সিদ্ধান্ত সঠিক, সার্বিক, সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত বলে গ্রাহ্য না হওয়ায় নৈতিকতার গণ্ডী থেকে আবেগকে সম্পূর্নভাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা। চতুর্থ অধ্যায়ে আমি কর্তব্যনিষ্ঠ নীতিদার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগকে কোন কারণে সমালোচনা করেছেন সেটি বিশ্লেষণ করেছি এবং তার যৌক্তিকতা বিচার করেছি। এই অধ্যায়টিকেও আমি দুটি অংশে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশে কর্তব্যবাদী দার্শনিকদের আবেগের বিপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি এবং দ্বিতীয় অংশে আবেগের সমর্থনকারী নীতিদার্শনিকদের মনোভাব আলোচনা করেছি। আবেগের সমর্থক নীতিদার্শনিকেরা মনে করেন, কর্মকর্তা যে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক সত্তাবিশিষ্ট নয়, আবেগও তার আচরণকে প্রভাবিত করে—একথা স্বীকার করতে হবে। তাঁদের মতে, নীতিসর্বস্বতা কখনো নৈতিকতার মাপকাঠি হতে পারে না। এই অংশে আমি কর্তব্যভিত্তিক মতবাদের দুর্বলতা প্রসঙ্গে আলোচনা করে নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকাটি স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি।

দার্শনিকদের মধ্যে আবেগের ব্যবহার বিষয়ে যে বিরোধিতা লক্ষ্য করেছি তার থেকে আমার মনে হয়েছে আবেগের প্রকৃতি বিষয়ে তাঁদের মনোভাবের পার্থক্যের কারণেই এই বিরোধিতা উৎপন্ন হয়েছে। আবেগকে যখন আমরা নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি তখন আবেগের প্রকৃতিটিকে স্পষ্ট করার প্রয়োজন। আবেগের সমর্থনকারী দার্শনিকদের মতে, আবেগ নিছক অনুভূতি নয়। আবেগ হলো বিষয়বস্তুর স্পষ্টীকরণ, অনুভূতি এবং সচেতনতার মিলিত রূপ। অর্থাৎ আবেগের কোন বিষয়বস্তু নেই—এমন নয়। কোন বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা, সেই বস্তু সম্পর্কে অনুভূতিবোধ, অর্থাৎ তাকে গ্রহণ করা বা বর্জন অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি সম্পর্কে সচেতনতাই হলো আবেগ। এখানে সচেতনতা হলো মঙ্গলময় বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা। ফলে আবেগ নিছক অন্ধ, সংকীর্ণ স্বার্থবোধক কোন বিষয় নয়। নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আবেগ যুক্তি দ্বারা চালিত নৈতিক আবেগ। পঞ্চম অধ্যায়ে আমি আবেগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সেগুলি আমাদের নৈতিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে—তা আলোচনা করেছি। তিনভাগে আমার আলোচনাকে বিভক্ত করেছি। প্রথমভাগে দেখেছি আবেগ আমাদের নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক। দ্বিতীয়ভাগে দেখিয়েছি চরিত্রে প্রবণতারূপে সৎ আবেগগুলি আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে অর্থাৎ আবেগ প্রেষণাশক্তিরূপে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে এবং তৃতীয় অংশে দেখিয়েছি সিদ্ধান্তের পরবর্তী ফলাফলরূপে আবেগের উপস্থিতি কাম্য।

সিদ্ধান্তে নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগ ও যুক্তি বা বুদ্ধির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে, অর্থাৎ উভয়ের ভূমিকা যে নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ—সে বিষয়ে নিজস্ব যুক্তিগুলি তুলে ধরেছি। এই নিবন্ধের আলোচনা পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক এবং সমালোচনামূলক।

তথ্যসূত্র

১। নোজিক, রবার্ট, ১৯৮১, পৃ ৪

২। ওয়েস্টারমার্ক, এডওয়ার্ড, ১৯৩২, পৃ ৪

৩। স্টাটম্যান, ডানিয়েল, ১৯৯৭, পৃ ৮৮

সূত্রনির্দেশ

১। ওয়েস্টারমার্ক, এডওয়ার্ড, (১৯৩২), *এথিক্যাল রিলেটিভিটি*, হার্কোট ব্রাস এণ্ড কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক

২। নোজিক, রবার্ট, (১৯৮১), *ফিলোজফিক্যাল এক্সপ্লানেশন্স*, মাসা হার্ভাড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ

৩। স্টাটম্যান, ডানিয়েল, (১৯৯৭), *ভারচু এথিক্স*, এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবার্গ

প্রথম অধ্যায়

নৈতিকতায় বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার :

বিভিন্ন দার্শনিক অভিমত

মানুষের প্রকৃতিতে উপস্থিত সামাজিকতাবোধের কারণে সমাজ গঠিত হয়েছিল, না মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল - সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজ মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংশোধন করে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে। এই কারণেই সমাজের সাথেই নৈতিকতার ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। দর্শনেও নৈতিক আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে রয়েছে, যেহেতু নৈতিকতা সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। তবে দার্শনিকেরা নৈতিকতাকে এবং নৈতিক সত্যের অনুসন্ধানকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিলেও স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এই অনুসন্ধান অনাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য সন্ধানের অনুরূপ নয়। এটি কোন নব আবিষ্কৃত বিষয় নয়। মানুষ সভ্যতার আদিপর্ব থেকে তার স্বভাববশত, জীবনের প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা করেছে। কারণ এই ধারণাগুলি তার জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং লক্ষ্য লাভের উপায় নির্ধারণে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শনে আমরা দেখি জীবনের উচ্চতম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য লাভের জন্য নৈতিক আচরণ পালনকে আবশ্যিক বলে মনে করা হয়েছে। কোনও কোনও ভারতীয় দর্শনে কঠোর সংযম , আত্মত্যাগ, তপশ্চর্যার মাধ্যমে, কৃচ্ছ্রতাসাধনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, ধর্মের পথ অনুসরণ করার উপদেশ দান করা হয়েছে। সেখানে ধর্ম ও নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোনও কোনও ভারতীয় দর্শনে সামাজিক কর্তব্য পালনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলেও এবং সংসারজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলা হলেও তাদের স্বীকৃত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের ধারণার মধ্যে নৈতিক ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে কিন্তু ধর্ম বলতে ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা বলা হয়নি। ধর্ম হলো সদাচার। ভারতীয় নাস্তিক দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে নৈতিক আলোচনার একটি পূর্ণ এবং স্পষ্ট রূপ আমরা লক্ষ্য করি। এখানে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করা হয়নি। সে কারণেই ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থান অনুসারে, গৃহী ব্যক্তিদের জন্য একপ্রকার; ত্যাগী, সন্ন্যাসীদের জন্য ভিন্ন প্রকার আচরণ পালনের উপদেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ভারতীয় দর্শনে আমরা লক্ষ্য করি জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করার বিষয়টি। একইভাবে পরবর্তীকালে বর্ণ অনুসারেও

বিভাজন করা হয়েছে। যেখানে আশ্রম অনুসারে বা বর্ণ অনুসারে নির্দিষ্ট আচরণগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে ব্যক্তির কিছু সাধারণ ধর্মের সাথেই অসাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি ব্যক্তির জীবনের বিশেষ স্তরে বা নিজের বর্ণের ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় বলে গণ্য হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে নৈতিক আলোচনা জীবনের সাথে যুক্ত হলেও এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্য লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতায়, বিশেষত প্রাক-সক্রেটিক গ্রীক দর্শন প্রধানত বাহ্যজগতের আলোচনাতে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তির আচরণসম্বন্ধীয় আলোচনা ছিল গৌণ। প্রাক-সক্রেটিক যুগের অনেক দার্শনিকেরাই মনে করতেন যে, সমস্ত জ্ঞানই ঈশ্বরপ্রদত্ত। দর্শন চর্চার উদ্দেশ্যই হলো ঐ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা। ফলে দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই হলো ঈশ্বরের নির্দেশিত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা প্রদান করা। সক্রেটিসের পূর্বে মানুষকে স্বভাবতই নীতিবান, নৈতিক গুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন বলে মনে করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা লক্ষ্য করলেন, মানুষ অনেকসময়ই তার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে ঈশ্বরের আদেশকে বুঝতে এবং অনুসরণ করতে অক্ষম হয়। কেবলমাত্র তাই নয়, তারা তাদের আবেগগুলিকেও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। অমঙ্গলকারী, পাপী ব্যক্তিরা তাদের লোভ ও স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে বিবেকের অনুশাসনকে অস্বীকার করে। কোনরূপ নৈতিক ভাবনা দ্বারা তারা প্রভাবিত হতে ব্যর্থ হয়। কতকগুলি ভ্রান্ত যুক্তি প্রয়োগ করে তারা তাদের লোভ, স্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিকতাকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। যুক্তি প্রদানের সামর্থ্য হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত পুরস্কার—যা মানুষকে নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন করে। কিন্তু এই যুক্তির অপব্যবহারের দ্বারা এবং ভ্রান্ত দর্শন চিন্তার দ্বারা মানব প্রকৃতি প্রভাবিত হওয়ায় আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এভাবেই পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব নৈতিক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সক্রেটিসের শিক্ষাদানের চিন্তা থেকেই নৈতিক আলোচনার জন্ম হয় এবং পরবর্তীকাল পর্যন্ত এই বিষয়ের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। সক্রেটিসই প্রথম নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন।[১] ভারতীয় দর্শনে অন্তিম লক্ষ্য লাভের জন্য নৈতিক আচরণ পালন আবশ্যক হলেও অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মনে করেন, নৈতিকতার মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক মঙ্গল উৎপাদন। সামাজিক জীবরূপে আমাদের চরমলক্ষ্য হলো একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন বা সামাজিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা। নৈতিক আচরণ পালনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি যেমন সমাজের জন্য শুভফল উৎপন্ন করে, তেমনই সে নিজের জীবনেও মঙ্গল, শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তাই পাশ্চাত্য নীতিতত্ত্বগুলি ব্যক্তির এবং তার কৃত কর্মের মূল্যায়ন করে।

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে আমরা বিভিন্ন নীতিতত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করি যেগুলি নৈতিক অবধারণের বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করে। নৈতিক মূল্যায়ণের জন্য বুদ্ধিনির্ভর যুক্তি প্রদানই কেবলমাত্র যথাযথ কিনা, আবেগের সেক্ষেত্রে ভূমিকা কি -এ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বহু মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের নৈতিক আলোচনা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনা। তিনি সদ্‌গুণ অর্জনের দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এ্যারিস্টটল তাঁর আলোচনাতে বুদ্ধি এবং আবেগ উভয়ের ব্যবহারকে নৈতিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেও, তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক সক্রেটিস এবং প্লেটো বুদ্ধির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। নৈতিক আলোচনা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে যখন মধ্যযুগে দার্শনিকেরা নৈতিকতাকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত করে উপস্থাপিত করেন। ফলে ঈশ্বরপ্রেম, ভক্তি, আস্থা ইত্যাদি আবেগ—যা ঈশ্বর লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলি চরিত্রে অর্জন অবশ্যম্ভাবী বলে গণ্য হয়। এই চিত্রটি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যখন আধুনিককালে ধর্মের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নৈতিকতা পুনরায় স্বমহিমায় স্থিত হয়। বুদ্ধির আধিপত্য স্বীকারই কেবল নয়, আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে এবং বুদ্ধিকেই একমাত্র গুরুত্ব প্রদান করে ইমানুয়েল কান্ট, জন স্টুয়ার্ট মিল চরিত্রের পরিবর্তে আচরণকে নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করেন। সমসাময়িককালের কোনও কোনও দার্শনিক যেমন, এলিজাবেথ এ্যানস্কোম্ব, এ্যালেসডায়ার ম্যাকিনটায়ার এরূপ মনোভাবের বিরোধিতা করে বলেন, নৈতিক আলোচনার জন্য মানব প্রকৃতিকে জানা আবশ্যক। তাঁরা মানুষের মনের বিশ্লেষণকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। আবার গ্রীক দর্শনে সুষ্ঠুভাবে নৈতিক আলোচনার সূচনা হলেও তার পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা যে নৈতিক আলোচনার একেবারে উল্লেখ করেননি এমন নয়। তাঁরাও নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমি প্রাক্‌-সক্রেটিক যুগ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িককাল পর্যন্ত্য নৈতিকতায় বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকেরা কীরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন সে বিষয়েই আলোচনা করব।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আবেগ ও বুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মত আলোচনার জন্য মূলত পাঁচটি সময়কালের প্রচলিত ধারণার কথা আমি এই অধ্যায়ে উত্থাপন করেছি। তবে এই দর্শন ভাবনাগুলিতে সময়কাল অনুসারে বিন্যস্ত না করে আমি ধারণার একরূপতা অনুসারে আলোচনা করাই এ প্রসঙ্গে সুবিধাজনক বলে মনে করেছি। আমি এখানে যে পাঁচটি যুগের দার্শনিকদের কথা আলোচনা করব সেগুলি হলো—প্রাক-সক্রেটিক যুগ (৪৩০ বি. সি), ২) সক্রেটিক—প্লেটোনিক--এ্যারিস্টটলীয় যুগ (৩২২বি. সি), ৩) মধ্যযুগ (১১০০

এ. ডি-১৬০০ এ. ডি), ৪) আধুনিক যুগ (১৬৮০-১৭৮৯), এবং সমসাময়িক যুগ (বিংশ শতাব্দী)। প্রাক-সক্রেটিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরাস, হেরাক্লিটাস ও ডেমোক্রেটাসের কথা উল্লেখ করেছি। সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই তাঁদের আলোচনা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করব। মধ্যযুগ ঈশ্বরের প্রভাবে নৈতিকতাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। সেন্ট অগাস্টিন ও টমাস এ্যাকুইনাসের আলোচনা আমি এ প্রসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আধুনিকযুগের দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ও ইমানুয়েল কান্টের ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বুদ্ধি—নির্ভরতা সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার আধুনিককালে যে নীতিতত্ত্বগুলি বিশেষভাবে আমাদের প্রভাবিত করেছিল সেগুলির যথার্থতা সমসাময়িককালের বিভিন্ন দার্শনিকের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছে। তাই এঁদেরই বিরোধীরূপে আমি এলিজাবেথ এ্যানস্কোম্ব, এ্যালেসডায়ার ম্যাকিনটায়ার ইত্যাদি দার্শনিকমতের আলোচনা করব। এই সকল দার্শনিকেরা যদিও বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সমাজে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের দার্শনিক মতের সুস্পষ্ট পার্থক্যও বর্তমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধি ও আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে এই সকল দার্শনিকদের মধ্যে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি বলেই আমি এঁদের আলোচনা সময়কাল অনুসারে বিভাজন না করে আলোচ্য বিষয়বস্তুর নিরিখে বিভাজন করার চেষ্টা করেছি। আমার আলোচনার সুবিধার্থে এই সকল দার্শনিকদের প্রথমে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছি। যাঁরা ঈশ্বরের আলোচনাকে নৈতিক আলোচনার সাথে যুক্ত করেছেন এবং যে সকল দার্শনিকেরা নৈতিকতাকে ধর্মের মোড়কে উপস্থাপিত করেননি। এরপর আমি যে সকল দার্শনিকেরা নৈতিকতাকে ঈশ্বরানুগ্রহের বা ঈশ্বরলাভের উপায় বলে মনে করেননি, সেই সকল দার্শনিকদের মতবাদকে আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। প্রথম ভাগটিতে আমি সেই সকল দার্শনিকদের মতামত উল্লেখ করেছি যাঁরা ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে নৈতিক আলোচনা থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী। অপরশ্রেণীটিতে আমি সেই সকল দার্শনিকদের মতামত আলোচনা করেছি যাঁরা আচরণকে ব্যক্তির প্রভাব মুক্ত বলেননি।

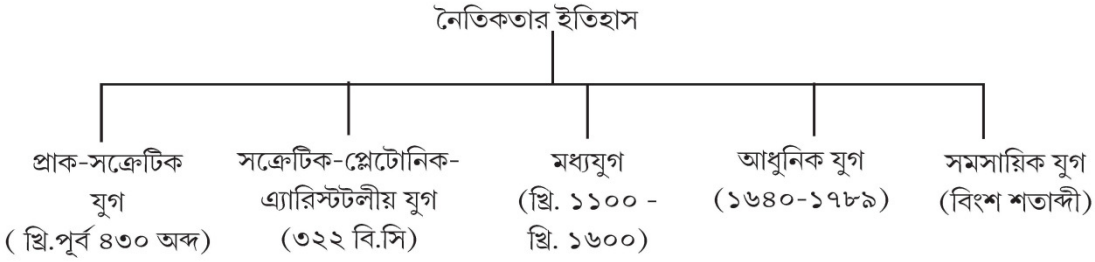

আমার আলোচনায় আমি নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করেছি

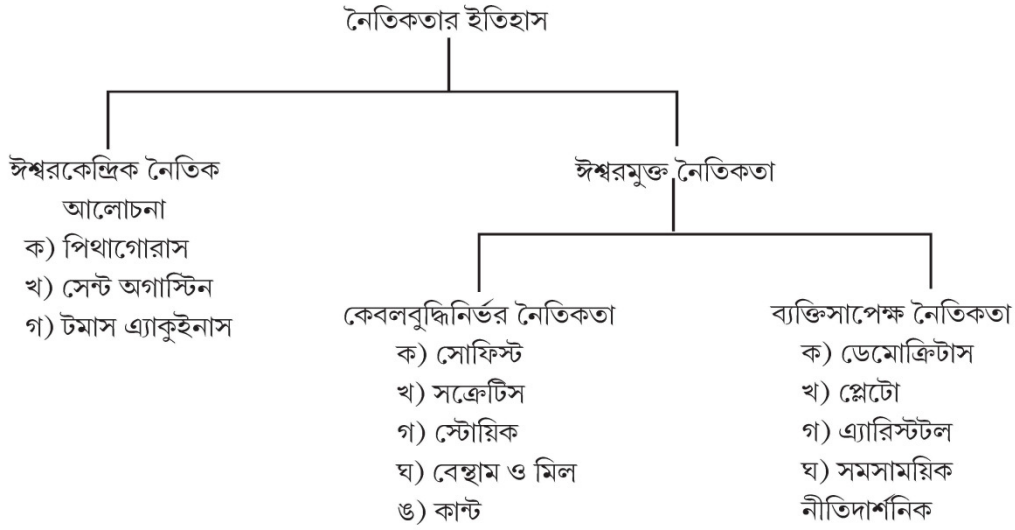

ঈশ্বরকেন্দ্রিক নৈতিক আলোচনা

পিথাগোরাস-(৫৮০-৫০০ বি সি)

৪৩০ বি সি পর্যন্ত্য সময়কালকে প্রাক-সক্রেটিক যুগ বলে অভিহিত করেছেন নীতিদার্শনিক সিজউইক।[২] এই পর্বে নীতিবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা না থাকলেও, দার্শনিকদের দর্শন আলোচনায় ন্যায়-নীতিবোধের ধারণার স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সে কালের নৈতিক বিষয়ের আলোচনা 'নীতিদর্শন' বলে অভিহিত না হলেও এই আলোচনা পরবর্তীকালের নৈতিক ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাক-সক্রেটিস

দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পিথাগোরাস।[৩] গণিতে উল্লেখজনক অবদানের জন্য গণিতজ্ঞরূপে পরিচিত হলেও, তাঁর দর্শনে আমরা নৈতিক চিন্তার আভাসও লক্ষ্য করি। আত্মার পুনর্জন্মের ধারণায় বিশ্বাসী পিথাগোরাসের লক্ষ্য ছিল বিশ্বজগতের নিয়ম উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে ঐক্য স্থাপন করে মুক্তি লাভ করা। তিনি মনে করতেন, আত্মার শুদ্ধতা বজায় রাখার মাধ্যমে, ঈশ্বরের ন্যায় হয়ে ওঠার প্রচেষ্টার দ্বারাই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটস্থ হতে সক্ষম হয়। এ জন্য প্রয়োজন ধর্মাচরণ, ধর্মবচন, শুভ্রবস্ত্র পরিধান, ব্রহ্মচর্যপালন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা লাভের জন্য প্রয়োজন আত্মিক উন্নতি। আত্মিক আত্ম-উত্তরণ আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করে। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তি সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে তার স্বভাবকে পরিবর্তন করে, আত্মার শুদ্ধতা বজায় রাখে। আত্মার অবিনশ্বরতা এবং ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী পিথাগোরাস মনে করতেন, আত্মা পুনর্জন্ম লাভের মাধ্যমে, নৈতিক ও ধর্মীয় লক্ষ্য পূরণের দ্বারা একটি সৌভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে সক্ষম। আত্মার পুনর্জন্ম লাভের ধারণায় তাঁর বিশ্বাস থেকেই আমরা তাঁর নৈতিক জীবন সম্পর্কে ধারণাটি বুঝতে পারি। সুবিশাল সৃষ্টিতত্ত্বের অংশরূপে বিভিন্ন সত্তার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাঁকে তিনি নৈতিক আচরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। সকল ব্যক্তিই এই জগতের সদস্যরূপে জগতের নিয়মকে অনুসরণ করে, সকলে সেই ঐশ্বরিক শক্তির সাথে এক গভীর বন্ধন উপলব্ধি করে। তাই তিনি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বন্ধুত্বের বন্ধন, সৌভ্রাতৃত্বের বোধ গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এমনকী তিনি মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে উপস্থিত সকল আত্মাকেই একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি এ জীবনে মানব শরীর ধারণ করলেও, পরবর্তী জীবনে প্রাণীদেহ ধারণ করতে পারে। আত্মার অবিনশ্বরতার ধারণা থেকেই তিনি চারিত্রিক উন্নতির দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্ক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই কোন নীতিতত্ত্বের প্রবক্তা না হয়েও তাঁর স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট নৈতিক অভিমতকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি একটি গোষ্ঠী গঠন করেন। এই গোষ্ঠীর সদস্যেরা নির্দিষ্ট অনুশাসন অনুসারে দৃঢ়, সংযমী জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিল। পিথাগোরাসের মতে, সংযম, সাহস, বিশ্বস্ততা, নীতি ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা, নিয়মিত আত্মসমালোচনা ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নতির সহায়ক। নৈতিক আচরণের জন্য পিথাগোরাস এবং তাঁর অনুগামীরা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, স্বার্থহীনতা, সততাকে চরিত্রে অর্জনের কথা বলেছিলেন। বাহ্যিক অপেক্ষা চারিত্রিক সক্ষমতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে পিথাগোরাস বিভিন্ন সদ্‌গুণ অর্জনের প্রয়োজনীয়তাকে

স্বীকার করেছেন। এ্যারিস্টটল মনে করেন, পিথাগোরাসই প্রথম দার্শনিক যিনি সদ্‌গুণের আলোচনার সূচনা করেন।[৪]

গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস মনে করতেন, বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে যে সাযুজ্য রয়েছে, সংখ্যাগুলি মিলিতভাবে যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য সৃষ্টি করে সেই সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পারস্পরিক সম্বন্ধ, ঈশ্বর এবং পূর্ণতা বিষয়ে তাঁর মনোভাব গাণিতিক ধারণাগুলির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। সংখ্যাকে তিনি কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ের পরিমাণগত পার্থক্য ব্যক্তকারী বলে মনে করেননি। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে, সংখ্যা বিভিন্ন ধারণা ও সত্তাগুলিকে ব্যক্ত করে। সে কারণেই পিথাগোরাস সংখ্যাগুলিকে কেবলমাত্র ধারণারূপে না বুঝে আলো বা শব্দের ন্যায় বাস্তব সত্তা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলির পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে গুণগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ঈশ্বরবিশ্বাসী পিথাগোরাস মনে করতেন, '১' সংখ্যাটি ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। আবার '১', '২', '৩', এবং '৪' সংখ্যার যোগফল রূপে '১০' সংখ্যাটি একটি কার্যকরী সংখ্যা। তিনি মনে করেছেন, এভাবেই বিশ্বজগতের বিষয়গুলিকে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্বের প্রেক্ষিত থেকে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। একইভাবে তিনি জ্যামিতিক আকারগুলির সাহায্যেও তাঁর নৈতিকতার ধারণা ব্যক্ত করেছেন। সমবাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ধারণা দ্বারাই তিনি প্রতিফলাত্মক ন্যায়ের ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করেন। সমবাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের সমান বাহুগুলির সংযুক্তি যেমন একটি বর্গক্ষেত্র গঠন করে তেমনই প্রতিটি ব্যক্তির ন্যায্য সমরূপ আচরণের ফলেই ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে ওঠে। আচরণের সমরূপতা এখানে সমান বাহুগুলির ধারণার সমরূপ। সমান আচরণের প্রতিফলরূপেই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। এই আচরণের সমতা রক্ষায় পারস্পরিক বন্ধুত্বের বোধই সহায়তা করে। তাই বন্ধুত্বকে তিনি সমতার ঐক্য বলে বর্ণনা করেছেন। ন্যায় বা মঙ্গল বলতে এভাবেই তিনি পারস্পরিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ঋজুতা, সাহস, মাত্রাবোধ, বিশ্বস্ততাকে বুঝেছেন। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে যদিও তিনি আত্মার উত্তরণের কথা বলেছেন, কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যেও এই সদ্‌গুণগুলির প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেননি।

এখানে স্পষ্টতই পিথাগোরাস আবেগ ও সদ্‌গুণকে বিরুদ্ধ বিষয় বলে মনে করেছিলেন। সে কারণেই কর্তব্য কর্ম নির্ধারণে কোন অবাঞ্ছিত আবেগের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। যে আবেগ নৈতিক আচরণের বিরোধী তাকে তিনি পরিহার করার কথা বলেছিলেন। তাঁর দর্শনে বিচক্ষণতা, বন্ধুত্ব, সাহস, উদারতা ইত্যাদির গুরুত্ব থাকলেও, এ্যারিস্টটলের ন্যায় তিনি ভালো জীবনযাপনের জন্য সম্পদ, মর্যাদা, সম্ভ্রম ইত্যাদিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। তিনি অন্তরের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাহ্যজগতের বিষয়গুলির

প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে করেননি। তাঁর মতে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সদ্‌গুণই একমাত্র বিষয়— যা জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সহায়ক, অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই তুচ্ছ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুন্দর করতে সমর্থ হলে তবেই সমগ্র মানবজীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির বাক্যের মাধুর্যের দ্বারাই তার অন্তরের অবস্থাটি প্রতিফলিত হয়। পিথাগোরাস আকাঙ্ক্ষা বলতে আত্মার আবেগ ও প্রবণতা বুঝেছেন—যা স্থায়ী অথবা অর্জিত হতে পারে। আবেগগুলির প্রকৃতি বর্ণনাকালে তিনি বলেছেন, কিছু আবেগ অশোভন, কুরুচিকর; আবার কোনও কোনও আবেগ অসুবিধা বা সংকট সৃষ্টিকারী; অনুরূপভাবে আবেগকে তিনি সংকীর্ণ বলেও মনে করেছেন। ফলে তাঁর মতে আবেগ সর্বদাই আমাদের ভুল পথে চালিত করে। আবেগ এমন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের মনে জাগ্রত করে, যা প্রকৃতপক্ষে কামনার যোগ্য নয়। শরীরের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে যেমন শারীরিক ক্ষতি হয়, তেমনি অসুস্থ মনের দ্বারাও আমরা সদাচার পালনে সক্ষম হই না।

এই আলোচনা থেকে বলা যায়, পিথাগোরাস সদাচারের অনুকূল আবেগ, যেমন বন্ধুত্ব, সাহস ইত্যাদিকে সদ্‌গুণরূপেই আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেও, আবেগ মাত্রই যে গ্রহণীয়—এ কথা বলেননি। বিপরীতপক্ষে বলে যায়, তিনি আবেগের দুর্বলতাগুলি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন বলেই আবেগ পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনের পক্ষে বাধাস্বরূপ বলে মনে করেছিলেন। আবেগ যে আত্মস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সে কারণেই অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা মনে করেছিলেন বলেই সেই জাতীয় আবেগকে বর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পুনর্জন্মবাদের ধারণাটিকে স্বীকার করলে তাঁর দর্শনে আবেগের গুরুত্বকেও স্বীকার করে নিতে হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা মানবেতর প্রাণীর শরীর লাভ করতে পারে। তিনি মনে করেছেন যে, তিনি নিজে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে তাঁর প্রিয়জনের আত্মার উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পেরেছেন। আবার তিনি নিজেও বলেছেন যে, তাঁর পূর্বজন্ম সম্পর্কে তিনি অবগত। তাঁর এই ধারণা থেকে বলা যায় যে, তিনি ব্যক্তির অভিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই অভিন্নতাকে চিহ্নিত করতে পিথাগোরাসকে আবেগের সহায়তাই গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু মানবেতর প্রাণীর বৌদ্ধিক সামর্থ্য মানুষের ন্যায় হওয়া সম্ভব নয়, তাই এই অভিন্নতা নির্ণীত হয় আবেগের অভিন্নতার দ্বারা। আবেগ, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ বোধ মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের মধ্যেই উপস্থিত থাকে বলে এর মাধ্যমেই প্রাণীর এবং মানুষের আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু পিথাগোরাসের এই সকল ধারণাগুলি যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলিকে তিনি সত্য বলে স্বীকার করে নিলেও প্রমাণ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি। তিনি তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ও বিশ্বাস থেকেই এরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন। তাছাড়া তিনি আত্মার উত্তরণের ক্রমোন্নতির কথাও স্বীকার করেননি, যেহেতু তিনি মনে করেন, ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে সে শাস্তিস্বরূপ মনুষ্যেতর জীবন লাভ করে। অর্থাৎ পুরস্কারস্বরূপ আত্মা মানবদেহ ধারণ করে। এ আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, তিনি মনে করতেন, আবেগ নিরন্তর বুদ্ধিকে কর্মপালনে বাধা দান করে। যদি আবেগ অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে তবে ব্যক্তি সদ্‌গুণ অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় বুদ্ধিহীন প্রাণী জীবন যাপন করবে। কিন্তু আত্মা যদি তার বুদ্ধিকে আবেগমুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তবে সদ্‌গুণ অর্জনের দ্বারা মানবজীবন ধারণে সমর্থ হবে। অর্থাৎ সদ্‌গুণ আবেগের বিরোধী। এ আলোচনা থেকে মনে হয় পিথাগোরাস উন্নত জীবনের জন্য, ঈশ্বরলাভের জন্য যে সদ্‌গুণগুলিকে কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেছেন সেগুলিকে তাহলে বৌদ্ধিক সদ্‌গুণই বলতে হবে।

সেন্ট অগাস্টিন-(৩৫৩-৪৩০ এ ডি)

প্রাক-সক্রেটিক যুগে পিথাগোরাস যেমন ঈশ্বরের সাথে ঐক্য স্থাপনের জন্য সদ্‌গুণ অর্জনের কথা বলেছিলেন, মধ্যযুগের দার্শনিকদের মতবাদেও এমনই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত্য সময়কালকে যাজক যুগ বলা হয়, যে সময়ে নৈতিকতার ধারণা ঈশ্বরের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই সময়ের অন্যতম দার্শনিক ছিলেন নর্থ আফ্রিকার সেন্ট অগাস্টিন [৫], যিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধি ও বিচারমূলক চিন্তাকে গুরুত্ব দিলেও, নৈতিক জীবনে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে বিচারবুদ্ধির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত ব্যক্তিজীবনে আনন্দ লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা রূপে সকল বস্তুতেই ঈশ্বর উপস্থিত রয়েছেন। সুতরাং সেই সর্বত্র—বিরাজমান ঈশ্বরকে অনুসরণ করলেই আমাদের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে। আনন্দময় জীবনই হলো নিশ্চিত, অপরিবর্তনীয় মঙ্গল। ঈশ্বরকে অস্বীকার করার অর্থই হলো অকল্যাণ বা অমঙ্গলকে আহবান করা। ঈশ্বর-লাভই পরমানন্দ লাভ। সুতরাং এর জন্য প্রয়োজন হলো ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশের মাধ্যমে, আত্মনিবেদনের দ্বারা ব্যক্তি পরমকল্যাণ লাভে সমর্থ হয়। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসের কারণেই তিনি মনে করেছিলেন, ঈশ্বরকে অনুসরণের মাধ্যমে জাগতিক অমঙ্গলকে মঙ্গলে রূপান্তরিত করা সম্ভব। অগাস্টিনের মতে, ঈশ্বর ভক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য লাভ

করতে পারি। তিনিও গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের ন্যায় সুখকেই জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে নির্ণয় করলেও দৈহিক বা বাহ্যিক মঙ্গল অর্জনের মধ্যে সেই সুখকে অন্বেষণ করেননি। তিনি পিথাগোরাসের ন্যায় মনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রতিই মনোনিবেশ করেছেন। কারণ অন্তরের উৎকর্ষতা অর্জন করলে সেটি তার স্থায়ী সুখ বলে গণ্য হবে—যা ব্যক্তির জীবন থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপসৃত হতে পারে না। ব্যক্তি যদি এই সুখ অর্জনে সক্ষম হন তবে সেটি তার স্থায়ী সুখরূপে গণ্য হবে। জাগতিক বস্তুগুলি থেকে আমরা যে সুখ লাভ করি সেগুলি ক্ষণস্থায়ী, কারণ বস্তুগুলি অনিত্য হওয়ায় এবং বহু ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত হওয়ায় অনেক সময়ই আমরা সেই জাতীয় বস্তুগুলির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অর্থ আমাদের জাগতিক জীবনে সুখবিধান করে। কিন্তু আমাদের অর্থ থাকলেও আমরা সর্বদাই সেটির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা মনে পোষণ করি। কিন্তু তিনি অন্তিম সুখকে এই জাতীয় বলেননি। কারণ এই সুখ অর্জন করলে ব্যক্তির মনে ঐ সুখকে হারিয়ে ফেলার ভীতি থাকে না। ব্যক্তি যখন এই সুখকে উপভোগ করে তখন সে সেটির অধিকার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয় বলেই সে প্রকৃত অর্থে সুখ অনুভব করে। বাহ্যিক সুখগুলি শর্তহীনভাবে শুভ বলে গণ্য হয় না। যেহেতু সেগুলি কখনও মঙ্গলজনক ফল উৎপাদন করে, আবার কখনও অমঙ্গলের কারণ হয়। সে কারণেই এজাতীয় সুখগুলি অপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট কাঙ্ক্ষিত হলেও নৈতিক জীবনের চরম লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয় না।

অগাস্টিন[৬] মনে করেন, ঈশ্বরকে অনুসরণ করলেই আত্মায় সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়। তিনি ঈশ্বরানুগ্রহকে জীবনের লক্ষ্য লাভের অপরিহার্য শর্ত বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি মনে করেন, ঈশ্বরকে অনুসরণই সুখী জীবনলাভের উপায়। কারণ ঈশ্বরের সহায়তার দ্বারাই চরম লক্ষ্য লাভ সম্ভব। তাঁর যুক্তিতে, সদ্‌গুণ অর্জনের পূর্বে ব্যক্তির সদ্‌গুণ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না। ব্যক্তি কোন কিছুর দ্বারা চালিত হলে তবেই সদ্‌গুণ অর্জনে ব্রতী হয়। যতক্ষণ ব্যক্তির চরিত্রে সদ্‌গুণের অভাব থাকে ততক্ষণ সে সংকীর্ণ কামনা বাসনা তৃপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুরই অনুসন্ধান করবে অথবা সেটিকে অধিকার করতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু ঈশ্বরকে অনুসরণকারী ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণগুলি অর্জনেই সচেষ্ট হবে। ব্যক্তি যা কিছু অনুসরণ করে আবশ্যিকভাবে সেটি অর্জন করতে ইচ্ছা করে। যা কিছু সে অনুসরণ করে তাকে সে আকাঙ্ক্ষা করে না—এমন ধারণা স্ববিরোধী। একথা থেকে অগাস্টিন প্রমাণ করেন, সদ্‌গুণগুলি ব্যক্তির আত্মা ভিন্ন অন্যত্রও বিদ্যমান থাকে। কারণ যদি আবশ্যিকভাবে ব্যক্তিতেই সেগুলি উপস্থিত থাকত তবে ব্যক্তি সেগুলি অর্জনে সচেষ্ট হতো না। আবার সদ্‌গুণের অস্তিত্বও অবশ্যস্বীকার্য, যেহেতু ব্যক্তি সেগুলিকে অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়।

তাহলে সদ্‌গুণগুলির অধিকারীরূপে কোন সত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—যিনি আমাদের সদ্‌গুণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন। অগাস্টিন মনে করেন, এই সদ্‌গুণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির চরিত্রে এবং ঈশ্বরে উপস্থিত থাকে—যা আমাদের সদ্‌গুণ অর্জনে প্ররোচিত করে। তবে একইসাথে তিনি একথাও স্বীকার করেন, অনিচ্ছুক ব্যক্তি কখনও এই জাতীয় গুণগুলি অর্জনে সক্ষম হয় না। ব্যক্তির আগ্রহ, তার প্রচেষ্টা উপস্থিত থাকলে তবেই এগুলি অর্জন সম্ভব হয়। এই ইচ্ছার উৎপত্তি সম্ভব যদি সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করে, ঈশ্বরের করুণা লাভ করে। এভাবেই অগাস্টিন সদ্‌গুণ অর্জন বা উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করলেও ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত সেই পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয় বলেই মনে করেছেন। প্রজ্ঞাবান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তা অর্জনের পূর্বশর্তরূপে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তির উপস্থিতি আবশ্যক বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ অন্তরের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জনের কথা বলেছেন।

টমাস এ্যাকুইনাস (১২২৫-১২৭৪ এ. ডি)

মধ্যযুগীয় ইতালীয় দার্শনিক টমাস এ্যাকুইনাস তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক অগাস্টিনের ন্যায় ঈশ্বরভক্তির প্রেক্ষাপটেই নৈতিক আলোচনা করেছেন। তবে অগাস্টিনের চিন্তার বিপরীত চিন্তা লক্ষ্য করা যায় টমাস এ্যাকুইনাসের[৭] নৈতিক মতবাদে। তিনিও ঈশ্বর—তাদাত্ম্য লাভের ক্ষেত্রে ভক্তি, আস্থা ভালোবাসা—এই সকল আবেগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, নৈসর্গিক সত্তার প্রতি আত্মনিবেদনের জন্য ব্যক্তির নৈসর্গিক আবেগগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি পরমলক্ষ্য লাভ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ইচ্ছার গুরুত্বকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর মতবাদে ব্যক্তির ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেই ইচ্ছা কোন সংকীর্ণ স্বার্থপরিতৃপ্তিদায়ক ইচ্ছা নয়, সেই ইচ্ছা হলো বুদ্ধি--আশ্রিত ইচ্ছা, যা ঈশ্বর--তাদাত্ম্যলাভে ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বমুখে চালিত করে। এজন্য তিনি ব্যক্তিকে সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ার কথা বলেছেন। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে নির্বাচন করে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাদাত্ম্যতা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করতে সক্ষম এবং ঈশ্বর লাভে সমর্থ। সেই কারণে এ্যাকুইনাসের নৈতিক মতবাদ বুদ্ধিনির্ভর ঈশ্বরকেন্দ্রিক নৈতিকতায় পর্যবসিত হয়। তাঁর দার্শনিক আলোচনায় এ্যারিস্টটল ও খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর মতবাদ পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক। কারণ ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন করার সাথেই ব্যক্তির বুদ্ধি এবং ইচ্ছা বা অভিলাষকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ্যারিস্টটলের ন্যায় এ্যাকুইনাসও মনে করেন, আমাদের জীবনে একটি চরম বা

অন্তিম লক্ষ্যকে স্বীকার করতে হয়। এ্যাকুইনাসের মতে, প্রতিটি ব্যক্তি কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিজে লক্ষ্যবস্তুকে নির্বাচন করেন, অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধান্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ব্যক্তি সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়া করেন। তবে তিনি লক্ষ্য বলতে আংশিক লক্ষ্য ও চরম লক্ষ্য উভয়কেই বুঝিয়েছেন। নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যকে আংশিক লক্ষ্য বলা যায়। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই তার কর্মের লক্ষ্যটি নির্ধারণ করে। একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে বিরুদ্ধ দলের কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন তবেই তার প্রতি ধনুকের নিশানা নির্ধারণ করেন। একজন শিল্পী তাঁর মনের কল্পনাকেই ক্যানভাসে চিত্রিত করেন। ফলে ব্যক্তির লক্ষ্যের মধ্যেই ব্যক্তির নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়। একজন স্থপতি তাঁর নির্মাণ কর্মের লক্ষ্যকে নির্ধারণ করেই স্থাপত্য কর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এইভাবে ব্যক্তিদের নির্ধারিত লক্ষ্য সেই সেই ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির লক্ষ্য যেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা প্রতিফলিত করে তাই প্রতিটি ব্যক্তির নিকট তার নিজস্ব লক্ষ্য লাভের সাফল্য আনন্দদায়ক হয়। এ্যাকুইনাসের মতে, এরূপ সাফল্য কেবলমাত্র ব্যক্তির আত্মস্বার্থকেই পরিতৃপ্তি দান করে। ফলে এ সকল লক্ষ্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় এগুলিকে আংশিক লক্ষ্য বলতে হয়। এভাবে কার্যকারণ পরম্পরায় একটি লক্ষ্যকে নির্বাচন করতে হবে—যে লক্ষ্য হল চরমলক্ষ্য বা পূর্ণলক্ষ্য। এই লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে অন্য কোন লক্ষ্যকে স্থাপন করা সম্ভব নয়। এ্যাকুইনাসের মতে, পরমলক্ষ্য হল পরমশুভ বা পরমমঙ্গল। ফলে এটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। পূর্ণবৌদ্ধিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা সেই চরমলক্ষ্যকে বা পরমমঙ্গলকে নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন। সাধারণ ব্যক্তি ঐরূপ চরমলক্ষ্যকে নির্ধারণ করতে সক্ষম নন, যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র বুদ্ধি প্রয়োগে লক্ষ্য নির্ণয়ে সমর্থ হন না। এইভাবে এ্যাকুইনাস ব্যক্তিদের মধ্যে আংশিক বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এবং পূর্ণবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, পূর্ণ বৌদ্ধিকসত্তার অধিকারী ব্যক্তি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, চরমলক্ষ্য কোন ক্ষুদ্র জাগতিক বস্তু হতে পারে না। কারণ জাগতিক বস্তু ব্যক্তিগত, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উৎপাদনে সক্ষম হলেও, বৃহত্তর মঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ নয়। তাই এ্যাকুইনাস মনে করেন, জাগতিক সুখলাভ ব্যক্তির পরমলক্ষ্য হতে পারে না। পরমলক্ষ্য বা পরমমঙ্গল হবে অতিজাগতিক সত্তাকে বা ঈশ্বরকে লাভ করা।

পরমলক্ষ্য লাভ করার জন্য তিনি দুটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি বুদ্ধির সহায়তায় ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি ঈশ্বর সান্নিধ্য বা ঈশ্বরের সাথে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। এ্যাকুইনাস এভাবেই ব্যক্তির পরমলক্ষ্য লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ব্যক্তির ইচ্ছা

উভয়কে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হবে বুদ্ধির দ্বারা প্রথমে ঈশ্বরকে নির্ধারণ করা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভই ব্যক্তিকে ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করতে সাহায্য করে না। এর জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা বা অভিলাষ উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। তাই এ্যাকুইনাস ব্যক্তির পরমলক্ষ্য নির্বাচনে ব্যক্তির বুদ্ধির ভূমিকাকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন তেমনি ঈশ্বরের সাথে অভিন্নতাবোধের আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তিতে ইচ্ছাকে প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। কেবলমাত্র ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেই আমরা পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হতে পারি না, ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ব্যক্তি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারেন এবং তবেই চরমলক্ষ্য লাভের ফলে পূর্ণ-আনন্দ অনুভব করেন। তিনি বলেছেন, " The action of the will is more noble than the action of the intellect. Therefore it would seem that the last end, which is beautitude, consists in an act of the will rather than of the intellect."[৮] তাঁর মতে, ঈশ্বর বুদ্ধিতে আশ্রিত আবার বুদ্ধি ব্যক্তির ইচ্ছাতে অবস্থিত। জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যক্তির প্রধান লক্ষ্য হল ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এইদিক থেকে ব্যক্তির বুদ্ধি ব্যক্তির ইচ্ছার পূর্ববর্তী। কারণ ব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে, তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হলে তাঁকে লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আবার ব্যক্তি যখন নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন তখন ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করবেন পরমলক্ষ্য বা পরমমঙ্গলময়তাকে লাভ করতে। তাঁর সমস্থ কর্মের লক্ষ্য হবে সেই ঈশ্বরের সাথে মিলন। সেই কারণে এ্যাকুইনাসের মতে, " The intellect is higher than the will absolutely, while the will is higher than the intellect accidentally and in a restricted sense."[৯] অর্থাৎ বুদ্ধি যতক্ষণ ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করবে ততক্ষণ ইচ্ছা তাঁকে লাভ করতে আগ্রহী হবে না। এই অর্থে বুদ্ধি ইচ্ছার পূর্ববর্তী স্তর এবং লক্ষ্য নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণবৌদ্ধিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি স্বভাবতই এই জ্ঞান অর্জনে সক্ষম। কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলেই ব্যক্তি নৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ইচ্ছার দৃঢ়তা। যে ব্যক্তি তার কর্ম, কর্তব্য, দায়বদ্ধতাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করতে সক্ষম সেই ব্যক্তিই ঐ পরমলক্ষ্য লাভে সমর্থ। সে কারণে ভালো কর্ম পালনের জন্য এ্যাকুইনাস এ্যারিস্টটলের মতো সদ্‌গুণের উপস্থিতির কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সদ্‌গুণ ব্যক্তির বিচারশক্তি ও ইচ্ছা বা অভিলাষ উভয়কেই সঠিকপথে চালিত করে। এ্যাকুইনাস চারটি সদ্‌গুণ পূর্ণ বৌদ্ধিক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য বলেছেন। সেগুলি হলো- বিচক্ষণতা (prudence), ন্যায্যতা (justice), সংযম (temperance) এবং সাহস (courage)। তিনি মনে করেন, সদ্‌গুণের উপস্থিতি ব্যক্তিকে সঠিক কর্ম সম্পাদনে ও নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

তবে এ্যাকুইনাস একথা বলেন যে, চরমলক্ষ্য লাভ করতে হলে সদ্‌গুণের অতিরিক্ত ঈশ্বরের সহায়তা, করুণা লাভ করা প্রয়োজন। ব্যক্তি তখনই কেবলমাত্র ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণে সম্মত হয়, যদি সে কতকগুলি ধর্মীয় সদ্‌গুণ যেমন, আস্থা, আশা, মহানুভবতাকে অর্জন করে। এই ধর্মীয় সদ্‌গুণের দ্বারাই ব্যক্তি ঈশ্বরের করুণা লাভ করে ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন হতে পারেন। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করলে ব্যক্তি ঈশ্বরের করুণা লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন। সেই কারণে নৈতিক পরমমঙ্গল বা ঈশ্বরলাভের জন্য প্রথমে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। আবার ঈশ্বরকে লাভ করার আশা ব্যক্তির মনে থাকতে হবে। এদিক থেকে এ্যাকুইনাস ধর্মীয় সদ্‌গুণের ক্রমে আস্থাকে প্রথমে রেখেছেন। আস্থা থাকলে তবে আশা বা তাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও আশা থাকলে তবে ব্যক্তি ঈশ্বরের করুণা লাভ করে মহানুভবতা অর্জনে সক্ষম হবেন। ফলে পূর্ণতার দিক থেকে মহানুভবতা সর্বোচ্চ ধর্মীয় সদ্‌গুণ হলেও ক্রমের দিক থেকে আস্থা, আশা ও মহানুভবতার পূর্ববর্তী। তবে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও মহানুভবতার দ্বারা ব্যক্তি পূর্ণতার অধিকারী হলেও এ্যাকুইনাসের মতে, এই জীবনে বা ইহলোকে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারা সম্ভব নয়। তাই ইহলোকে মানুষ পূর্ণশান্তি ও আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তি তার সীমিত ক্ষমতার দ্বারা ঐ অতিপ্রাকৃত সত্তাকে লাভ করতে পারে না। সে জন্য ঈশ্বরের করুণা লাভ করা প্রয়োজন, ঈশ্বরের সহায়তা প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তিকে পরিহার করে শুভ শক্তিকে গ্রহণ করার শক্তি বর্তমান। এখানেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নৈতিক দায়িত্ব নিহিত। অশুভ শক্তিকে নির্বাচন করলে বা আকাঙ্ক্ষা করলে ব্যক্তি ঈশ্বর লাভের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। বিভিন্ন বিকল্প পন্থার মধ্যে কোনটিকে নির্বাচন করা উচিত, তা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ফলে কর্মের দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের। তাঁর মতে, ঈশ্বরের কৃপা ও করুণার কল্যাণেই ব্যক্তি ক্রমশ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস, আস্থার দ্বারা ব্যক্তি ঈশ্বরের কৃপালাভ করতে সক্ষম হয় এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আস্থাবান ব্যক্তিকেই ঈশ্বর কৃপা করে থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাই নিঃসৃত হয় যে, প্রাক-সক্রেটিক যুগে পিথাগোরাস, মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিন ও টমাস এ্যাকুইনাস মনে করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ কর্ম সম্পাদনই হলো ব্যক্তির প্রধান নৈতিক কর্তব্য। এঁদের নৈতিক মতবাদে ঈশ্বর বিশ্বাসের আধিক্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। ব্যক্তিজীবনের পরমলক্ষ্যরূপে তিনজন দার্শনিকই ঈশ্বর লাভকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ঈশ্বর লাভের জন্য সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কেবলমাত্র সদ্‌গুণই নয়, ব্যক্তির বুদ্ধিকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন তিনজন দার্শনিকই, এবং ঈশ্বরানুগ্রহ লাভের ক্ষেত্রে কতকগুলি আবেগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে

করেছেন। তথাপি তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পিথাগোরাস ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে ন্যায়, সততা ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জন করাকে ঈশ্বর লাভের প্রাথমিক শর্তরূপে গণ্য করেছিলেন। ব্যক্তি সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করতে সমর্থ হবেন। পিথাগোরাসের দর্শনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঐ অন্তিম লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য জগতের প্রাণীদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অন্তিম লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতি দায়বদ্ধতাকে তিনি অনুভব করেছিলেন, যেহেতু সমস্ত আত্মাকে তিনি একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তাছাড়া সদ্‌গুণগুলিকে তিনি আবেগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রাবল্যের কারণে দার্শনিকেরা সদ্‌গুণ অর্জনের কথা বললেও সেগুলি ঈশ্বরলাভের জন্যই প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। তাই অগাস্টিনের নৈতিক মতবাদে দেখা যায় ব্যক্তি প্রথমে ঈশ্বরকে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করবেন এবং ঈশ্বরে উপস্থিত গুণগুলিকে অর্জন করতে চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, ব্যক্তিজীবনের পরমলক্ষ্য হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা। এর জন্য প্রথমে ব্যক্তি কতকগুলি আবেগ দ্বারা যথা, আস্থা, ভক্তি, ভালোবাসার দ্বারা ঈশ্বরের করুণা লাভের প্রচেষ্টা করলে ব্যক্তি ঈশ্বরের সদ্‌গুণগুলিকে লাভ করতে সমর্থ হবেন। অর্থাৎ তাঁর দর্শনে বুদ্ধি ঈশ্বর পরবর্তী চিন্তা।

মধ্যযুগের ঈশ্বর--নির্ভর নৈতিকতা পরবর্তীকালে পরিত্যজ্য হয়। কেননা এইযুগে ধীরে ধীরে ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরের নামে মানুষকে প্রতারিত করতে থাকেন। ধর্মের নামে সাধারণ ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে বিলাসপ্রিয় জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। ধর্মযাজকদের চারিত্রিক সদ্‌গুণের অভাব লক্ষ্য করা যায়, যেহেতু আত্মস্বার্থপূরণই তাঁদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে অর্থের বিনিময়ে "Indulgence Certificate" বিক্রি করতে শুরু করেন। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি পাপকর্ম করলে তাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এই Certificate ক্রয় করে পাপমুক্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে সমাজে ধর্মের প্রতি ক্ষোভ ক্রমে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। সে কারণে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে দার্শনিক সমাজ—সংস্কারকেরা ঈশ্বরের স্থানে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে গুরুত্ব দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিচারবুদ্ধিকে অনুসরণ করেই নৈতিকতার নতুন ব্যাখ্যার প্রচলন হয়। বুদ্ধির নিকট যা যুক্তিগ্রাহ্য তাকেই অনুসরণ করার কথা বলা হয়। এইভাবে অবিসংবাদিত চার্চ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। চার্চীয় জীবনদর্শনের স্থলে ঈশ্বরের প্রভাবমুক্ত জীবনদর্শনের প্রভাব প্রসার লাভ করে। এ আলোড়নের ফলেই মধ্যযুগীয় ঈশ্বর--নির্ভর

নৈতিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আধুনিক নীতিদর্শনের সূত্রপাত হয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে। রেনেসাঁর প্রভাবে ঈশ্বরকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি হয় এবং ব্যক্তির যুক্তিবুদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঈশ্বরমুক্ত নৈতিকতা

রেনেসাঁর সময়ে নৈতিকতা একান্তভাবে বুদ্ধিকেন্দ্রিক আলোচনায় পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটলের নৈতিকতার ধারণা আধুনিককালের দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ও ইমানুয়েল কান্টের নৈতিকতার ধারণা থেকে পৃথক হলেও আমার আলোচনার এই অংশে আমি এই সকল দার্শনিককে একত্রে আলোচনা করেছি, যেহেতু তাঁরা সকলেই নৈতিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আমার গবেষণাপত্রের এই অংশে আমি সেই সকল দার্শনিকদের কথা উল্লেখ করেছি যাঁরা নৈতিকতার ধারণাকে ঈশ্বরের ধারণা থেকে মুক্ত করেছেন। যে সকল দার্শনিক ঈশ্বরের আদেশ পালনকেই বা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়াকে নৈতিকতার চরমলক্ষ্য বলে মনে করেননি, তাঁরা সকলেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এঁদের মধ্যে একদল দার্শনিক কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই নৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন এবং অপর একদল দার্শনিক বুদ্ধির সাথে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয় যেমন, ইচ্ছা, আবেগ, প্রবণতা ইত্যাদিকে নৈতিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এর ভিত্তিতে আমি ঈশ্বরমুক্ত নৈতিক আলোচনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমে আমি কেবলমাত্র বুদ্ধিনির্ভর নৈতিকতায় বিশ্বাসী দার্শনিকদের মতগুলি আলোচনা করব এবং এরপরে আমি সেই সকল দার্শনিকদের মত উল্লেখ করবো যাঁরা বুদ্ধির সাথেই নৈতিকতার ক্ষেত্রে আবেগের উল্লেখজনক ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রাক-সক্রেটিক যুগের দার্শনিকচিন্তা থেকে সমসাময়িককালের দার্শনিকদের ভাবনা আলোচনা করলে পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের বিশাল বৈচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কেবলবুদ্ধি নির্ভর নৈতিকতা

সোফিস্ট দার্শনিক (৪৫০-৪০০ বি সি)

গ্রীকযুগে সোফিস্ট দার্শনিকেরাই (৪৫০-৪০০ বি সি) সর্বপ্রথম নৈতিক সমস্যাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। এঁদের মধ্যে প্রোটাগোরাস, হিপ্পিয়াস, প্রডিকাস অন্যতম। সোফিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে আমরা দু'ধরনের মত লক্ষ্য করি। কোনও কোনও সোফিস্ট দার্শনিক সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিলেও, অনেক দার্শনিক যেমন, প্রোটাগোরাস ব্যক্তিসাপেক্ষতার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। পরবর্তী সোফিস্টগণ যথা, হিপ্পিয়াস ও প্রডিকাস প্রোটাগোরাসের নৈতিক মতবাদকে সমর্থন করেননি। হিপ্পিয়াস তৎকালীন সমাজের পরস্পরবিরোধী আইনকে প্রত্যক্ষ করে সর্বজনীন আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করেন। কেননা সর্বজনীন আইনই মানুষের মধ্যে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী সোফিস্ট দার্শনিক হিপ্পিয়াস ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে অস্বীকার করে নৈতিকতায় তিনি বস্তুগত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমেই করা সম্ভব। নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মই প্রধান। ব্যক্তি সেই নৈতিক কর্ম করতে উৎসাহী হবেন যে কর্ম সম্পাদনের দ্বারা উৎপন্ন ফলাফল ব্যবহারিক উপকারিতা দেবে। অর্থাৎ নৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক আলোচনাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা কীভাবে নৈতিকতায় বস্তুগত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রডিকাস ও হিপ্পিয়াসের নৈতিক মতবাদে পাওয়া যায় না। তাঁরা নৈতিকতায় সর্বজনীন আইন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বললেও বস্তুর ব্যবহারিক মূল্যের দ্বারা কীভাবে বস্তুর নৈতিক মূল্য নিরূপণ সম্ভব সে বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যদি নৈতিক মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড হয় তাহলে কীভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বজনীনতাকে পাওয়া সম্ভব হবে সে বিষয়েও একটি অস্পষ্টতা রয়ে যায় বলে মনে হয়। কারণ ব্যবহারিক উপযোগিতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলে একই বস্তুকে ভাল এবং মন্দ উভয়ই বলতে হয়। সেক্ষেত্রে সর্বজনীন কোন আইন বা সিদ্ধান্ত গঠন সম্ভব না। ফলে কোন সিদ্ধান্তই আবশ্যিকভাবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয় না। ব্যক্তি যখন তার কর্মের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করে তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে, তখন সেটি তার নিজস্ব যুক্তি বলেই গণ্য হয়। অর্থাৎ কর্মের সপক্ষে যুক্তি থাকলেও সেটি যে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে—এমন দাবি করা যায় না, যেহেতু আমরা ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের দ্বারা

বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করছি। অথচ এই সকল সোফিস্ট দার্শনিকেরা ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়কে গুরুত্ব দেননি, যেহেতু তার প্রভাবে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যটি ক্ষুণ্ন হবে। বুদ্ধির একাধিপত্যকে স্বীকার করলেও ব্যবহারিক উপযোগিতার উল্লেখ তাঁদের উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

সক্রেটিস (৪৭০—৩৯৯ বি. সি)

সোফিস্ট দার্শনিকেরা নৈতিকতায় কর্মকে প্রাধান্য দিলেও পরবর্তীকালে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস[১০] নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, বুদ্ধি সকল জ্ঞানের উৎস। তিনি ভাল-মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমরা যদি ভালোকে জানি তাহলে অবশ্যই ভালো কর্ম সম্পাদন করবো। যদি সাহস, আত্মসংযম, ন্যায় ইত্যাদির অর্থগুলি আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়, তাহলে আমরা এমন কর্ম পালন করবো যার মধ্য দিয়ে এই জাতীয় গুণগুলি প্রকাশিত হবে। জ্ঞান অর্জনের দ্বারা মঙ্গল বা ভালোর ধারণা লাভে আমরা সক্ষম হই বলেই বলা যায় যে, অজ্ঞানতাই মন্দ কর্ম সম্পাদনের উৎস। মানব প্রকৃতির প্রতি আস্থাশীল সক্রেটিস মনে করেছেন আমারা জ্ঞানতঃ কখনও অন্যায় কর্ম সম্পাদন করি না। ব্যক্তি যখনই কোন কর্ম সম্পাদন করে তখন সে মনে করে যে সে ভাল কর্মই সম্পাদন করছে। অর্থাৎ কর্মটি মন্দরূপে অভিহিত হয়, ব্যক্তির সৎপ্রবণতার অভাবে নয়, ব্যক্তির জ্ঞানের অভাবে। তাই তিনি নৈতিক দুর্বলতার (*acrasia*) ধারণাকে স্বীকার করেননি। কারণ তাঁর মতে, ব্যক্তি যদি ভাল-মন্দ সম্পর্কে সচেতন হয় তবে সে কখনই সচেতনভাবে মন্দ কর্ম সম্পাদনে ইচ্ছুক হয় না। সক্রেটিস মনে করেন, জ্ঞান অর্জনই হলো ব্যক্তিজীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি নৈতিকতায় অসম্পূর্ণ বা আংশিক জ্ঞানকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদানে সক্ষম। অর্থাৎ ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় এবং প্রতিটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই ধারণা প্রয়োগ করার অধিকারী হয়। অর্থাৎ নৈতিক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্যক্তি প্রথমে কোন বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিকভাবে জ্ঞানলাভ করবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার ঐ জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে।

সক্রেটিস জ্ঞানলাভের পদ্ধতিরূপে কথোপকথন—আলাপ আলোচনার (dialectic method) সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁর এই পদ্ধতির দুটি দিক ছিল—নঞর্থক দিক এবং সদর্থক দিক। কোন বিষয় সম্পর্কে কোন ব্যক্তির ধারণা কি সেই বিষয়ে তিনি তার সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত হতেন। যেমন- 'ন্যায়পরায়ণতা' সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কোন সংজ্ঞা প্রণয়ন করলে সেই বিষয়ে অসঙ্গতি নির্ণয় করে ব্যক্তির প্রদত্ত সংজ্ঞা যে

যথার্থ সংজ্ঞা নয় তা প্রথমে প্রমাণ করতেন। প্রতিপক্ষকে নঞর্থক দিক অবগত করাই তার লক্ষ্য নয়, সেই বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্ন করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করতেন। কেননা তাঁর লক্ষ্য ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সার্বিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা। এভাবে তিনি ন্যায়, অন্যায়, সাহসিকতা, মহানুভবতা, দয়া প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান বা সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন। সক্রেটিসের কথোপকথন পদ্ধতির সদর্থক দিক হলো সত্য আবিষ্কার করা। সত্যের জন্য সত্য আবিষ্কার করা নয়, উত্তম জীবনের জন্য সত্য আবিষ্কার করা। সক্রেটিস তাঁর পদ্ধতিকে ধাত্রীবিদ্যা বলেছিলেন। তিনি তাঁর সদর্থক পদ্ধতির দ্বারা জ্ঞানলাভে সাহায্য করতেন। তিনি প্রতিপক্ষের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করে ব্যক্তির মনে অসচেনভাবে উপস্থিত সত্যগুলি স্পষ্ট করতে সহায়তা করতেন। প্রতিপক্ষের ধীশক্তি যাতে যথার্থ সত্য উদ্ভাবনে সমর্থ হয় তাই তাঁকে ধাত্রীর ন্যায় সহায়তা করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জীবনের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি সংজ্ঞার আকারে যথার্থ সত্য উৎপন্ন করতে চেয়েছিলেন এবং বুদ্ধিকেই জ্ঞানের উৎস বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি সকল মানুষের ক্ষেত্রে একরূপ। বুদ্ধি দ্বারা যা সত্য বলে গণ্য হবে তাই প্রকৃত সত্য। সত্যের বস্তুগত মানদণ্ড বা যথাযথ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি মনে করতেন, জ্ঞান ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আত্মবিচার বোধ বৃদ্ধি করে, ব্যক্তিকে আত্মবিচারী করে তোলে। জ্ঞান মানুষের বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানুষকে প্রচলিত অযৌক্তিকতা থেকে, প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ নিয়ম থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বিচার ক্ষমতার প্রয়োগের অধিকারী করে তুলতে সহায়তা করে। ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান, অন্যায় এবং ন্যায়ের পার্থক্যকে অনুধাবন করতে সমর্থ করে। এ কারণে সক্রেটিস জ্ঞানকে সদ্‌গুণের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবি করেন। কেননা ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, সাহসিকতা- এগুলি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানই সদ্‌গুণের জ্ঞান। সুতরাং তাঁর মতে, "Virtue is Knowledge"।[১১] এভাবে তিনি 'জ্ঞান' এবং 'সদ্‌গুণ' এ দুয়ের মধ্যে অভিন্নতা স্বীকার করেন।

সক্রেটিস জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিচারকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কেননা বিচারহীনভাবে জীবনযাপনকে তিনি মূল্যহীন বলে মনে করতেন। সে কারণে তিনি মনে করেন, অন্যায় কর্ম পালন করা থেকে অন্যায়ের শিকার হওয়া যুক্তিযুক্ত। নৈতিক জ্ঞানকেই তিনি নিঃশর্তভাবে ভালো বলে মনে করেছেন। সদ্‌গুণ তাঁর নিকট জ্ঞানেরই আকার। যেগুলিকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সক্রেটিসের নিকট সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক বিষয়। কারণ তিনি সদ্‌গুণ এবং জ্ঞানকে একার্থক বলেছেন। আবেগকে তিনি কোনভাবেই নৈতিকতায় স্থান দেননি। তিনি যেহেতু মনে করেছিলেন সঠিক জ্ঞান লাভ করলেই ব্যক্তি সঠিক বা ন্যায় কর্ম সম্পাদনে সমর্থ, সেহেতু ব্যক্তির মধ্যে কোন আবেগের উপস্থিতি স্বীকার্য

নয়। ব্যক্তি যদি আবেগ দ্বারা চালিত হয় তবে ব্যক্তির জ্ঞান ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহৃত হবে। নৈতিকতায় দুর্বল মনের বা জ্ঞানের অভাবকে স্বীকার না করায় সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি নৈতিকতায় আবেগকে বর্জন করেছেন। এখানে আমরা আধুনিককালের দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতের সঙ্গে একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। কান্ট মনে করেন, ব্যক্তি যখন কর্তব্য নির্ণয় করে তখন সে সেটি পালনে সক্ষম। সক্রেটিসও মনে করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ভালোত্বের জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছে তখন সে সেই ভালোত্ব অনুসারে কর্ম সম্পাদনেও সক্ষম হবে।

স্টোয়িক মতবাদ(৩৩৫—১৮০ বি. সি)

সক্রেটিসের দার্শনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে স্টোয়িক দার্শনিকেরা আত্মসংযম, পুণ্যলাভ, অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত নৈতিক জীবন লাভের কথা বলেছেন। এ কারণে তাঁরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দর্শনের উৎপত্তির মূলে পূর্ববর্তী দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। স্টোয়িক মতে, ব্যক্তির নৈতিকজীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভের জন্য নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। এই মতে লক্ষ্যের সংজ্ঞা হল 'Living in agreement with nature'[১২] অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তভাবে বা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জীবনকে পরিচালিত করাই হল নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। প্রকৃতি বলতে তাঁরা দুটি বিষয়কে বুঝেছেন। প্রথমত 'প্রকৃতি' বলতে তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বিশ্বজগত (cosmic nature/ the universe) বা বিশ্বপ্রকৃতি বুদ্ধির নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। জগত যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত একটি ব্যবস্থা, সেখানে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। সুতরাং স্টোয়িকরা একটি নির্দেশ্যবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, নৈতিকতা হল প্রকৃতি অনুসারে জীবনযাপন। নৈতিকতার অর্থ হল আমাদের ইচ্ছাকে পূর্বনির্ধারিত ও ঈশ্বরনির্দিষ্ট জাগতিক ঘটনাশৃঙ্খলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। অর্থাৎ বৌদ্ধিক নীতি অনুসারে চালিত আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারেই ক্রিয়া করবে। ব্যক্তির ইচ্ছা সর্বজনীন ইচ্ছার অনুগামী হবে। ফলে জগতের সকল ঘটনার মধ্যে যে সামঞ্জস্য, তা ঐশ্বরিক সত্তার দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এক্ষেত্রে 'living in agreement with nature''—এর অর্থ ব্যক্তির ইচ্ছা ঐশ্বরিক ইচ্ছার অনুরূপ হবে। মানুষের উচিত হবে ব্যাপক বিশ্বের চরম লক্ষ্যের সঙ্গে নিজস্ব উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করা, পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হওয়া। 'প্রকৃতি' কথার দ্বিতীয় অর্থ হলো বস্তুর স্বভাবধর্ম। যেমন, অগ্নির স্বভাব ধর্ম সর্বদা উর্ধ্বাভিমুখী হওয়া। একটি পাথরখণ্ড তার স্বভাবের জন্য অর্থাৎ, তার সৃষ্টি, স্থায়িত্ব ও ধ্বংস পদ্ধতির কারণেই একটি উদ্ভিদ থেকে পৃথক। এভাবে

প্রাণীজগত ও বস্তুজগত স্বতন্ত্র স্বভাবধর্মবশত একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। এই অর্থে বস্তুর স্বভাবধর্মই হল বস্তুর নিজস্ব প্রকৃতি। প্রাণীর সংবেদনশীলতা, ইচ্ছা, বংশবৃদ্ধি করার সামর্থ্য প্রাণীর প্রকৃতি বা স্বভাব। প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি হল শিশুকে লালন পালন করা, যদি প্রাণী সেই স্বভাব অনুসারে কর্ম না করে তাহলে সে তার স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম করবে। এই যুক্তিতে স্টোয়িকেরা বলেন, মানুষের স্বভাবধর্ম হল বুদ্ধিবৃত্তি। যার কারণে ব্যক্তি অপর প্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং 'living in agreement with nature''-এর অর্থ ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে। বুদ্ধি হলো এঁদের মতে ব্যক্তির সহজাত মানসিক গুণ। তাই তাঁরা বলেন, 'For human being, 'Living in agreement with nature' means living in agreement with our special innate endowment the ability to reason.'[১৩] বুদ্ধি মানবপ্রকৃতির অপরিহার্য ধর্ম। বুদ্ধি নির্ধারিত নিয়ম যেমনভাবে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি ব্যক্তি মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ব্যক্তি জাগতিক নিয়ম মেনে চলে এবং তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বিশ্বজনীন ইচ্ছার অনুগত করে।

ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিশ্বইচ্ছায় পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে স্টোয়িকেরা জীবনের দুটি পর্যায়ের কথা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধিময় পূর্ণাঙ্গ জীবন উপলব্ধ হয় দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা হল আত্মপ্রেম। এই আত্মপ্রেম সুখ নয়। ব্যক্তি নিজের ভালমন্দ সম্পর্কে অবগত হলেও এ সময়ে ব্যক্তির ভালমন্দ সম্পর্কে সচেতনতা বোধ হল দৈহিক ভালমন্দ বা আত্মরক্ষা বোধ। এই পর্যায়ে ব্যক্তির প্রকৃতি নিজস্ব চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু পরিণত অবস্থায় যখন ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় তখন সে উপলব্ধি করে যে, দৈহিক চাহিদাই প্রকৃত চাহিদা নয় এবং তখনই ব্যক্তির আত্মা বুদ্ধির দ্বারা জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। তখন বুদ্ধিই ব্যক্তি জীবনকে পরিচালিত করে জগতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবনের প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করলেও, পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তি অপরের সঙ্গে তথা বিশ্বজগতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। সে তখন উপলব্ধি করে যে, সে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য নয়, বৃহত্তর মানবজাতির সদস্য। এইভাবে সে নিজেকে বিশ্বের বৌদ্ধিক সম্প্রদায়ের সদস্য বলে বোধ করে। অর্থাৎ বুদ্ধির পূর্ণতা তাকে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্যরূপে পরিচিত হতে সাহায্য করে। এইভাবে ব্যক্তি পরার্থপরতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। বুদ্ধির এই স্বয়ংসম্পূর্ণতাকেই স্টোয়িকেরা সদ্‌গুণ বলেছেন। অর্থাৎ, বুদ্ধি নামক সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ার অর্থ ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভ করা। বুদ্ধিকেই তাই তাঁরা সদ্‌গুণ বলেছেন, যেহেতু বুদ্ধির উপস্থিতিতেই ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান, ন্যায়বান, সাহসী ও সংযমী হতে পারে।তাঁদের মতে, সদ্‌গুণ চারপ্রকার—প্রজ্ঞা, ন্যায়, সাহস এবং সংযম। প্রজ্ঞা হল মঙ্গলময় বিষয় নির্বাচন করার ক্ষমতা, ন্যায়

হল সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা, সাহসিকতা ব্যক্তিকে দৃঢ় চিত্তের অধিকারী করে এবং পরিশ্রমী করে তোলে, সংযম ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। মহৎ ব্যক্তি এই সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হবে। এই গুণগুলি পরস্পর এমনভাবে সম্বদ্ধ থাকে যে একটি গুণ উপস্থিত থাকলেই অপর গুণগুলিও তার সাথে ব্যক্তিতে উপস্থিত থাকে। সদ্‌গুণের অভাবে ব্যক্তি অসৎ বলে বিবেচিত হয়। সৎ ব্যক্তি মঙ্গলময় বিষয়কে নির্বাচন করতে সক্ষম। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন বিষয় মূল্যবান বা ভাল বলে বিবেচিত হতে পারে। স্টোয়িক দার্শনিকেরা মনে করেন, যে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধির কোন ভূমিকা থাকে না, সেই বিষয়কে ভাল বলা সঙ্গত নয়। ব্যক্তির আবেগ তাকে আত্মস্বার্থ পূরণের জন্য এমন বস্তু নির্বাচনে প্রলুব্ধ করতে পারে যা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথাযথ হলেও নৈতিকভাবে তাকে মূল্যবান বলে গণ্য করা যায় না, কারণ সেটি বুদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত না হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী হয় না। তাঁরা মনে করেন, আবেগ বুদ্ধির বিপরীত বলে ব্যক্তিকে তার প্রকৃতি অনুসারে কর্ম পালনে বাধা দান করে। ভাবাবেগ হল একটা ঝোঁক, যা বুদ্ধির বিপরীতে কর্ম করে। তাই স্টোয়িকরা নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগকে গুরুত্ব দেননি। বুদ্ধির অনুপস্থিতিই বিষয়কে মন্দ বলে পরিগণিত করে। জগতে এমন অনেক বস্তু বা বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে ভাল বা মন্দ কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এই সকল বিষয়গুলিই নৈতিকভাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে যখন এগুলি ব্যক্তির বুদ্ধির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে এবং ফলত ব্যক্তির জন্য মঙ্গলময় বিষয় বলে পরিগণিত হয়। তবে মঙ্গলময় বিষয় নির্বাচনে এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের ফলে লব্ধ আনন্দ ব্যক্তিগত সুখানুভূতি নয়, বুদ্ধিজাত সর্বজনীনবোধ। বুদ্ধি যেহেতু ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে অস্বীকার করে সর্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, তাই বুদ্ধি—নির্বাচিত বিষয় দ্বারা প্রাপ্ত আনন্দ হল সর্বজনীন আনন্দ। সুতরাং নৈতিকতার লক্ষ্য হল ব্যক্তির প্রকৃতি অর্থাৎ, তার বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে জীবনযাপন। তাঁদের নিকট বুদ্ধিই ব্যক্তির প্রকৃতি। প্রকৃতি যেমন তার স্বভাব ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধিও সেরূপ বুদ্ধিজাত নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবেই নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাই স্টোয়িকগণ ব্যক্তির প্রকৃতি বলতে ব্যক্তির বৌদ্ধিক প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন।

বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) ও মিল (১৮০৬--১৮৭৩)

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে যথাক্রমে জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল নৈতিকতায় সর্বজনীন সত্যকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই সকল নীতিদার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে

সিরেনাইক দার্শনিক সম্প্রদায় যথা এপিকিউরাস (৩৪১—২৭১ বি. সি) ও এ্যারিস্টিপাসের (৫০—১৩০ এ. ডি) সুখবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কেননা এপিকিউরাস ও এ্যারিস্টিপাসের মতবাদে সুখ নৈতিকতার মানদণ্ডরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এ্যারিস্টিপাসের মতে, সুখই যথার্থ শুভ; জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম শ্রেয়। চেতনপ্রাণী মাত্রই জন্মের মুহূর্ত থেকে সুখের সন্ধানে এবং দুঃখ পরিহারে সচেষ্ট থাকে। সুখভোগই মানুষের জীবনের একমাত্র কাম্য বিষয়। সুতরাং জগতে এমন কোন বিষয় না থাকতে পারে যা সকলের নিকট সুখদায়ক হবে। কোন বিষয়ে সকল মানুষের জ্ঞান যে এক হবে তা বলা সঙ্গত নয়। অর্থাৎ নৈতিকতায় সর্বজনীনতার কোন স্থান নেই। কোন বিষয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে তুলনা করা সম্ভব নয়। যেমন সাহস, ন্যায়পরায়ণতা এগুলির অভিজ্ঞতা সকলের ক্ষেত্রে সমান হবে এমন নয়। সকলেই সাহস, উদারতা সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করতে পারে না। অর্থাৎ এ্যারিস্টিপাস নৈতিকতায় ব্যক্তিসাপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের সংবেদনকেই জানতে সক্ষম হয়। সংবেদনকে অবগত হওয়ার অর্থ কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন বিষয় যেভাবে ব্যক্তির সম্মুখে আবির্ভূত হয়—তাকেই কেবল ব্যক্তি জানতে সক্ষম হন। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখের মধ্যে পার্থক্য থাকা সম্ভব । তবে তিনি সুখের গুণগত পার্থক্যকে স্বীকার করেননি, অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক সুখের মধ্যে কোন বিভেদ তিনি স্বীকার করেননি। তিনি সুখের পার্থক্য বলতে সুখের পরিমাণগত পার্থক্যকে বুঝেছেন। সর্বজনীনতাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ ব্যক্তিগত সুখলাভকেই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। তিনি মনে করেন, কোন বিশেষ বিষয়ে সুখ যে সবচেয়ে বেশি উত্তম তা নির্ণয় করা অসম্ভব। আবার কোন বিশেষ সুখকে অন্য কোন সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলারও কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এই মতে, প্রকৃত সুখের অর্থ দুঃখের অভাব। আমরা সাধারণত মানসিক সুখকে দৈহিক সুখ অপেক্ষা উন্নত মানের মনে করি। কিন্তু তাঁর মতে, মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার সুখকে যখন আমরা 'সুখ' বলেই চিহ্নিত করি তখন তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করা যায় না। দৈহিক ও মানসিক সুখের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র পরিমাণের বা তীব্রতার। দৈহিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা অধিক তীব্র ও উত্তেজনাপূর্ণ। তাই তিনি মনে করেন, প্রত্যেক মানুষের উচিত উত্তেজনামূলক সর্বাধিক দৈহিক সুখ উপভোগ করা। অর্থাৎ এই মত, প্রতিটি সুখের সংবেদনকেই মূল্যবান বলে মনে করে। এই মতবাদ অনুসারে বিচক্ষণতা ব্যক্তিকে সুখের সন্ধান দিলেও, অর্থাৎ, সুখজনক বস্তুটি নির্ধারণ করতে সহায়তা করলেও, সুখের তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য আমাদের অনুভূতির উপর নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু সর্বজনীনতাকে এভাবে অস্বীকার করা, ব্যক্তিসাপেক্ষ মানদণ্ড দ্বারা নৈতিক লক্ষ্যকে নির্ণয় করার প্রয়াস এবং সুখকে ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ রাখার মনোভাব অন্যান্য দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। কারণ সেক্ষেত্রে নৈতিকতার উদ্দেশ্য যে পরার্থপরতা, সর্বজনীনতা, পক্ষপাতহীনতা—সেগুলি বিঘ্নিত হয়। পরবর্তীকালে সিরেনাইক দার্শনিকগণ বুঝতে সক্ষম হন যে, তাঁদের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অসম্ভব। কেননা ক্ষণিকের জন্য তীব্র সুখ লাভ করা পরবর্তীকালে যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এই কারণে সিরেনাইকগণ প্রথমে যে স্থায়ী মানদণ্ডের বিরোধিতা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাকেই আবার সমর্থন করেন। তাঁরা পরবর্তীকালে সুখ প্রাপ্তি ও সুখের জন্য আত্মসংযমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এমনকি বিশেষ বিশেষ কামনাকে জয় করাও আবশ্যিক বলে দাবি করেন। এপিকিউরাস তাই সুখকে পরমশুভ বলে মনে করলেও, সুখের গুণগত তারতম্যকে স্বীকার করেন। এখানেই এরিস্টিপাসের সঙ্গে তাঁর মতবাদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এরিস্টিপাস ক্ষণিকের সুখকে কাম্য বলেছিলেন। কিন্তু এপিকিউরাসের মতে, ক্ষণিক, দৈহিক সুখ নয়, মানসিক সুখই স্থায়ীসুখ বা প্রকৃত সুখ। তাই ব্যক্তির লক্ষ্য হবে মানসিক সুখ লাভ করা। ব্যক্তি বিচক্ষণতার দ্বারা একাধিক সুখের মধ্যে মানসিক সুখকে নির্বাচন করে সেটি লাভে প্রবৃত্ত হবেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, বুদ্ধিই সুখলাভের সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম। পূর্বাপর চিন্তা করে বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে মানুষের উচিত হবে এমনভাবে অগ্রসর হওয়া যাতে তার সমগ্র জীবন আনন্দময় হতে পারে। বিচক্ষণতার সঙ্গে কার্যফল চিন্তা করে মানুষকে এমনভাবে কর্ম করতে হবে যাতে সামগ্রিকভাবে তার জীবনে সর্বাধিক সুখলাভ সম্ভব হয়। ভবিষ্যতের বিশুদ্ধ ও স্থায়ী সুখের চিন্তা করে বর্তমানের ক্ষণিক সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত। এপিকিউরাস সক্রেটিসের নৈতিক মতবাদকে অনুসরণ করে বলেন, 'প্রকৃত সুখী' জীবন বা সুসংহত সুখীজীবনকে হতে হবে বিচারশীল, চিন্তাশীল। বিচক্ষণতা বা পরিণামদর্শিতার মধ্যেই সর্বাধিক সুখ নিহিত।

জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল[১৪] নৈতিক ক্ষেত্রে সুখকে গুরুত্ব দিলেও তাঁদের মতবাদ এ্যারিস্টিপাস ও এপিকিউরাস থেকে অনেক উন্নত। বেন্থাম ও মিলের মতে, ব্যক্তির নৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখ অন্বেষণ করা। কিন্তু এই সুখ কেবলমাত্র আত্মসুখ নয়, আমাদের উচিত হলো পরের সুখ অন্বেষণ করা। এঁদের মতবাদ নৈতিক সুখবাদ নামে পরিচিত। নৈতিক সুখবাদ 'সকল মানুষের সুখ অন্বেষণ করা উচিত'— এমন মানদণ্ড দিয়ে নৈতিক আচরণের মূল্যায়ন করে। অন্যের স্বার্থ বা সুখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা নয়, বরং সেই আচরণই কর্তব্য যার দ্বারা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ উৎপাদন সম্ভব। এই

অভিপ্রায় নিয়েই নৈতিকতার প্রাথমিক সূত্রটি রচিত হয়েছে। আমাদের কি করা উচিত—তা স্থির করার জন্য সেইরূপ কর্মপন্থাকে গ্রহণ করা আবশ্যক যা সেই কর্মের দ্বারা প্রভাবিত সমস্ত মানুষের সর্বাধিক সুখ উৎপন্ন করে। এই সর্বকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নৈতিক আচরণকে চিহ্নিত করার কথা বলেন মিল ও বেন্থাম। ব্যক্তির কর্ম হবে বিশ্বজনের পক্ষে উপযোগী । সেই কারণে এঁদের মতবাদকে উপযোগবাদ বলা হয়। মনস্তাত্ত্বিক আত্মসুখবাদে বিশ্বাসী বেন্থাম এবং মিল এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, ব্যক্তির স্বভাব হলো সুখ অন্বেষণ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তি নিজের সুখ অন্বেষণ করলেও কতকগুলি নিয়ন্ত্রণের কারণে নিজের সুখ পরিত্যাগ করে পরসুখ বা সার্বিক সুখ কামনা করতে বাধ্য থাকে। বেন্থাম এই নিয়ন্ত্রণগুলিকে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বলেছেন। সেগুলি হল সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক। এই বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণগুলি আমাদের পরসুখবাদী ভাবনায় চালিত করে। সমাজে বসবাসকারী সদস্যরূপে সকলের সুখ উৎপাদন করার দায়বদ্ধতা আমাদের সকলের মধ্যে থাকা উচিত। এই চিন্তা ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েই বেন্থাম অপরের সুখকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তৎকালীন ব্রিটেনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যমূলক এবং আইন বর্জিত। সমাজের উঁচু শ্রেণী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। বেন্থামের মতে, সমাজ ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত সংস্থা। সুতরাং সামাজিক স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধী হতে পারে না। ব্যক্তির স্বার্থকে সমন্বিত করেই কেবল সামাজিক স্বার্থ পাওয়া যায়। এভাবেই বেন্থাম ব্যক্তির স্বার্থ থেকে সমাজের বা সর্বজনীন স্বার্থে উপনীত হবার কথা বলেন। এই কারণে তাঁর নিকট উপরে উল্লিখিত চারটি নিয়ন্ত্রণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে জন স্টুয়ার্ট মিল উপযোগবাদকে সমর্থন করলেও কয়েকটি বিষয়ে বেন্থামের সাথে তাঁর মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মিল বেন্থামের ন্যায় সুখের পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করার সাথে সুখের গুণগত পার্থক্যকেও স্বীকার করেন। তাছাড়া তিনি বেন্থাম স্বীকৃত চারটি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের সাথে অন্তরের নিয়ন্ত্রণের কথাও স্বীকার করেন। তাঁর মতে, অন্তরের নিয়ন্ত্রণ হল বিবেকবোধ। বিবেকবোধ হল কর্তব্যকর্ম সম্পাদন না করতে পারার জন্য যন্ত্রণা অনুভব করা। অর্থাৎ কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে আমরা উপযোগিতার নীতি অনুসরণ করি। কেননা মিলের মতে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকলেও ব্যক্তির উচিত অন্তরের কর্তব্যবোধের দ্বারা চালিত হওয়া। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের শাসন ব্যক্তির উপর আরোপিত শাসন। এ অনুমোদন ব্যক্তিকে নৈতিককর্মে বাধ্য করে। কিন্তু নৈতিকতার প্রতি যে বাধ্যতাবোধ তা ব্যক্তির উপর বলপূর্বক আরোপিত হয়। কিন্তু অন্তর্যন্তরীণ অনুমোদন হল স্বশাসিত অনুমোদন। স্বশাসিত অনুমোদন অনুপস্থিত থাকলে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা বা ব্যক্তিস্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়। তাই তাঁর মতে, বিবেকবোধ যখন

উপযোগিতার নীতি অনুসরণে উৎসাহিত করে তখনই তা কর্তব্যকর্ম বলে গণ্য হয়। উপযোগিতার নীতি অনুসারে সর্বাধিক সুখ উৎপাদনই আদর্শ। সুতরাং নৈতিক ক্ষেত্রে বেন্থাম ও মিলের বক্তব্য হলো, কর্মের পরিণাম বা ফলাফল বিচার করেই তার ভাল-মন্দ বিচার করা উচিত। যে কর্মের পরিণাম ভাল সেই কর্মকেই নৈতিক বিচারে যথোচিত বলে গণ্য করা উচিত। কর্মের পরিণামের মূল্যায়নে সেই কর্ম কতখানি সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করতে সক্ষম তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, যেহেতু উপযোগিতাবাদের উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ বা উপযোগিতা উৎপাদন। তাই ব্যক্তি তার আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরসুখের অন্বেষণে ক্রিয়া করবে। পরহিতের দ্বারা চালিত হলে সে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে বিসর্জন দিয়ে একটি সর্বজনীন লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগী হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটি সর্বজনীন হওয়ায় এবং অনুশাসন উপস্থিত থাকায় ব্যক্তির আবেগের কোন স্থান নেই । পরহিত বা পরস্বার্থ পূরণের জন্য ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি যেমন অস্বীকৃত, তেমনি পরস্বার্থ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা বা কর্মটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিনিঃসৃত নীতি এবং কর্তব্যের স্ব--অনুমোদিত অনুশাসন অনুসরণীয়। উপযোগিতার নীতি সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ায় বা নীতি অনুসরণ ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম হওয়ায় এখানে ব্যক্তিসাপেক্ষতা উপেক্ষিত, বরং ব্যক্তিনিরপেক্ষতাই সমর্থিত। ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উভয় নীতি দার্শনিকই নৈতিক ক্ষেত্র থেকে আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছাকে বর্জন করে বুদ্ধিপ্রসূত উপযোগিতার নিয়ম অনুসরণকে একমাত্র কাম্য বলে বিবেচনা করেছেন।

ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)

আবেগকে প্রতিহত করে নৈতিক নিয়ম অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে আধুনিককালের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের ভাবনায়। বুদ্ধির একাধিপত্যকে স্বীকার করে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস তাঁর মতবাদে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তিনি মনে করেন, জীবের দুটি বৃত্তি বর্তমান - জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। জীববৃত্তি নিম্নস্তরের এবং বুদ্ধিবৃত্তি হল উচ্চস্তরের। জীববৃত্তির নিম্নস্তর বলতে তিনি কামনা, বাসনা, আবেগকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তি যখন তার বিচারশক্তির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা নিম্নস্তরের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যক্তির কামনা বাসনাকে অবদমিত রাখতে সক্ষম হয় তখনই কেবল সে নৈতিক কর্মকর্তারূপে বিবেচিত হয়। বিশুদ্ধ বিচারবাদী জীবনের অনুশীলনই মানুষকে নৈতিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করে। নৈতিকতার আলোচনায় কান্ট তাই প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন ‘সদিচ্ছা’ প্রত্যয়টিকে। কান্ট ‘ইচ্ছা’ (wille) বলতে কখনও কারণ (cause) আবার

কখনও বৃত্তিকে (faculty) বুঝিয়েছেন। বৃত্তি অর্থে কান্ট ইচ্ছাকে কর্মপ্রয়াস বলেছেন। কান্টের মতে, 'wille' হল নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে মূল বিষয়। কোন আচরণের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার অভিপ্রেত আচরণটি কি তার উপরই কর্মের প্রকৃতি নির্ভর করে। ব্যক্তির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুসারে আচরণ পালনের যে উদ্যোগ তাকেই কান্ট 'wille' নামে অভিহিত করেছেন। সুতরাং কান্ট যাকে ইচ্ছা বা wille বলেছেন তা সাধারণ কামনা বাসনা (desire) নয়। যে শক্তির জন্য আমার পক্ষে কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় তাকেই কান্ট wille বলেছেন।

গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দ্য মেটাফিজিক্স অফ মরালস গ্রন্থে[১৫] কান্ট বুদ্ধির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয় প্রকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাত্ত্বিক বুদ্ধি অনুসারে ব্যক্তি কর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি হল ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তয়ায়িত করার সামর্থ্য। এই ব্যবহারিক বুদ্ধিশক্তিই কান্টের মতে wille বা ইচ্ছাশক্তি। কান্টের মতে, বুদ্ধি যখন ব্যবহারিকভাবে কার্যকরী হয় তখন তা নতুন ধরণের শক্তিতে পরিণত হয়। এই শক্তির দ্বারা সকল আচরণের জন্য নির্দিষ্ট বিধি (principle of conduct) প্রস্তুত করে সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হয়। কান্টের মতে, নৈতিক কর্ম পালনের এই ইচ্ছা হলো সদিচ্ছা। যাকে তিনি একমাত্র সৎ বলে মনে করেছেন। যার সঙ্গে কোন কামনা বাসনা, আবেগ যুক্ত নয়। সদিচ্ছা ব্যতীত পৃথিবীতে কোন কিছুকে নিঃশর্তভাবে সৎ বলা যায় না। অন্যান্য গুণ যথা, বিচক্ষণতা, সাহস, সংকল্প, অধ্যবসায় ইত্যাদি ভালো হলেও সদিচ্ছার পরিবর্তে অসৎ ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হলে মন্দ ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সদিচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিণতিতে মন্দ কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ। কান্ট সদিচ্ছা প্রসঙ্গে উদ্দেশ্যের (desire) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচালিত হন, তিনি সদিচ্ছাপ্রসূত আচরণ করেন। যথার্থ আচরণ তাই সৎ উদ্দেশ্য নির্ভর। সৎ, নৈতিক উদ্দেশ্য—নির্ভর বিষয়গুলিকে তিনি অভিজ্ঞতা—নির্ভর বিষয় থেকে পৃথক করেছেন। প্রবৃত্তি—নির্ভর কর্ম অথবা আত্মস্বার্থ তাড়িত কর্ম অভিজ্ঞতানির্ভর কর্ম এবং এ কারণে এগুলি তাঁর মতে নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না। তাঁর মতে, সদিচ্ছা নিঃশর্তভাবে ভালো বলে এর ভালোত্ব কোন শর্তপূরণের উপর অর্থাৎ কর্মের ফলাফল বা লক্ষ্য লাভের উপর নির্ভর করে না। সদিচ্ছা কোন কর্মের ফলের জন্য বা কোন উদ্দেশ্য সম্পাদনের যোগ্যতার জন্য যে সৎ তা নয়। এ কেবল নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির গুণে সৎ। অর্থাৎ এ নিজ গুণেই সৎ। এর উপযোগিতা দ্বারা এর মূল্য নির্ধারিত হয় না। সদিচ্ছা অন্তর্নিহিত মূল্যে মূল্যবান। কান্টের মতে, " Even if, by some special disfavor of destiny..., this will is entirely lacking in power to carry out its intentions; if by

its utmost effort it still accomplishes nothing, and only good will is left ...; even then it would still shine like a jewel for its own sake as something which has its full value in itself."[১৬]

কান্ট মনে করেন, সদিচ্ছার ভিত্তি হল উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। সৎ উদ্দেশ্য প্রণীত কর্মকে তিনি বিশুদ্ধ নৈতিক কর্ম বলে গণ্য করেছেন। কেবলমাত্র নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তির কর্ম পালনের উদ্দেশ্যই হবে বুদ্ধি নিঃসৃত নীতি অনুসারে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালন করা। সুতরাং কান্টের সদিচ্ছার ধারণার সঙ্গে কর্তব্যের ধারণাটি যুক্ত। কোন কর্মের নৈতিকমূল্য থাকার অর্থ কর্মটি কর্তব্যের জন্যই সম্পাদন করতে হবে। কর্তব্যবোধের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কর্মের নৈতিক মূল্য নেই। কোন ব্যক্তি যখন দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে দান করে তখন তার ঐ কর্ম পালনের উদ্দেশ্যটিকে বিচার করতে হবে। সে যদি কেবলমাত্র সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ আচরণ করে তবে তার আচরণটি কর্তব্য কর্মের অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্যবোধে পালিত না হওয়ায় নৈতিক বলে গণ্য হবে না। কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু কোন অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কৃত কর্মের নৈতিক মূল্য থাকতে পারে না। আবার যে সকল কর্মের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট অর্থাৎ, কর্তব্য দ্বারা পরিচালিত কর্ম কিনা তা স্পষ্ট নয়, তেমন কর্মকেও তিনি নৈতিক কর্ম বলে স্বীকার করেন না। যেমন, নিজের জীবনরক্ষা কর্তব্য কর্মরূপে বিবেচিত না হয়ে যদি প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যক্তি নিজ জীবনকে রক্ষা করতে তৎপর হয় তাহলে সেই কর্মেরও কোন অন্তর্নিহিত মূল্য থাকবে না। যদি কোন ব্যক্তি দূর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ ব্যতীতই জীবন ধারণ করে এবং তা যদি কোন প্রবৃত্তিবোধে না করে কর্তব্যের জন্যই করে তাহলে এমন কর্মের নৈতিকমূল্য সদর্থক বলে ধরা হবে। অর্থাৎ কর্তব্যবোধকে কান্ট এক উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। কর্তব্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কান্ট ভালোবাসা, পরোপকারিতা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নৈতিক কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। কান্টের অভিমত হলো, নৈতিকমর্যাদাসম্পন্ন কর্ম কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত কর্ম, কোন আবেগ তাড়িত কর্ম নয়।

কর্তব্যবোধ থেকে সম্পাদিত একটি কর্মের নৈতিক মূল্য নির্ভর করে উদ্দেশ্যটি নীতি অনুসারী কিনা তার উপর। তাঁর মতে, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বা ইচ্ছার মধ্যে কর্মের নৈতিক মর্যাদা নিহিত নেই , বরং ঐ কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সঙ্গে সম্বন্ধহীন যে নীতি, উদ্দেশ্যটি তার অনুরূপ হলে তবেই ব্যক্তির ইচ্ছাটি সৎ এবং নৈতিক বলে গণ্য হয়। কারণ নীতি পালন করলেই একমাত্র ব্যক্তির নিকট কর্মটি কর্তব্য কর্ম বলেই বিবেচিত

হয়। শুধুমাত্র কর্তব্যের কারণে কর্তব্য পালনই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন। কান্ট কর্তব্যের ব্যাখ্যায় নীতির আকারগত দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুগত দিককে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, কর্তব্য হল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে ক্রিয়া করার প্রতি অত্যাবশ্যকীয়তার ধারণা। কেননা তাঁর মতে, কর্তব্য এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা পরস্পর অপরিহার্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত। 'আইন' বলতে তিনি অনুভূতি বা যেকোনো প্রবণতার বিরোধী অবস্থাকে নির্দেশ করেছেন। আদেশ বা নিয়মকে অনুসরণ না করে কোন কর্ম সম্পাদন করার অর্থ হল অনুভূতির প্রেষণায় কর্ম করা। নৈতিক কর্ম হল কান্টের মতে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম—যা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কৃত কর্ম। এই আইন সর্বজনীন নিয়মকে নির্দেশ করে। তাঁর মতে, নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা এমন নীতিকে অনুসরণ করবেন যা বিশ্বজনীন নিয়ম বা নীতিতে পরিণত হবে। কেননা নিয়ম সকলের জন্য অভিন্ন। ব্যক্তির ইচ্ছা যদি এমন হয় যে সকলে ঐ ইচ্ছা অনুসরণ করতে পারে তবে তা নীতিরূপে গণ্য হবে। সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে বাধা হয় বলেই 'মিথ্যা কথা বলা', 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা' নিয়মের রূপ পেতে ব্যর্থ হয়। কান্টীয় ব্যাখ্যা অনুসারে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা থেকে কোন কর্ম করার ইচ্ছা বলতে বোঝায়, কর্মটি এমন যে তা সম্পাদন করতে ব্যক্তি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ কর্মসম্পাদন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাধ্যবাধকতা বা ঔচিত্যবোধ অনুভব করবেন। যেমন, ঋণ পরিশোধ করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তি বাধ্যতাবোধ অনুভব করবে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা। বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তার ইচ্ছাবৃত্তির আদেশ মূলত কোন শর্তের অধীন নয়। এমন আদেশকে তিনি নীতি বলে নির্ধারণ করেন। এমন নীতি সমাজ, রাষ্ট্র বা বাহ্যিক কোন নিয়ন্ত্রণমুক্ত আদেশ। এই আইন স্ব -আরোপিত। তাঁর মতে নীতি স্ব-আরোপিত আদেশরূপে ব্যক্তির মনে কর্তব্যবোধের সৃষ্টি করে। এমন ধারণা থেকে নৈতিক আদেশের দুটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—সর্বজনীনতা ও আবশ্যকতা। নৈতিক নীতি সর্বজনীন আদেশরূপে স্বীকৃত, অর্থাৎ এ আদেশ সকল ব্যক্তির জন্য ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রযোজ্য এবং এটি আবশ্যিক, আদেশরূপে বিবেচিত। ফলে সদিচ্ছা, কর্তব্য এবং নীতিকে কান্ট পূর্বতসিদ্ধরূপে গণ্য করেছেন। এজন্য তিনি নীতির বৈশিষ্ট্যরূপে সর্বজনীনতা ও আবশিকতাকে নির্ধারণ করেন। নীতির এরূপ বৈশিষ্ট্য স্বীকার করার কারণে তিনি মনে করেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধিকেই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারণ আবেগ ইত্যাদি ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলি নীতির নির্ধারক হলে নীতি সর্বজনীন হবে না, এমনকি সকলের নিকট অবশ্য পালনীয় বলেও গৃহীত হবে না। ফলে নীতিটিকে শর্তহীন আদেশ হতে হলে সেটি অবশ্যই বুদ্ধিপ্রসূত, আকারসর্বস্ব একটি নিয়মবলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এর থেকে বলা যায় আত্মপ্রেম কখনই নৈতিক কর্তব্যের ভিত্তি হতে পারে না। কারণ

আত্মপ্রেমের বিষয়গুলিকে সর্বজনীন আইনে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করা যায় না এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ স্ববিরোধিতায় পর্যবসিত হয়।

এই আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করি, দার্শনিকেরা বুদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথেই আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্র থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী। বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকারকারী রেনেসাঁ পরবর্তী দার্শনিকেরা আবার নীতির প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করে বাধ্যতাবোধের ধারণাকে নৈতিকতার সাথে যুক্ত করেছেন—যা সক্রেটিসের দর্শনে অনুপস্থিত ছিল। ফলে রেনেসাঁ পরবর্তীযুগে বুদ্ধির আধিপত্যে নৈতিকতা একটি দমনমূলক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়ে যায় বলে মনে হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে গুরুত্বহীন মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। কান্ট ব্যক্তিকে উপায়রূপে ব্যবহার না করে ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার কথা বললেও ব্যক্তির সৎ মনোভাব গঠন করার কথা বলেননি। কারণ তিনি মানব চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে কর্মের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। বেন্থাম এবং মিলের উপযোগিতাবাদেও নীতি পালনের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, নীতি পালনের ক্ষেত্রে যে বাস্তব সমস্যাগুলি উত্থাপিত হয় সেগুলিকে ব্যক্তি কিভাবে সমাধান করবে সে বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেনি। জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং জীবনের অভিজ্ঞতাকে, বিভিন্ন আবেগকে অস্বীকার করার মনোভাব লক্ষ্য করে একদল দার্শনিক এই নীতিতত্ত্বের যথার্থতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তাঁরা এই তত্ত্বের প্রায়োগিক সমস্যাগুলি উল্লেখ করে একটি ভিন্ন নীতিতত্ত্বের উপস্থাপনা করলেন।

ব্যক্তিসাপেক্ষ নৈতিকতা

বর্তমানকালের কোনও কোনও দার্শনিক ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে, অর্থাৎ ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, প্রবণতাকে নৈতিক গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী হলেও একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাক্-সক্রেটিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন কালের বহু দার্শনিকই কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ধারণাকে এবং প্রবণতা, আবেগ ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আমি এই অংশে আধুনিককালের দার্শনিক চিন্তার সাথে সেই সকল প্রাচীনকালের দার্শনিকদের মতেরও উল্লেখ করব যাঁরা আচরণে আবেগের প্রকাশকে নৈতিকতা বিরোধী বলে মনে করেননি। এই সকল দার্শনিকেরা ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে গুরুত্ব প্রদানের সাথেই নৈতিক

শুদ্ধতা রক্ষার জন্য ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও নৈতিকবোধের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। সে কারণেই চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রবণতাগুলিকে শুদ্ধ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন।

ডেমোক্রেটাস (৪৬০-৩৭০ এ. ডি)

বুদ্ধির সাথে সমানভাবে চারিত্রিক সদ্‌গুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন প্রাক্—সক্রেটিক যুগের পরমাণুবিদ ডেমোক্রেটাস। তাঁর তত্ত্ববিদ্যক আলোচনা থেকে নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। নৈতিকতা সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে ডেমোক্রেটাস প্রথম সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়বদ্ধতা, চরিত্র বিষয়ে গঠনগত চিন্তার সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি মানুষের চরিত্রের উন্নতির জন্য ঐশ্বরিক শক্তিকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, একজন ব্যক্তির আত্মসচেতনতাবোধই ব্যক্তিকে সঠিক কর্ম সম্পাদন করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির নৈতিক আচরণের লক্ষ্যই হলো শান্তি অর্জন করা বা আনন্দ লাভ করা। কষ্ট বা দুঃখকে দূরে সরিয়ে আনন্দ লাভের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। সুতরাং মানুষের নৈতিক আচরণের লক্ষ্যই হল আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত আচরণ করা। তবে আনন্দকে তিনি ইন্দ্রিয়সুখ অর্থে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, আনন্দলাভের জন্য আত্মা বুদ্ধির দ্বারা নিকৃষ্টতাকে অর্থাৎ ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়কে সংশোধন করবে। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, দৈহিক স্বাস্থ্য ব্যতীত মনের উন্নতি সম্ভব নয়। তবে ব্যক্তি আনন্দ লাভের জন্য বুদ্ধির সঙ্গে আগ্রহ, আবেগ, অনুভূতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবে। সামঞ্জস্যহীন জীবন আত্মার পক্ষে ক্ষতিকারক। এই সামঞ্জস্য স্থাপনের দ্বারা ব্যক্তি দৈহিক সুস্বাস্থ্য এবং আত্মার প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা বা আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হবে। কাজেই ডেমোক্রেটাসের মতে, মানুষের আনন্দ জাগতিক সম্পদ অর্জনের উপর নির্ভর করে না। অন্তরের সংযমের মাধ্যমেই প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়। অর্থাৎ তিনি নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগকে উপেক্ষা করেননি, বরং সংযম অনুশীলনের মাধ্যমে কামনা বাসনার আতিশয্যকে পরিহার করার কথা বলেন বা প্রজ্ঞার সহায়তায় পরিমত আবেগের উপস্থিতিতে প্রকৃত আনন্দ লাভ করা সম্ভব বলে মনে করেন। এই গ্রীক দার্শনিক মনে করেন, তিনিই ভাগ্যবান যিনি সর্বদা আনন্দে থাকেন, কেননা তার নিকট কোন বিষয় চরমভাবে কাঙ্ক্ষিত নয়। আত্মসংযম নামক গুণ তাঁর চরিত্রে থাকায় তিনি নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, কখনই ঈর্ষাকাতর হন না। তিনি তাঁর চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম। একজন প্রজ্ঞাবান, আত্মসচেতন ব্যক্তিই ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে সঠিক কর্ম পালনে সক্ষম। আত্মসচেতন ব্যক্তি বুদ্ধির নির্দেশে জীবন

অতিবাহিত করবেন, অপর ব্যক্তির মতামতের তুলনায় নিজের মতামতকে গুরুত্ব দেবে। তাঁর মতে, আত্মার উপাদান যেমন আনন্দ তেমনই আত্মার বিধি বা নির্দেশ হলো বুদ্ধি। ব্যক্তি বুদ্ধির নির্দেশে অপরের মতামতকে বিচার করবে। এরূপ ব্যক্তির জীবন 'well ordered life'।[১৭] অর্থাৎ বুদ্ধি নির্দেশিত জীবনই ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতা দান করবে। তাঁর মতে, প্রজ্ঞাকে অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায়। সুতরাং অশুভ থেকে শুভকে পৃথক করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রজ্ঞার অনুশীলন ও চর্চা করতে হবে। তাই ডেমোক্রেটাসের মতে, প্রজ্ঞার অনুশীলন ও চর্চাই নৈতিক জীবনযাপনের মূলমন্ত্র। তিনি মনে করেন, নির্বোধ ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে উৎসুক হয় যা তার অধিকারে নেই। নিজের অধিকারে প্রাপ্য বিষয়ের মূল্য মূর্খ ব্যক্তিরা অস্বীকার করে। একমাত্র প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি তার আত্মসংযমের জন্যই তার নিজের অধিকৃত বিষয়গুলিকে মূল্যবান বলে মনে করে আনন্দে থাকেন। যেসকল ব্যক্তি চরম হতাশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে তারা আত্মসংযমী না হওয়ার জন্যই হতাশার জীবন অতিবাহিত করে। ফলে আত্মসংযম ব্যক্তির সদ্‌গুণ এরূপ ব্যক্তি কখনই এমন বিষয় আকাঙ্ক্ষা করেন না যা তার নিজ ক্ষমতার অধীন নয়। ব্যক্তিজীবনে চাহিদা বা ইচ্ছাকে অবদমন করা শক্ত হলেও একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এই কারণে সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। সাহস, সংযম, লজ্জা ইত্যাদিকে তিনি চারিত্রিক ধর্ম বলেছেন যা মহৎ ব্যক্তির মধ্যে প্রবণতা আকারে বর্তমান থাকার জন্যই ব্যক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা সঠিক কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। তাঁর মতে, ঔষধ যেমন দৈহিক অসুস্থতাকে উপশম করতে সাহায্য করে, প্রজ্ঞা সেরূপ অসংযমী আবেগ থেকে আত্মাকে মুক্ত করে। সুতরাং ডেমোক্রেটাস নৈতিক বিষয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। চারিত্রিক শুদ্ধতা লাভের জন্য প্রজ্ঞাকে তিনি আবেগ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিলেও এবং প্রজ্ঞাকে আবেগের নিয়ন্ত্রকরূপে মনে করলেও জীবনে আনন্দলাভের জন্য যে আবেগের উপস্থিতিও কাম্য—একথা তিনি স্বীকার করেন।

প্রোটাগোরাস (৪৯০-৪২০ এ. ডি)

ডেমোক্রেটাসের পরবর্তীকালে সোফিস্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাস ডেমোক্রেটাসের ন্যায় মঙ্গলময় জীবনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির নিকট যা মঙ্গলময় তাই ন্যায়। তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিক আলোচনায় আচরণের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ তাঁর মতে, মঙ্গলময় জীবন যাপনের মাধ্যমেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আপেক্ষিক সত্যতায় বিশ্বাসী প্রোটাগোরাস সার্বিক সত্যের ধারণাকে প্রথমে অস্বীকার করে ব্যক্তিনির্ভর মঙ্গলের ধারণা দ্বারা ব্যক্তির

আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো, ব্যক্তি মানুষের স্বীকৃত সত্য অপরের নিকট গ্রহণযোগ্য না হলেও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে না। নৈতিক সত্যের যাচাইযোগ্যতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কোন ব্যক্তির চিন্তাই ভ্রান্ত নয়। কোনও কোনও ব্যক্তি অপর ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী হতে পারেন, সত্যতার তারতম্য হতে পারে, কিন্তু কখনই তা মিথ্যা নয়। তাঁর মতে, মানুষই সব কিছুর মানদণ্ড। 'মানুষ' বলতে তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতিকে না বুঝে ব্যক্তি মানুষকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তি মানুষই সত্যতা নিরূপণে সমর্থ। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট যা সত্য বলে প্রতীত হয়, তাই সেই ব্যক্তির সত্যতার মাপকাঠি। প্রোটাগোরাসের মতে, ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোন বস্তুগত সত্যতা নেই। ব্যক্তির সংবেদনলব্ধ বিষয় ব্যক্তির মনে যে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে তাই ব্যক্তির নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হয়। ফলে প্রোটাগোরাস নৈতিক সত্যতার বিষয়ীগত আপেক্ষিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নৈতিকতা তাঁর মতে একান্তই ব্যক্তিবিশেষের বিষয়। ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করতে সক্ষম কোন কর্মটি নৈতিক এবং কোনটি অনৈতিক। তিনি চারিত্রিক সদ্‌গুণ এবং আত্মস্বার্থ এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে এবং নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে—তা যদি ব্যক্তি অবগত থাকে তবেই সে উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করতে পারবে। এইভাবে প্রোটাগোরাস নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি মানুষকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবরূপে স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, ব্যক্তি বুদ্ধির সহায়তায় সত্য--মিথ্যার বিচার করতে সমর্থ। সুতরাং নৈতিকমূল্যবোধ, নৈতিকদায়বদ্ধতা মানুষের চরিত্রে বর্তমান। মানুষের রয়েছে চিন্তা করার, নির্বাচন করার স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা উপভোগ করার সামর্থ্য। ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তির উপর সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতাকে অর্পণ করেছেন প্রোটাগোরাস। তাঁর মতে, বুদ্ধিবৃত্তি থাকার জন্যই ব্যক্তির ন্যায়ের ধারণা অপরের ন্যায়ের ধারণার বিরুদ্ধ হবে না। তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে গুরুত্ব দিলেও তিনি ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের ধারণা অনুসারে আচরণ করার কথা বলেছেন। তবে পরবর্তীকালের সোফিস্টগণ নৈতিকতায় প্রোটাগোরাসের আপেক্ষিক মতবাদকে অস্বীকার করেন, কেননা তাঁদের মতে, নৈতিকতায় বস্তুগত সত্যতা প্রতিষ্ঠিত না হলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই সোফিস্ট দার্শনিকগণের বক্তব্য আমি পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা করেছি।

প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ বি. সি)

নৈতিকতায় বস্তুগত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হলেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো। তাঁর মতে একমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে নৈতিকতায় বস্তুগত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। জ্ঞানের যেমন সুনির্দিষ্ট আকার

বর্তমান, তেমনি নৈতিকতার কতগুলি আকার আছে। অর্থাৎ নৈতিকতার শাশ্বত আকারই সর্বজনীন নৈতিক বিচারকে সম্ভব করে তোলে। নৈতিকতার নিরপেক্ষ মানদণ্ড হলো ন্যায়পরায়ণতা। যেখানে ব্যক্তিবিশেষের বিষয়ীগত বিষয় বর্তমান থাকবে না। কেননা ব্যক্তিবিশেষের বিষয়কে নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিলে বস্তুগত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, নৈতিক আদর্শ হবে বস্তুগতভাবে সত্য এবং তা লাভ করা সম্ভব বুদ্ধির দ্বারা। কিন্তু তিনি ব্যক্তির বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিলেও ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনকেও গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। কারণ তাঁর মতে, চারিত্রিক সদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তিই বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক সত্যতাকে লাভ করতে সক্ষম। তিনি চারপ্রকার সদ্‌গুণের কথা বলেছেন। এগুলি হলো প্রজ্ঞা, সাহস, পরিমিতিবোধ এবং ন্যায়পরায়ণতা। তবে এই চারটি সদ্‌গুণের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতাকে প্লেটো প্রধান সদ্‌গুণ বলেছেন, যেহেতু এর মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মায় সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়। ন্যায়পরায়ণতার উপস্থিতি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন, তেমনই ব্যক্তির জীবনেও এটি সমানভাবে প্রয়োজনীয়। আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতার ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। প্লেটোর মতে, কোন রাষ্ট্র তখনই ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত হবে যখন ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এই তিনটি শ্রেণী হলো দার্শনিক শ্রেণী, যাঁদের তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবক শ্রেণী বলে বর্ণনা করেছেন; সৈনিক শ্রেণী বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকারী শ্রেণী এবং উৎপাদক শ্রেণী। তিনি এভাবেই আত্মার অংশগুলির মধ্যেও সমন্বয় স্থাপনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে মানবাত্মা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত- বুদ্ধি (reason), তেজ বা শক্তি (spirit) এবং কামনা (appetite)। বুদ্ধি হলো দার্শনিক শ্রেণীর গুণ; সাহস, শৌর্য বীর্য আত্মার আবেগসঞ্জাত উপাদান, যা রাষ্ট্রের সৈনিক শ্রেণী বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকারী শ্রেণীর গুণ এবং কামনা বাসনার ধর্ম হলো ক্ষুধা, যা রাষ্ট্রের উৎপাদক শ্রেণীর গুণ। আত্মার প্রধান অংশ বুদ্ধি সত্য এবং জ্ঞানকে জানতে সক্ষম। বুদ্ধির দ্বারা আত্মার বাকি অংশ সংঘবদ্ধ হয়। এটি আত্মার প্রধানতম অংশ হলেও ক্ষীয়মাণ অংশ। শৌর্য অংশ আত্মাকে কোন বিষয়ে চালিত করে। এরই ক্রিয়ায় ব্যক্তি যশ, খ্যাতি ও শক্তি লাভ করতে চায়। কামনা বাসনা হলো আত্মার শক্তিশালী অংশ। এই অংশের দ্বারা ব্যক্তি দুঃখকে পরিহার করে সুখ লাভ করতে চায়। আত্মার এই তিনটি অংশের মধ্যে শৌর্য এবং কামনার স্থান বুদ্ধির তুলনায় নিম্নস্তরে। আত্মার নিম্নতর স্তর জীববৃত্তির সঙ্গে যুক্ত বলে তা হীনচিন্তার প্রবণতাকে চরিতার্থ করতে চায়। ফলে একে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বুদ্ধি দ্বারা। শৌর্য শক্তি বুদ্ধিকে সাহায্য করে কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। প্লেটোর মতে, একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধির আধিপত্যকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিজীবনের কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। একারণে দেখা যায়, প্লেটো বুদ্ধি, শৌর্য এবং কামনার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের

মাধ্যমে মানবজীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণী যখন তাদের নিজস্ব দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালন করে এবং একশ্রেণী অন্যশ্রেণীর কার্যক্রমে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করে না তখন যেমন সেই রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ণ হয়, তেমনি যে ব্যক্তি আত্মার তিনটি অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হবেন তিনিই হবেন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এইভাবে প্লেটো ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার এবং রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতাকে অভিন্ন বলেছেন। একথা লক্ষ্য করা যায় যে, প্লেটো আবেগের কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেননি। আবেগ, কামনা বাসনা এগুলির গুরুত্বকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে বুদ্ধি দ্বারা এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন। বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই তিনি সুখ অপেক্ষা আনন্দকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। আনন্দলাভের জন্য সুখের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। পরমশুভকে লাভ করার মাধ্যমে ব্যক্তি আনন্দ উপলব্ধি করে। একজন সৎ ব্যক্তি জীবনে সুখলাভ না করেও আনন্দের উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই পরমানন্দ লাভ সম্ভব হয় ব্যক্তি যখন নিকৃষ্টমানের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখকে নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তিবিচারের দ্বারা দার্শনিক সদ্‌গুণ অর্জন করে। দার্শনিক সদ্‌গুণ প্রজ্ঞার উপর নির্ভরশীল। যিনি দার্শনিক সদ্‌গুণের নিয়ম অনুসারী কর্ম করেন, অর্থাৎ প্রজ্ঞার দ্বারা কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই কেবলমাত্র নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথা, সংস্কার, অভ্যাস, ঐতিহ্য অনুসারে লব্ধ সদ্‌গুণগুলিকে প্লেটো দার্শনিক সদ্‌গুণের ন্যায় প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি, যেহেতু এই সকল প্রথাগত সদ্‌গুণে যুক্তিবিচারের প্রাধান্য নেই। এগুলির উপর বিচার বুদ্ধির প্রাধান্য না থাকায় এগুলি কখনই নৈতিকতার সার্বিক মানদণ্ড হতে পারে না, যার দ্বারা চরম কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্লেটো নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগজাত মনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তাঁর মতে, আবেগ ইচ্ছার দূর্বলতাকে জন্ম দেয়। আবেগ হলো এমন একটি শক্তি যা আমাদের আকর্ষণ করে এবং বিপথে চালিত করে। প্লেটোর বিখ্যাত রূপক উদাহরণ হলো- একটি ঘোড়ার গাড়ির দুটি ঘোড়া। শৌর্যশক্তি এবং কামনা যারা ঘোড়সওয়ার বুদ্ধিকে মান্য করে চলে। এখানে এই রূপক একথা বর্ণনা করে যে, আবেগ আমাদের ভাল কিছু সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বাধা দান করতে এবং আমাদেরকে বিপথে চালিত করতে পারে, যদি না বুদ্ধি সেটিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা প্লেটোর মতে, কামনার অধিগত হলে তার ফলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। প্লেটো আবেগের বশবর্তী হওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন, ভালো মানুষ বা নৈতিক মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধিই আমাদের চালিত করে। তবে প্লেটোর রূপক ঘোড়ার উদাহরণ থেকে বলা যায় যে, প্লেটো নৈতিকতার

ক্ষেত্র থেকে আবেগগত অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেননি। ঘোড়সওয়ার ঘোড়াদেরকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, নৈতিকতার ক্ষেত্রেও বুদ্ধি আমাদের শৌর্য এবং কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি কখনও মানুষের জীবন থেকে শৌর্য ও কামনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেননি। তিনি মনে করেন, তিনটি বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং শৃংখলাবদ্ধভাবে কর্ম করতে সমর্থ। তাঁর কথায়, '…just actions are those which produce and maintain that harmonious condition of the psyche.'[১৮] অর্থাৎ কর্মের উৎপাদিত ফলের চরিত্রটি নির্ধারিত না করে, প্লেটো মনে করেছেন, কর্মটি পালন করার সময় প্রশান্ত মানসিকতা বজায় রাখতে পারলে তবেই আমরা কর্মটিকে ভালো কর্ম বলে অভিহিত করতে পারি। যদি কর্ম পালনের ক্ষেত্রে মনের তিনটি অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব হয় তবে সেই কর্মটিকে তিনি নৈতিক কর্ম বলে মনে করেননি। আবেগ আমাদের লক্ষ্য লাভের সহায়ক একথাকে তিনি অস্বীকার করেননি। তবে যখন আবেগ বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই ব্যক্তি নৈতিকভাবে সাফল্য লাভ করে। রূপক উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে যে, আবেগের প্রয়োজনীয়তা আছে, যা আমাদের কোন কর্মের প্রতি প্রেষণারূপে ক্রিয়া করে অর্থাৎ আবেগকে প্রয়োজন হয় প্রেষণারূপে। কর্মের উদ্দেশ্যটিকে সফল করার জন্য আবেগের প্রয়োজন হয়। আবেগ আমাদের কর্মপালনে উদ্বুদ্ধ করে। শুধুমাত্র ঘোড়সওয়ার স্বতন্ত্র ভাবে কোন স্থানে ঘোড়ারগাড়ীকে নিয়ে যেতে সমর্থ নয়। আবার ঘোড়সওয়ারের অনুপস্থিতিতে ঘোড়াদের সঠিক অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ঘোড়সওয়ার বুদ্ধি পরিকল্পনা করে বিষয়টিকে সংগঠন করে এবং সেভাবেই আমাদের অ-বৌদ্ধিক উপাদানগুলিকে চালিত করে। সুতরাং প্লেটো আবেগ নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়—এমন কথা বলেননি। বরং বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত পথে আবেগ ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি মঙ্গলময় জীবন লাভ করতে সমর্থ হন। সুতরাং বৌদ্ধিক সত্তাই আবশ্যিকভাবে একাকী মঙ্গল উৎপাদন করতে সমর্থ নয়।

এ্যারিস্টটল (৩৪৮—৩২২ বি. সি)

নৈতিক আচরণ পালনের ক্ষেত্রে প্লেটো আবেগকে বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বললেও এ্যারিস্টটল আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেন। তাঁর মতে, নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আবেগ ও বুদ্ধি উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ই ব্যক্তিকে নৈতিক কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ নৈতিক ব্যক্তির চরিত্রে আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। আবেগ ও বুদ্ধির সহাবস্থানেই ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। তবে এই দ্বন্দ্বহীন মানসিক অবস্থার অধিকারী হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সদ্‌গুণের অধিকারী হতে হবে।

সদ্‌গুণসম্পন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিই আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। নৈতিক ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের মতবাদের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের পরমকল্যাণ। তাঁর মতে, মানুষের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্করহিত কোন কর্ম উচিত কর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। যে কর্ম মানুষের পক্ষে কল্যাণকর বা মানুষের কল্যাণ সাধিত করে তাই সৎকর্ম এবং যে কর্ম মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয় বা মানুষের কল্যাণ সাধন করে না, তা অনুচিত বা অসৎ কর্ম। তবে উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুসারে কল্যাণও বিভিন্ন হতে পারে। মানুষের কাম্যবস্তু ব্যক্তিভেদে যেমন পৃথক হতে পারে তেমনি কালভেদেও একই ব্যক্তির জীবনে কাম্যবস্তুর ভিন্নতা ঘটতে পারে। কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্য কামনা করে, কেউ সম্পদ, কেউ সম্মান, কেউ আবার জ্ঞান। অর্থ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান প্রভৃতি কাম্যবস্তুর কোনটিই মানুষের জীবনে পরমকাম্য নয়। মানুষ অর্থ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান কামনা করে অন্য কোন উচ্চতর কাম্যবস্তু লাভ করার লক্ষ্যে। সর্বশেষ বা চূড়ান্ত কামনাযোগ্য হলো তাই যা সততই কামনাযোগ্য এবং শর্তহীনভাবে চূড়ান্ত কামনাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এ্যারিস্টটলের মতে, মানুষের কল্যাণ জীবনের পূর্ণবিকাশ সাধনের মধ্যে দিয়ে ঘটে থাকে। আমরা একটি ভালো অপর একটি ভালোর জন্য কামনা করি, সেই দ্বিতীয় ভালকে আবার তৃতীয় একটি ভালর জন্য কামনা করি। এভাবে আমরা কোন এক চরমভালকে লাভ করতে চাই যার ঊর্ধ্বে আমাদের কামনার বিষয় থাকে না। সেই চরম ভাল বা পরম কাম্যবস্তুকে এ্যারিস্টটল '*ইউডেমোনিয়া*' বলেছেন। *ইউডেমোনিয়া* বলতে তিনি flourishment বা উৎকর্ষতাকে বুঝেছেন। এর অর্থ হলো Living well and doing well অর্থাৎ সমৃদ্ধ জীবন যাপন এবং সমৃদ্ধ ক্রিয়া সামর্থ্য। সুতরাং তাঁর *'ইউডেমোনিয়া'*র অর্থ a good life বা একটি কল্যাণময় জীবন। মানুষের সমস্ত কামনার অন্তিম কাম্যবস্তু যে আনন্দ সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। সুতরাং এ্যারিস্টটলের মতবাদ থেকে বলা যায় যে, সর্বোচ্চ ভালো হলো তাই যা অন্য কোন বস্তু লাভের উপায়রূপে ভালো নয়, নিজ লক্ষ্যেই ভালো। ভালো বা কল্যাণ বিষয়টি ব্যক্তিগত (personal) ভালো এবং নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'কল্যাণ' বা 'ভালো' যখন উচ্চতর কল্যাণকে লাভ করার উপায়মাত্র হয় তখন সেই কল্যাণ হলো ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং কল্যাণ যখন কোন লক্ষ্যলাভের উপায় না হয়ে নিজগুণেই ভালো বা কল্যাণ বলে বিবেচিত হয়, তখন তা হয় নৈর্ব্যক্তিক কল্যাণ। এই কল্যাণ হলো এমন এক কাম্যবস্তু যাকে অন্য কোন বস্তু লাভের জন্য কামনা করা হয় না, বস্তুটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই কামনা করা হয়। এই নৈর্ব্যক্তিক ভালই হল নৈতিক জীবনের পরমভাল বা পরমকল্যাণ, যাকে লাভ করলে আর কোন কিছু কামনা করার থাকে না।

এ্যারিস্টটল তাঁর নৈতিক মতবাদে যে কল্যাণ বা আনন্দের কথা বলেছেন তা উপযোগবাদ বা সুখবাদের সুখ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির মানসিক অবস্থা। সুখবাদ অনুসারে যে কর্ম দুঃখ অপেক্ষা বেশি মাত্রায় সুখ দেয় তা ভালো কর্ম এবং যে কর্ম সুখ অপেক্ষা অধিকমাত্রায় দুঃখ দেয় তা মন্দ কর্ম। এ্যারিস্টটলের মতে, কোন কর্ম সুখদায়ক হওয়ার জন্য ভালো হয় না, বরং কর্মটি ভালো বলেই সুখদায়ক হয়। আনন্দ তাই সুখ থেকে স্বতন্ত্র্য, আবার বিভিন্ন সুখের সমষ্টিও নয়। আনন্দ হলো বিভিন্ন সুখের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করে সেই সামঞ্জস্যের অনুভূতি। সুখ কোন এক বিশেষ ইন্দ্রিয় বা বিশেষ কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আনন্দ মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বা সকল কর্মের সুসামঞ্জস্য সহযোগিতা থেকে উৎপন্ন হয়। সুখ ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী কেননা আনন্দ সমগ্রজীবনের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, আনন্দ কোন বিশেষ সময়ের মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। এ হলো আত্মার ভালোত্ব, যা যুক্ত থাকে আত্মার ক্রিয়ার মধ্যে। প্রতিটি জীবের কল্যাণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির বিশেষ ক্রিয়ার যথাযথ সম্পাদন। স্বভাবধর্ম অনুসারে বিকশিত হওয়ার মধ্যেই প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত। তবে মানুষের স্বভাবধর্ম অনুসারে ক্রিয়া বলতে বিচারবুদ্ধির ক্রিয়াকে বুঝতে হয়। বিচারবুদ্ধি অনুসৃত পথে কর্ম সাধনেই মানুষের পরমকল্যাণ নিহিত। তাই এ্যারিস্টটলের মতে, নৈতিক জীবন হলো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবন। মানুষ বিচারশীল বা চিন্তাশীল জীব হলেও মানুষের মধ্যে রয়েছে নিম্নতর প্রবৃত্তি বা পশু প্রবৃত্তি। তিনি স্বীকার করেছেন, নৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়টি হলো দ্বন্দ্বময় জীবন অর্থাৎ, নিম্নতর পশু প্রবৃত্তির সঙ্গে উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বন্দ্ব। আত্মসংযম অনুশীলনের দ্বারা কামনা বাসনাকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি ক্রমশ সদাচারে অভ্যস্ত হতে পারে। কেননা মানুষের জীবনে পশু প্রবৃত্তি ও বিচার বুদ্ধির দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করাই হলো নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ মানুষ যদি তার বিচারবুদ্ধির দ্বারা পশু প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, তাহলেই সে নৈতিক চরিত্র লাভ করতে সক্ষম হয়। এই সচ্চরিত্র গঠনের মধ্যে নিহিত থাকে আনন্দ। তাই সচ্চরিত্রবান জীবন হয় আনন্দময়। ফলে নৈতিক জীবনের জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সংযম। কিন্তু কখনই ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নয়। এ্যারিস্টটলের মতে, জৈব কামনা বাসনা হলো নৈতিক জীবনের উপাদান এবং বিচারবুদ্ধি হলো আকার। অতএব বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে ভাবাবেগ বা জৈব কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে জীবনে চরম আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। এই আনন্দ লাভের ক্ষেত্রে তিনি সুখকে বর্জন করেননি। তিনি বলেন, সৎ কার্য সম্পাদিত হলে স্বাভাবিকভাবেই সুখ তাকে অনুসরণ করে। পরিপূর্ণ আনন্দের জন্য শুধু আত্মার কল্যাণ নয়, দেহের কল্যাণ যেমন, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির প্রয়োজন বর্তমান। কিন্তু এই বাহ্য কল্যাণগুলির নিজস্ব কোন মূল্য নেই। বাহ্য কল্যাণ সৎ গুণের অধিকারী হওয়ার জন্য মানুষকে সাহায্য করে। তবে বাহ্যিক সুখ পরম আনন্দ বা

ইউডেমোনিয়া-র আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। আনন্দ তাঁর মতে নিছক অনুভূতি নয়। এ হলো আমাদের কর্ম, পালনের প্রবণতা যা সদ্‌গুণসম্পন্ন আত্মা থেকে উৎসারিত হয়। সদ্‌গুণের উপস্থিতির জন্য মানুষ প্রবৃত্ত হয় মহৎ কার্য সম্পাদনে। সেই সদ্‌গুণ অবশ্যই মানসিক সদ্‌গুণ—যা আত্মার ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এ্যারিস্টটল যে কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করেননি, আবেগ যে তাঁর নৈতিক ভাবনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে তা স্পষ্ট হবে যদি আমরা তাঁর আত্মার বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে লক্ষ্য করি। তিনি মানবাত্মার দুটি দিকের কথা বলেছেন-একটি হলো 'reason in itself' এটি আত্মার বৌদ্ধিক অংশ এবং আত্মার অপর দিকটি হলো সেটি যেটিতে আবেগের উপস্থিতি থাকলেও সেটি বুদ্ধির পথ অনুসরণ করে। (partake in reason in a way) আত্মার সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক অংশটি, তাঁর মতে নৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আত্মার অপর অংশে রয়েছে ব্যক্তির কামনা, বাসনা, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি – যা নৈতিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর মতে আত্মায় বুদ্ধি এবং আবেগের বা ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। অর্থাৎ এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে ব্যক্তিকে চালিত করতে সচেষ্ট হয়। একে অপরকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হয়। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও আবেগ উভয়ই সমান্তরালভাবে ক্রিয়া করে এবং যৌথভাবে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে। ফলে ব্যক্তির মনে উভয়ের দ্বন্দ্ব নয়, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কান্টও মনে করেন সংযমী ব্যক্তি এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে সমর্থ। কিন্তু কান্ট মনে করেন, সংযমী ব্যক্তি আবেগকে দমন করে বুদ্ধির পথ অনুসরণ করলে তার কর্মটি নৈতিক কর্ম বলা যায়। তিনি বুদ্ধি ও আবেগের সমান্তরাল অবস্থানের কথা বলেননি। কিন্তু সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আবেগকে দমন করে নৈতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। এ্যারিস্টটলের মতে, সদ্‌গুণ ব্যক্তির মনে প্রবণতারূপে বর্তমান থাকায় এরূপ ব্যক্তিকে বুদ্ধির দ্বারা আবেগকে দমন করার প্রয়োজন হয় না, ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বুদ্ধি ও আবেগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। তাই তাঁর মতে, " Virtue of character is, then a disposition to have the right feelings, and at the same time for those feelings to be in harmony with reason, so that they lead naturally to the right actions."[১৯]

এ্যারিস্টটলের মতে, সদ্‌গুণ দুধরণের—বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ ও নৈতিক সদ্‌গুণ। তাঁর মতে, ব্যক্তির বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ ও নৈতিক সদ্‌গুণের মধ্যে সমন্বয় সাধন হলে ব্যক্তি সৎ কর্ম পালন করতে পারে। বৌদ্ধিক

সদ্‌গুণ জন্মগতভাবে প্রাপ্ত হলেও নৈতিক সদ্‌গুণ বাস্তবায়িত হয় অভ্যাস দ্বারা। আমরা সৎ হই সৎ কর্ম করার মাধ্যমে, সাহসী হই সাহসী কর্ম করার মাধ্যমে। এই ভাবেই চারিত্রিক সদ্‌গুণ অর্জন হয়ে থাকে অভ্যাসের মাধ্যমে। অভ্যাসের মাধ্যমে সৎ কর্ম পালনের স্থায়ী প্রবণতা আমাদের মনে গড়ে উঠলে তখন আমরা সৎ কর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হই এবং স্বেচ্ছায় সৎ কর্ম সম্পাদন করে থাকি। যেমন পিতামাতা শিশুসন্তানকে মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেন। শিশু পিতা মাতার আদেশ মতই সত্য কথা বলে। এভাবে অভ্যাস এমন হয় যে, শিশু বুঝতে সক্ষম হয়, সত্য ভাষণের জন্যই সত্য বলা উচিত। তাই এ্যারিস্টটলের মতে, সৎ কর্ম একাধিকবার সম্পাদনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে সৎ কর্ম পালনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এভাবেই সৃষ্ট অভ্যাসবশত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কর্ম পালন করে। তাই সদ্‌গুণ এক ধরণের অভ্যাস যা স্থায়ী প্রবণতারূপে আমাদের মনে উপস্থিত থাকে।

এ্যারিস্টটলের মতে, সদ্‌গুণ হলো দুটি বিপরীত অবস্থার এক সুষম সমন্বয়। যেমন সাহসিকতা হলো 'হঠকারিতা' এবং ভীরুতার মধ্যবর্তী অবস্থা। সুতরাং সাহসিকতা হলো সদ্‌গুণ। আবার সাহসিকতা এই দুটি গুণের মধ্যবর্তী হলেও সৈনিকের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে সাহসিকতার মাত্রাভেদ আছে। সৈনিকের নিকট যা সাহসিকতা বলে গণ্য হবে, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে হয়ত বা সেটি আতিশয্য। কাজেই সদ্‌গুণকে অবস্থানিরপেক্ষভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সেই কারণে এ্যারিস্টটল বলেন, সদ্‌গুণ হলো মধ্যমপন্থা নির্বাচনের অভ্যাস। যে মধ্যপন্থা আপেক্ষিক এবং বিচারবুদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই মধ্যম পন্থা নির্বাচনের জন্য ব্যবহারিক প্রজ্ঞার প্রয়োগ প্রয়োজন। তাত্ত্বিকজ্ঞান এ ব্যাপারে কার্যকরী নয়। তবে ব্যক্তির নৈতিক জীবন নিছক ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা চালিত জীবন নয়, তা হল বুদ্ধির জীবন। তবে আত্মার বুদ্ধিময় অংশ ব্যক্তির পরমকল্যাণ লাভের জন্য বুদ্ধিবর্জিত অংশের সঙ্গে সহযোগিতা বা সঙ্গতি স্থাপন করে এবং তার ফলেই ব্যক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ফলে তাঁর দর্শনে বুদ্ধি ও আবেগ, প্রবণতা উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তিনি নৈতিক কর্ম বলতে মনের সেই অংশের ক্রিয়াকে বুঝেছেন যে অংশ বুদ্ধিকে অনুসরণ করে, তাই বলা যায় বুদ্ধি তাঁর তত্ত্বে অধিক মর্যাদা লাভ করেছে। মানুষের এই পূর্ণতা প্রাপ্তি বা কল্যাণই নৈতিক আদর্শ। এই নৈতিক আদর্শ অর্জন করতে পারলেই ব্যক্তি শান্তি বা আনন্দ লাভ করে।

সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিক মতবাদ

এ্যারিস্টটলের সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনযাপনের ধারণা আধুনিককালের দর্শন চিন্তায় ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। আমরা লক্ষ্য করি যে, আধুনিককালের দর্শন ভাবনায় ব্যক্তির বিচারকে বা তার চরিত্র গঠনের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করে ব্যক্তির কর্ম এবং কর্মের উদ্দেশ্য বিচারের প্রতিই মনোনিবেশ করা হয়েছিল। তাঁদের নীতিনির্ভরতার মানসিকতাও এ্যারিস্টটলের দর্শনে অনুপস্থিত ছিল। সমসাময়িককালের কোনও কোনও নীতিদার্শনিক আধুনিককালের বস্তুগত, নীতি-নির্ভর, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার বিরোধিতা করে। এ্যারিস্টটলের চরিত্রসংক্রান্ত আলোচনাকে পুনরায় নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করতে আগ্রহী হলেন। এঁদের মতে, নৈতিকতার চরমলক্ষ্য হলো মঙ্গলময় জীবনযাপন করা। কেননা এঁরা নৈতিকতায় ব্যক্তির কর্ম অপেক্ষা ব্যক্তির চরিত্রকেই গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক। তাঁরা মনে করেছেন, ব্যক্তির চরিত্র যদি মহৎ হয় সেই ব্যক্তি যে কর্ম সম্পাদন করবেন তা মঙ্গলময় বিষয়কেই প্রতিফলিত করবে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দার্শনিকেরা পুনরায় চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। ১৯৫৮ সালে এলিজাবেথ এ্যানস্কোম্ব তাঁর "Modern Moral Philosophy"[২০] নামক প্রবন্ধে প্রথম কর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিরোধিতা করে ব্যক্তির চরিত্র, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দানের কথা বললেন। পরবর্তীকালে ফিলিপা ফুট, ম্যাকিনটায়ার প্রমুখেরা চরিত্রকেন্দ্রিক নৈতিকতার আলোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করলেন। তবে অনেকেই সদ্‌গুণ অর্জনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেও এবং ব্যক্তির চরিত্রকে গুরুত্ব দিলেও তাঁদের মতের মধ্যে বহু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোনও কোনও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিক নৈতিকতায় কর্মের বিচারকে গৌণ বলে মনে করে চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জন করাকেই নৈতিকতার মূল বা প্রধান লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন। আবার কোনও কোনও নীতিদার্শনিক যেমন, জন রলস ব্যক্তির চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেও কান্টকে অনুসরণ করে ব্যক্তির কর্মকে এবং কর্তব্যবোধ, বাধ্যতাবোধ ইত্যাদি ধারণাগুলিকেই মূলত গুরুত্ব দিলেন। প্রথম প্রকার দার্শনিকদের মতবাদকে নীতিদর্শনে সদ্‌গুণ বিষয়ে চরমপন্থী মতবাদ এবং দ্বিতীয় প্রকার মতবাদকে নরমপন্থী মতবাদ বলা যেতে পারে। প্রথম প্রকার দার্শনিকেরা কর্ম এবং কর্মের ফলকে নৈতিক অবধারণের বিষয় বলে গণ্য করতে রাজী না। তাঁরা সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করে ব্যক্তির চরিত্রকে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আবেগ, ইচ্ছা প্রবণতাকে নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু বলে মনে করলেন। এককথায় বলা যায় তাঁরা নৈতিক মনস্তত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি Replacement Theory[২১] বলে অভিহিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দলের দার্শনিকেরা কান্টের তত্ত্বের বিশুদ্ধতা ও

যৌক্তিকতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন বলেই কান্টের কর্মসংক্রান্ত মূল্যায়নগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অথচ নিছক নীতি অনুসারে কর্মসম্পাদনের ফলে উৎপন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলেই ব্যক্তির চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কর্মের আলোচনার সাথে সাথেই চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে Reductionist View[২২] বলা হয়, যেহেতু তাঁরা কর্মের বিচারের সাথে সাথেই ব্যক্তির মনোভাব বিচার করার গুরুত্বও অনুধাবন করেছিলেন।

নরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের অভিমত

নরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের অভিমত অনুসারে, ব্যক্তির চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও, নীতিনির্ধারিত কর্মই নৈতিকতার মূল বিষয়। কর্মকর্তা নীতিকে অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির চারিত্রিক সদ্‌গুণ অর্জন প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি সৎ চরিত্রের অধিকারী না হলে নৈতিক কর্মে নীতিকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন না। প্রতিটি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সদ্‌গুণ ব্যক্তির চরিত্রে বর্তমান থাকলেই নীতি অনুসরণ করা সহজ হয়। সমসাময়িককালে উইলিয়াম ফ্রাংকেনা, গ্রেফরী ওয়ারনক প্রমুখের মতে, ব্যক্তি যদি সৎ চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে 'সদা সত্য কথা বলা উচিত'-এই নৈতিক নিয়মকে কর্তব্য বলেই গণ্য করবে। ব্যক্তি পরোপকারিতা নামক সদ্‌গুণের অধিকারী হলেই পরোপকার করাকে উচিত কর্তব্য বলে গণ্য করবে। ফলে কর্তব্যকর্ম ব্যক্তির সৎ চারিত্রিক প্রবণতা থেকেই নিঃসৃত হবে। এই সকল দার্শনিকেরা নৈতিকতায় কর্তব্য, দায়বদ্ধতা, বাধ্যবাধকতা এগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করেন না। এঁরা কর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নৈতিক কর্মের ব্যাখ্যা দানে উদ্যোগী হলেন। গ্রেফরী ওয়ারনক মনে করেন, নৈতিকতায় সঠিক কর্ম সম্পাদনের জন্য সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে চারটি সদ্‌গুণকে প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সেগুলি হলো সংযম, পরোপকারিতা, ন্যায্যতা এবং উদারমনস্কতা। তাঁর মতে, অন্যকে আঘাত করা, অপরকে দুঃখ দেওয়া সঠিক কর্ম নয়। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অন্যকে আঘাত করা হলেও সদ্‌গুণ অর্জনের দ্বারা আমরা এমন মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সদ্‌গুণ চরিত্রে অর্জন করলে ব্যক্তি অপরকে আঘাত করা অনুচিত বলে মনে করবে, সেই কর্ম করা থেকে বিরত থাকবে। ন্যায্য মনোভাবের কারণেই সকলের মঙ্গল আমাদের নৈতিক লক্ষ্য হবে, ব্যক্তি সকলকে

সহযোগিতা করবো। পরোপকারিতা নামক সদ্‌গুণ অর্জন করলে আমরা অপরকে সাহায্য করা উচিত বলে স্বীকার করবো। আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা প্রিয়জনের প্রতি অধিক মনোযোগ, আগ্রহ প্রকাশ করি এবং পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তবে সকলের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্যরূপে বিবেচনা করবো যদি ন্যায্যতা অর্জন সম্ভব হয়। কেননা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থ। নিরপেক্ষ বিচারের জন্য স্পষ্ট মন বা উদার মনের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। ফ্রাঙ্কেনাও মনে করেন, নৈতিকতায় মহৎ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম এবং সদ্‌গুণ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ অর্জনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও সদ্‌গুণ অর্জনকে মুখ্য বলেননি। তিনি নীতি অনুসরণ করাকেই মুখ্য বলে মনে করেছেন। কেননা তাঁর মতে, কর্মের প্রকৃতি দ্বারাই কর্মকর্তার বিচার করা যায়। ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তার প্রেষণা মহৎ কিনা তা যাচাই করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মটি নীতি অনুসারী কিনা—তা বিচার করতে হয়। ফ্রাঙ্কেনা একটি কর্মবাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তিনি সদ্‌গুণগুলিকে কর্মের সাথেই যুক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, কর্মই আমাদের নৈতিক অবধারণের মুখ্য বিষয়বস্তু। কর্মের উদ্দেশ্যটি বিচার করলেই ব্যক্তির মনোভাব জানা সম্ভব হবে। নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে সদর্থক মনোভাবের কারণেই তিনি মনে করেছেন কর্মের উদ্দেশ্যটি নৈতিক হবে যদি আমরা নীতি অনুসরণকেই কর্তব্য বলে মনে করি। কিন্তু তিনি একথা স্বীকার করেছিলেন যে, নীতি অনুসরণের মনোভাব যদি না থাকে তবে নীতি পালন করা সম্ভব হয় না। ফলে সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে আমাদের মনকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। আমাদের ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদি যদি নৈতিক কর্ম পালনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তবেই নীতিপালন সম্ভব হবে, তাই তাঁর মতে, '…principle without traits are impotent and traits without principle are blind.'[২৩] তবে একথা স্পষ্ট যে, তাঁরা সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও তাকে লক্ষ্য বলে স্বীকার করেননি। আবার তাঁরা সেই সকল সদ্‌গুণগুলিকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন যেগুলি নীতি পালনের জন্যই কেবল সহায়ক। অর্থাৎ চরিত্র গঠন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁরা সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন কেবলমাত্র সৎ কর্ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত মতবাদ

এলিজাভেদ এনস্কোম্ব, ফিলিপা ফুট, রোসালিণ্ড হার্ষ্টহাউস প্রমুখ চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকেরা এ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে ভালো জীবনযাপনকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। ফলে তাঁরা চারিত্রিক উৎকর্ষতার প্রতি দৃষ্টি আরোপ করতে উদ্যোগী হলেন। সমসাময়িককালের এই সকল দার্শনিকদের মতে, নৈতিকতায় ব্যক্তির কর্মকে বিচার করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ব্যক্তির সৎ মনোভাব, তার ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদিকেই তাঁরা গুরুত্ব দিলেন; ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়, পরিস্থিতির মূল্যায়নকে নৈতিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করলেন। তাঁদের মতে, কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ নিয়মকেই কেবলমাত্র অনুসরণ করা নয়, ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কেননা নৈতিকতায় কেবলমাত্র বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিলে এবং ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে নৈতিকতা আংশিক বিষয়কে প্রতিফলিত করবে। এঁদের মতে, আমরা ব্যক্তির কর্মকে মূল্যায়ন করি না, বরং ব্যক্তিকেই মূল্যায়ন করে থাকি। ব্যক্তিকেই প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি। যে মনোভাবগুলি প্রশংসিত হয় সেগুলিকেই আমরা অনুশীলন করি। এরজন্য তাঁরা সদ্‌গুণ অর্জনকে নৈতিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেন। ব্যক্তি যদি সৎ চরিত্রের অধিকারী হয় তবে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে। সেখানে কোন বাধ্যতাবোধের প্রয়োজন হবে না। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি স্থায়ী দ্বন্দ্বহীন মানসিক অবস্থার অধিকারী হওয়ায় নৈতিক কর্ম ব্যক্তির হৃদয় থেকে উৎসারিত হবে এবং কর্ম পালনের ফলে ব্যক্তি আনন্দ লাভ করবে। তাই কর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোন বাধ্যবাধকতা অনুভব করবে না, স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ন্যায়সঙ্গত কর্ম সম্পাদন করবে। রাষ্ট্র সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে কতকগুলি নিয়ম নাগরিকদের মান্য করতে বাধ্য করে। কখনও কখনও নাগরিকদের ইচ্ছার সঙ্গে সেই রাষ্ট্রপ্রণীত নিয়মের সংঘাত দেখা যায়। তথাপি সকল ব্যক্তি সেই নিয়ম মান্য করতে বাধ্য থাকেন। কেননা নিয়ম লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি পেতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ম আবশ্যিকরূপে ধার্য হয়। সেরূপ ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নীতির আবশ্যিকতা অনুভূত হয়। । "Compulsion occours where man is prevented from realizing his natural desire.'[২৪] কিন্তু সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নীতিবিরুদ্ধ নয়। এরূপ ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছা সর্বদা মঙ্গলময় বিষয়কে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে নৈতিক কর্মের কোন বিরোধ নেই। সদ্‌গুণজাত ইচ্ছা থেকেই নৈতিক কর্ম সম্পাদিত হয়। সুতরাং সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির ইচ্ছাকে সংযত করার লক্ষ্যে নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। মহৎ

ব্যক্তি তার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কর্ম সম্পাদন করে না। এরূপ ব্যক্তি আবশ্যিকভাবেই ন্যায়সঙ্গত কর্ম সম্পাদন করে। যে ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছার সঙ্গে সম্পাদিত কর্মের বিরোধিতা থাকে তাকে Continent[২৫] ব্যক্তি বা অসংযত ব্যক্তি বলা হয়। চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা ব্যক্তির চরিত্রের উপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁরা মনে করেন যে নীতি পালনের জন্য বলপূর্বক চারিত্রিক সংযম বজায় রাখা নৈতিকতার বিরোধী। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ন্যায়সংগত কর্ম পালনের জন্য নীতি অনুসরণ করেন তিনি হলেন Continent বা সংযমী ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তিকে তাঁরা নৈতিক ব্যক্তি বলে অভিহিত করবেন না। চরিত্রকে মুখ্য গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই তাঁরা সেই ব্যক্তিকেই নৈতিক ব্যক্তি বলে মনে করবেন যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। সেই অর্থে তাঁদের মতে, মহৎ ব্যক্তিই একমাত্র নৈতিক ব্যক্তি বলে গ্রাহ্য হবে। কান্ট সংযত ব্যক্তিকে নৈতিক ব্যক্তি বললেও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিতাত্ত্বিকেরা ইচ্ছাকে দমন করার কথা স্বীকার করেন না বলে বাধ্যতাবোধে কর্তব্য পালনকারী ব্যক্তিকে তাঁরা সৎ চরিত্রের অধিকারী বলে স্বীকার করবেন না। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সংযত ব্যক্তি সদৃশ নয়। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা চরিত্রে উপস্থিত মহৎ গুণগুলি থেকে নিঃসৃত হওয়ায় তার ইচ্ছা কখনই ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছা হবে না। এই কারণে মহৎ গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা আদর্শ ব্যক্তি বলে অভিহিত করি। "…the one who does good out of habit and from the inner resources of good character... is the morally superior person."[২৬]

এই আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রাক-সক্রেটিক যুগ থেকে আরম্ভ করে সমসাময়িককাল পর্যন্ত প্রধানত তিন ধরণের নৈতিক চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত একদল নীতিদার্শনিক নৈতিকতায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরূপে ঈশ্বরের আদেশ বা ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনকেই নৈতিক জীবনের লক্ষ্যরূপে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সকল দার্শনিকেরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, আস্থা অর্পণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগত মনোভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ—সকলই নৈতিকতার বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বরলাভের জন্য সেগুলি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। ব্যক্তির চারিত্রিক গুণ অর্জনের লক্ষ্য হলো ঈশ্বরলাভ। ব্যক্তির আবেগের সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও আমরা টমাস এ্যাকুইনাসের দর্শনে লক্ষ্য করেছি ঈশ্বর বুদ্ধিতে স্থিত। নৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদন, বুদ্ধির নির্দেশ অনুসরণ নয়। মধ্যযুগের নীতিদার্শনিকগণ নৈতিকতাকে সামাজিক মঙ্গল বা সমাজ জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করেননি। এমনকি ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষতা অর্জন লক্ষ্য বলে গণ্য হলেও সেটি লাভ করার জন্য ঈশ্বরানুগ্রহের প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। অগাস্টিন মনে করেন ঈশ্বরে আস্থা

থাকলেই আমরা ঈশ্বরে উপস্থিত সদ্‌গুণগুলিকে জানতে পারি এবং সেগুলি অর্জনে প্রয়াসী হয়ে থাকি। এ্যাকুইনাসের মতে, ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত চরম লক্ষ্য লাভ করা যায় না। ফলে ঈশ্বর নির্ভরতা ভিন্ন নৈতিক পথ অনুসরণ করাই সম্ভব নয়। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, নাস্তিক ব্যক্তি কীভাবে নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জন করবেন? তিনি ঈশ্বরানুগ্রহ লাভেও বঞ্চিত হবেন বলে তাঁর পক্ষে সদ্‌গুণ অর্জন করাই সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে প্রবল ধর্মবিশ্বাসের কারণেই নৈতিকতার ধারণা ধর্ম থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু সেই কালের ভাবনা পরবর্তী যুগে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, যেহেতু ধর্মবোধের আধিপত্য ক্রমশ অপসৃত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত আমরা লক্ষ্য করি একদল নীতিদার্শনিক ঈশ্বরস্বীকৃতিকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তির বুদ্ধিকেই নৈতিকতায় গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এই সকল নীতি দার্শনিক নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ববোধ, বাধ্যতাবোধ, কর্তব্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করাকে নৈতিকতার মূল লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেছেন। এঁদের মতে, বুদ্ধিমানবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়ম অনুসরণের দ্বারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। এই মতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে। নিয়ম যেহেতু সর্বজনীন এবং ব্যতিক্রমহীন সে কারণে এই সকল নীতিদার্শনিকগণ নৈতিকতার গণ্ডী থেকে ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা –সব বিষয়কে বর্জন করেছেন। এঁদের নৈতিক মতবাদে ব্যক্তির চরিত্র, ব্যক্তির সৎ মনোভাব গৌণ হয়ে পড়েছে। ন্যায়সঙ্গত, ভালো কর্ম সম্পাদনের দ্বারা সুস্থ সমাজ গঠন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়েছে। নৈতিকতা সেখানে সমাজ জীবনযাপনের হাতিয়ার বলে যেন ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয়ত বুদ্ধিনিষ্ঠ নৈতিক মতবাদের বিপরীত চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায় সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের নৈতিক মতবাদে। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ নৈতিক আচরণের জন্য ব্যক্তির মনকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য কেবলমাত্র ন্যায্য কর্ম সম্পাদনই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনও প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করলেন। সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় ব্যক্তির মনে অপর ব্যক্তির প্রতি যথাযথ আবেগ সৃষ্টির মাধ্যমে। ফলে ব্যক্তির চরিত্র গঠন অত্যন্ত জরুরী। চরিত্র ভালো হলে তার কৃত কর্মও ভালো বলে গণ্য হবে। সুতরাং ব্যক্তির মনে সঠিক আবেগ থাকা এবং সঠিক সময়ে সঠিক আবেগের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তির উদ্দেশ্য, প্রেষণা, প্রবণতাগুলি যদি সৎ না হয় তাহলে ব্যক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তির সৎ মনোভাবই ব্যক্তিকে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সমর্থ করে। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার বোধে চালিত হলে তবেই

উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত, ভালো সমাজ গঠন সম্ভব। এই সকল আবেগগুলি নৈতিক ক্ষেত্র থেকে বর্জন করার অর্থ ব্যক্তির আংশিক প্রকৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করা। নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতার জন্য কতগুলি সংযত আবেগ বা সদ্‌গুণ অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার দ্বারা ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম পালন করবে, কোন দমন বা অনুশাসনের প্রয়োজন হবে না। ফলে এ সকল সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত আবেগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং নৈতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য আবেগের ভূমিকাকে অনস্বীকার্য বলে মনে করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি আবেগ সম্পর্কে এই দুটি ভিন্ন জাতীয় মনোভাবের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। যে সকল দার্শনিকেরা আবেগকে বর্জন করে বুদ্ধির উপর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন তাঁরা কীভাবে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন তা জানা জরুরী। আবেগকে বর্জন করার কারণরূপে কী কী যুক্তি বুদ্ধি—নির্ভর নীতিদার্শনিকেরা প্রদান করেছেন এবং যুক্তিগুলির বৈধতা পরীক্ষা করারও প্রয়োজন আছে। আবার বুদ্ধি এককভাবে নৈতিক জীবনযাপনের সহায়ক কিনা সেকথা জানা দরকার। সে কারণে আমার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি কর্মের মূল্যায়ণ এবং চরিত্রের মূল্যায়ণে আগ্রহী দার্শনিকদের নৈতিকতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিষয়ে আলোকপাত করব।

তথ্যসূত্র

১। সিজউইক, হেনরী, ১৯৬৭, পৃ ২৩

২। ঐ, পৃ ২৩

৩। স্কিনীউনগু, জে. বি, ১৯৯৮

৪। ঐ

৫। অগাস্টিন, সেন্ট, ১৯৯৮

৬। অগাস্টিন, সেন্ট, ২০০৪

৭। এ্যাকুইনাস, সেইন্ট টমাস, ১৯৯৮

৮। ঐ, পৃ ১৯১

৯। ঐ, পৃ ১৯৪

১০। রুশো, মাইকেল. এস, ১৯৯৭

১১। ঐ, পৃ ৩

১২। স্টিফেন্স, ও. উইলিয়মস, পৃ ১

১৩। ঐ, পৃ ২

১৪। ব্রড, সি. ডি, ১৯৫৬

১৫। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৪৮

১৬। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৭৯, পৃ ৬০

১৭। ফ্রিম্যান, ক্যাথলিন, ১৯৪৮,পৃ ১৫

১৮। গ্রেগরী, ভেলাজকো. ওয়াই. ট্রায়োনস্কি, ১৯৯৭

১৯। বস্টক, ডেভিড, ২০০০, পৃ ৩৮

২০। এনস্কোম্ব, জি. ই. এম, ১৯৫৮

২১। স্টাটম্যান, ডানিয়েল, ১৯৯৭, পৃ ৮

২২। ঐ, পৃ ৮

২৩। ফ্রাঙ্কেনা, উইলিয়ম. কে, ২০০৩, পৃ ১২৬

২৪। শ্লিক, মরিৎ, ১৯৬২

২৫। হার্মান, গিলবার্ট, ১৯৯৯

২৬। পোজম্যান, লুইস. পি, ১৯৯০, পৃ ১১৯

সূত্রনির্দেশ

১। অগাস্টিন, সেন্ট, (১৯৯৮), 'এনচিরিওন অন ফেইথ, হোপ, এণ্ড লাভ', চান, স্টিফেন, এম এবং মার্কি পিটার সম্পাদিত *এথিক্স, থিওরী এণ্ড কনটেম্পোরারী ইস্যুস,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

২। অগাস্টিন, সেন্ট, (২০০৪), 'অফ দি মরালস অফ দি ক্যাথলিক চার্চ', অলিভার, এ, জনসন এবং এ্যানড্রিউস সম্পাদিত *এথিক্স, সিলেকশানস ফ্রম ক্ল্যাসিকাল এণ্ড কনটেম্পোরারী রাইটার্স,* নবম এডিশান, থমসন, ওয়াডসওয়ার্থ, কানাডা

৩। এ্যাকুইনাস, সেইন্ট টমাস, (১৯৯৮), 'সুমা কন্ট্রা জেনটিলেস', চান, স্টিফেন, এম এবং মার্কি পিটার সম্পাদিত *এথিক্স, থিওরী এণ্ড কনটেম্পোরারী ইস্যুস,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

৪। এনস্কোম্ব, জি. ই. এম (জানুয়ারী, ১৯৫৮), 'মডার্ন মরাল ফিলোজফি', ভলিউম-৩৩, নং-১২৪, পৃ ১-১৯

৫। কান্ট, ইমানুয়েল (১৯৪৮), *গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দি মেটাফিজিকস অফ মরালস,* প্যাটন, এইচ, জে, (ট্রান্স), হাচিসন ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন

৬। কান্ট, ইমানুয়েল (১৯৭৯), *দি মরাল ল, গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দি মেটাফিজিক্স অফ মরালস,* (ট্রান্স), প্যাটন, এইচ, জে, বি, আই পাবলিকেশন, ইন্ডিয়ান এডিশান, নিউ দিল্লী

৭। গ্রেগরী, ভেলাজকো. ওয়াই. ট্রায়োনস্কি, (১৯৯৭), 'হোয়াট ইজ ভারচু এথিক্স অল এবাউট?', স্টাটম্যান ডানিয়েল সম্পাদিত *ভারচু এথিক্স,* এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবার্গ

৮। পোজম্যান, লুইস. পি (১৯৯০), *এথিক্স, ডিসকভারিং রাইট এণ্ড রঙ,* ওয়াডসওয়ার্থ পাবলিশিং, বেলমেন্ট ক্যালিফোর্নিয়া

৯। ফ্রিম্যান, ক্যাথলিন (১৯৪৮), *এ্যানসিলা টু দি প্রি-সক্রেটিক ফিলোজফার্স,* বাসিল ব্লাকয়েল, অক্সফোর্ড

১০। ফ্রাঙ্কেনা, উইলিয়ম. কে (২০০৩), *এথিক্স,* প্রেন্টিক হল অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী

১১। বস্টক, ডেভিড, (২০০০) *এ্যারিস্টটল'স এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

১২। ব্রড, সি. ডি, (১৯৫৬), *ফাইভ টাইপস অফ এথিক্যাল থিওরী,* রুটলেজ এণ্ড কেগান পল, লণ্ডন

১৩। রুশো, মাইকেল. এস, (১৯৯৭), *সক্রেটিক,* ফিলজফি আর্কাইভস, ইনট্রোডাকশান টু সক্রেটিক এথিক্স, Sophiaomni.www.sophia.org

১৪। শ্লিক, মরিৎ (১৯৬২), *প্রবলেম অফ এথিক্স,* (ট্রান্স), রেনিন, ডেভিড, ডোভার পাবলিকেশন, আই, এন, সি, নিউ ইয়র্ক

১৫। স্টাটম্যান, ডানিয়েল (১৯৯৭), *ভারচু এথিক্স,* এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবার্গ

১৬। সিজউইক, হেনরী, (১৯৬৭), *আউটলাইনস অফ দি হিস্ট্রি অফ এথিক্স,* সেন্ট মারটিনস প্রেস, নিউ ইয়র্ক

১৭। স্টিফেন্স, ও. উইলিয়মস, *স্টোয়িক এথিক্স,* ইনটারনেট, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোজফি, ক্রেরিনটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইউ. এস. এ

১৮। স্কিনীউনণ্ড, জে. বি, (অক্টোবর, ১৯৯৮), 'দি ইনভেনসন অফ অটোনমি: এ হিস্ট্রি অফ মডার্ণ ফিলোজফি', *জার্নাল অফ দি হিস্ট্রি অফ ফিলোজফি,* ভল্যুম-৩৬, নং-৪, পৃ ৬২৭-৬৬৮

১৯। হার্মান, গিলবার্ট (১৯৯৯), 'মরাল ফিলোজফি মিটস্ মরাল সাইকোলজিঃ ভারচু এথিক্স এণ্ড ফানডামেনটাল এ্যাট্রিবিউশান এরর' ভলিউম-XCIX, পার্ট-৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিক আদর্শ : ব্যক্তিনিরপেক্ষ না ব্যক্তিসাপেক্ষ?

নৈতিকতার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানব প্রজাতি তথা মানব সমাজকে রক্ষা করা। বলা যায়, নৈতিকতা হলো একটি সক্রিয়, পরিবর্তন-প্রয়াসী পদ্ধতি যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ব্রতী। এই আচরণ অপর ব্যক্তির জীবনে, সমাজে বা ব্যক্তিগত জীবনে কোন না কোন পরিবর্তনের সূচনা করে। তাই ব্যক্তির আচরণের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। অনিয়ন্ত্রিত আচরণের ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে। কোন ব্যক্তির আচরণে ব্যক্তিগত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অপর ব্যক্তির হৃদয়েও ঘৃণা, বিরক্তি ও রাগের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। যার ফলস্বরূপ সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের শান্তি বিঘ্নিত হয়। তাই প্রতিটি সামাজিক ব্যক্তিই নৈতিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত হতে চায়। একথা সত্য যে, আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতাবশত অনেকসময় আমরা ন্যায়ের পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হই, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি উচ্চতম নৈতিক আদর্শের উপস্থিতিকে আবশ্যক মনে করি—যার আলোকে আমরা আমাদের কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হই। কোন একটি আচরণকে ভালো বা মন্দ বলে অভিহিত করতে হলে, সেটিকে প্রয়োজনে সংশোধন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন—যা অনুসারে আমরা আচরণ সম্বন্ধে কোন অবধারণ গঠন করি, আচরণটির মূল্যায়ন করি। আমাদের আচরণগুলিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী করার জন্য, সামাজিকশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, সামাজিক মঙ্গল উৎপাদনের জন্য ব্যক্তির আচরণ একটি নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে হওয়াই কাম্য। একটি মানদণ্ড বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তির আচরণকে সেই আদর্শের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, সকল ব্যক্তির আচরণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা। সে কারণে প্রচলিত নীতিতত্ত্বগুলি কোন একটি নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়—যা আমাদের দৈনন্দিন নৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করবে। নীতিনিষ্ঠ নীতিদার্শনিকেরা আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নীতি প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলি প্রকৃতপক্ষে এই আদর্শকেই প্রতিফলিত করে। "সদা সত্য কথা বলা উচিত" এই নীতির দ্বারা সৎ কর্ম পালনকেই যে আদর্শরূপে স্বীকার করা হয় সেকথা স্পষ্ট হয়। একইভাবে যখন আমরা মনে করি সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্রে সহানুভূতি নামক গুণটি উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় তখন তার অর্থ হলো, ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে।

নীতিনিষ্ঠ কর্তব্যবাদী দার্শনিকেরা, যাঁরা ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী তাঁরা ব্যক্তির আচরণের উপর কিছু নৈতিক বিধি প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, আদর্শ হলো ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা যার প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই আদর্শের উৎস কি? এটি কিভাবে নির্ধারিত হয়? এটি কি বুদ্ধি নির্দেশিত একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ অপরিবর্তিত ধারণা না ব্যক্তির মানসিকতা, আবেগ, প্রবণতা, সামাজিক পরিস্থিতির শর্তাবলী দ্বারা নির্ণীত একটি পরিবর্তনশীল মানদণ্ড? এই অধ্যায়ে আমার উদ্দেশ্য হলো নৈতিক আদর্শ বিষয়গত না বিষয়ীগত তা অনুসন্ধান করা।

আদর্শ ব্যক্তিনিরপেক্ষ

যে সকল দার্শনিক নৈতিকতাকে বিষয়গত বলে মনে করেন তাঁরা আদর্শের ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁরা আদর্শ নির্ধারণে যুক্তির উপরই নির্ভর করার পক্ষপাতী – যা আদর্শের সত্যতাকে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নিরপেক্ষভাবেই প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে। কারণ তাঁদের মতে, আদর্শ যদি যুক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে ব্যক্তির আবেগ, ভালোলাগা, পছন্দ - অপছন্দের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে তার বৈধতা বিষয়ে সংশয় দেখা দেবে। যে মানদণ্ড ব্যক্তির আচরণের বৈধতা যাচাই করবে সেটি কখনও ব্যক্তির মতামতের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হতে পারে না। নৈতিকতা যেহেতু ঔচিত্যবোধক তাই ব্যক্তিগত আবেগ দ্বারা আচরণের মূল্যায়ন করা সঠিক নয়। তাই তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বিষয়গত এবং সর্বজনীন নৈতিক আদর্শ হবে বুদ্ধিপ্রসূত। ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক আদর্শের সমর্থক দার্শনিকেরা যেমন, কর্তব্যবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট[১] উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল[২] মনে করেন, নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড হল শাশ্বত, সার্বিক - যা দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। কর্তব্যবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, নৈতিক আদর্শ হল অপরিবর্তনীয়; পরিস্থিতির পরিবর্তন বা মানুষের মনোভাব বা মতামতের পরিবর্তন দ্বারা নৈতিক আদর্শ কখনও প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হতে পারে না। কর্তব্যবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট নৈতিক আদর্শ বলতে বুদ্ধিপ্রদত্ত সর্বোচ্চ নৈতিক নিয়ম অনুসারে কর্তব্য পালনের কথা বলেছেন। এই নিয়মগুলি পরিস্থিতিনিরপেক্ষ এবং বুদ্ধিনিঃসৃত হওয়ায় এগুলি ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজ স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে না। এই নিয়মগুলির বৈধতাকে তিনি এতই মর্যাদা প্রদান করেছেন যে তাঁর মতে, ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তি বলে তিনিই গণ্য হবেন যিনি এই নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবশত নৈতিক কর্ম

সম্পাদন করবেন। বিষয়নিষ্ঠতা ও সর্বজনীনতায় বিশ্বাসী নৈতিক মতবাদ অনুসারে দেশ, কাল, পাত্র নির্বিশেষে নৈতিক নিয়ম অবশ্যপালনীয়, কারণ আদর্শ অবশ্য অনুসরণীয় বিষয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নৈতিক নিয়মগুলি বিজ্ঞানের নিয়ম থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। বিজ্ঞানের নিয়মগুলি কতকগুলি বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি কীরূপ হবে সেটি কতকগুলি নিয়মের মাধ্যমে বর্ণনা করে। এখানে প্রকৃতপক্ষে নিয়মের দ্বারা আমরা ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করি। আপেলের নিম্নমুখী পতন লক্ষ্য করেই মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কারের দ্বারা বস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়েছে। বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে নির্ধারিত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে নিয়মটি সহজেই অস্বীকৃত হয়। কিন্তু নৈতিকতার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কতকগুলি বাস্তব ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা নয়। বলা যায়, নৈতিক নিয়মগুলি একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। কি হওয়া উচিত সেটিই তার বিবেচ্য বিষয়, কি ঘটছে তা নয়। অর্থাৎ নৈতিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে পৃথক। বিজ্ঞানে প্রথমে আমাদের মনে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে একটি প্রকল্পের উদয় হয়, যাকে প্রাথমিকভাবে আমাদের মনের ধারণা বলা যেতে পারে। পরে সেই ধারণা যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হলে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলে গণ্য হয়। অন্যদিকে বাস্তব জীবনে ব্যক্তির আচরণ এবং তার প্রতিক্রিয়ারূপে অপর ব্যক্তির আচরণ প্রত্যক্ষ করে, তাদের মনোভাবগুলি যাচাই করে, ব্যক্তির আদর্শ আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজন উপলব্ধ হয়। যদি সকল ব্যক্তির সত্য ভাষণ করা স্বভাব হতো, যদি অপরের সুখের জন্য আত্মত্যাগ করাই জীবনের লক্ষ্য হতো তবে ‘সদা সত্য কথা বলা উচিত’ বা ‘পরদুঃখে কাতর হওয়া উচিত’ এ জাতীয় কোন ঔচিত্যবোধক নিয়ম বা আদর্শ নির্ণয় করার প্রয়োজন হতো না। বাস্তব জীবনে মানুষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন প্রবণতার অভাব লক্ষ্য করেই নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করার প্রয়োজন উপলব্ধ হয়। সুতরাং নৈতিক আদর্শ বা নীতি তাৎক্ষণিক কোন আবিষ্কার বা স্বজ্ঞালব্ধ কোন জ্ঞান নয়। এটি পরিস্থিতি বিচারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। বাস্তব ঘটনা এবং তার ফলকে পর্যবেক্ষণ করে, সমাজ জীবনে তার প্রতিক্রিয়া কল্পনা করে, সেগুলির মন্দ প্রভাব থেকে জনজীবনকে মুক্ত করার জন্য আমরা নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করি। এই আদর্শ একটি স্থায়িত্ব রক্ষাকারী শক্তিরূপে ক্রিয়া করে ব্যক্তির অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করে। কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র যেমন বস্তুজগতের প্রকৃতি থেকে নিঃসৃত হয়, নৈতিক আদর্শ কিন্তু ঔচিত্যবোধক হওয়ায় বাস্তব জীবন সম্পর্কিত নিয়ম হলেও বাস্তব ঘটনার সামান্যীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটি কি হওয়া উচিত সেটি ব্যাখ্যা করে বলেই বিপরীত বাস্তব ঘটনার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে আদর্শটি ভ্রান্ত হয়ে যায় না।

ভালো মন্দের ধারণাগুলি অপরিবর্তনশীল। সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা অনুচিত, জনসেবা হিতকর, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়গুলি বা ন্যায় অন্যায়ের ধারণাগুলি সর্বসমাজে, সর্বকালে এবং সর্বজনীনভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। নীতিনিষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এবং উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল নৈতিক ক্ষেত্রে যৌক্তিক এবং গাণিতিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করায় উৎসাহী ছিলেন। সিদ্ধান্তের সুনিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নৈতিক জ্ঞানকে যৌক্তিক এবং গাণিতিক জ্ঞানের সমতুল্য করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কেননা তাঁরা মনে করেন, প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক বিশ্বাসের একরূপতা থাকলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। তেমনই বলা যায়, ব্যবহারিক জীবনযাপনের সুবিধার্থেও একটি সর্বজনপ্রযোজ্য নির্দিষ্ট আদর্শ স্থাপন করা প্রয়োজন। আবার প্রতিটি ব্যক্তির ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের ধারণা সমরূপ হলে তবেই এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রত্যাশা পূরণ করতে বা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হবে। যখন আমরা কোন নৈতিক অবধারণ গঠন করি এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তির কোন কর্মের প্রশংসা বা নিন্দা করি তখন আমাদের ঐ ব্যক্তির নিকট একটা প্রত্যাশা থাকে। আমরা আশা করি আমাদের বক্তব্য অনুসারে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধন করবে অথবা প্রশংসাসূচক বাক্য শুনে সে ঐ কর্ম পালনে আরো উৎসাহ বোধ করবে। এমন প্রতিক্রিয়া সম্ভব হবে তখনই যখন ঐ ব্যক্তি আমার নৈতিকতার ধারাণার সাথে সহমত পোষণ করবে। অর্থাৎ আমি যে বিষয়টিকে ভালো বলে মনে করছি বা মন্দ বলে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছি অপর ব্যক্তিও সেই একই ধারণা লালন করছে। সুতরাং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার একরূপতা না থাকলে, একই নৈতিক আদর্শ অনুসারে চালিত না হলে পারস্পারিক প্রত্যাশা পূরণ বা নৈতিক কথোপকথন সম্ভবই হবে না। সুতরাং প্রায়োগিক প্রয়োজনের জন্যই দার্শনিকেরা সমরূপ নৈতিক ধারণা বজায় রাখার পক্ষপাতী। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিস্থিতিগত, অবস্থানগত, মনোভাবগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পার্থক্য বর্তমান থাকলেও, একই নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হতে হলে তাদের নৈতিক বিশ্বাসের একরূপতা থাকা জরুরী। আমি ও আমার প্রতিবেশী উভয়ই সমান মূল্যে বিশ্বাসী হলে তবেই সহাবস্থান সম্ভব হয়। তবে নৈতিক মূল্যের সত্যতা শুধুমাত্র নিজ সমাজের গণ্ডীতেই স্বীকৃত নয়। সমগ্র বিশ্বে একই নৈতিক মূল্যকে স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ দেশ-কাল নির্বিশেষে নৈতিকতার বিষয় হবে এক, যেখানে বিষয়ীগত সত্যতা নৈতিক মূল্য বলে স্বীকৃত হবে না। কারণ ব্যক্তিসাপেক্ষতা এই সার্বিকতার ধারণাকে স্পর্শ করতে পারে না। ব্যক্তিসাপেক্ষতা যদি নৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ইচ্ছা, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি দ্বারা আমরা চালিত হতে পারি। যখন আমরা নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য কোন আচরণ করি তখন অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অনেক সময় উপেক্ষা করি, কর্মের ফলাফলকে বিচার

করেই আচরণ করি। এক্ষেত্রে আমাদের আচরণকে পরিণত আচরণ বলা যায় না। এই জাতীয় আচরণগুলি অপরিণত বুদ্ধির ফল বলে মনে করা হয়। এই আচরণগুলি বুদ্ধি শাসিত নয়, আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্তের ফল। এ জাতীয় সম্ভাবনা আমাদের নৈতিক জ্ঞানের নিশ্চয়তাকে কলুষিত করে। বুদ্ধিই যেহেতু একমাত্র নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের সহায়ক তাই অনেক দার্শনিকেরা একমাত্র বুদ্ধিকেই নৈতিক আদর্শ গঠনের জন্য উপযোগী বলে মনে করেন। ফলে ব্যক্তির বুদ্ধিই একমাত্র সার্বিক নৈতিক সত্যতাকে লাভ করতে সমর্থ। ব্যক্তিসাপেক্ষতা দ্বারা নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করলে সেটির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সংশয় দেখা যায়। ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন অনুসারে নৈতিক আদর্শ গঠনে উদ্যোগী হলে তা ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথাযথ মানদণ্ড বলে গণ্য হতে পারে না। নৈতিক ভালোত্ব বা মন্দত্ব তাই সর্বজনস্বীকৃত একটি ধারণা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভালো-মন্দের ধারণাগুলি নির্দিষ্ট বলেই বস্তুগত মূল্যে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা মনে করেন, ঐ ধারণার ভিত্তিতেই আমরা কতকগুলি সার্বিক নৈতিক নিয়ম গঠন করতে সক্ষম যেগুলি পরিস্থিতিনিরপেক্ষভাবে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অবশ্যপালনীয় বলে গণ্য হবে। এইভাবে নৈতিকতার ক্ষেত্রে বস্তুগত সত্যতা দাবি করা হয়। এর অর্থ হলো, নৈতিক বিষয়ের ব্যক্তিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে। এই বিষয়গুলির সঙ্গে মানুষের আবেগ অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। আমরা মনে করি নির্দোষ জনগণের উপর অত্যাচার করা অন্যায়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত ইত্যাদি। নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই অবধারণগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, প্রয়োজন, চাহিদা এবং পরিস্থিতিনিরপেক্ষভাবে বাস্তবে প্রযোজ্য হবে। আধুনিক নীতিতত্ত্বগুলি আদর্শ নির্ণয়ে এই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় শব্দগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যে পরিস্থিতি ধারণাগুলি গঠন করে সেই পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে। সেগুলি আমাদের নৈতিক জ্ঞান বা নৈতিক বোধের উপস্থিতি বিচার না করে, কতকগুলি বুদ্ধি শাসিত নিয়মকে অনুসরণ করার প্রতি গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। এই নীতিতত্ত্বগুলি ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলি বুদ্ধিশাসিত ধারণা বলেই মনে করে, ফলে ধারণাগুলিকে সমাজসাপেক্ষ নয়, সর্বজনীন ধারণা বলেই গণ্য হয়।

কান্ট

কর্তব্য পালনই আদর্শ

কান্ট[৩] মনে করেন, আমরা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হওয়ায় সকলেই বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে নিজেদের নৈতিক কর্মপন্থা নির্ণয় করতে পারি। কান্ট একেই বলেছেন বুদ্ধির স্বাধীনতা। যখন কোন মানুষের ইচ্ছা তার বহিঃস্থিত কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং সর্বজনীন নৈতিক সূত্রের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে একথা বলা যায়। অর্থাৎ কান্ট একদিকে নৈতিকতাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলেছেন, কারণ তিনি কর্মের পূর্বশর্তরূপে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছেন। আবার একইভাবে নৈতিকতাকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে নৈতিক নিয়মগুলি ব্যক্তির স্বনির্ধারিত বলে মনে করেছেন। নৈতিকতাকে তিনি সর্বজনীনতার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, কারণ তিনি ব্যক্তির আবেগের চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কান্টের মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি আবেগকে গুরুত্ব না দিলেও ব্যক্তির বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার সমর্থক কান্ট ব্যক্তির বুদ্ধিকে সর্বোচ্চ নীতি গঠনের দায়িত্ব প্রদান করলেও ঐ নীতির প্রতি বৈধতা প্রমাণের জন্য সর্বজনীনতার মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন— যা নীতিটিকে ব্যক্তিসাপেক্ষতার গণ্ডী অতিক্রম করতে সাহায্য করে। তাই দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেহেতু নিজের বুদ্ধি নিঃসৃত নীতির আলোকে কর্মের ভাল-মন্দ বিচার করতে সক্ষম তাই নৈতিকতাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলতে হবে। আবার একইসঙ্গে নৈতিকতার সূত্র যা বুদ্ধি থেকে উৎসারিত তা সকল বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে বলে তিনি মনে করেছেন। ফলে নৈতিকতার সূত্রটি সর্বজনীন, অর্থাৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ হবে। কান্টের নিকট আদর্শ হল বুদ্ধির আদেশ অনুসরণ করা। কান্টের মতে, নৈতিকতার ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিনির্ভর বলে পূর্বতসিদ্ধ। এই ধারণাগুলি কোনভাবেই অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত হয় না বলে এগুলি আপতিক নয়। এই ধারণাগুলির উৎস যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধির শুদ্ধতার কারণেই এগুলি সর্বোচ্চ ব্যবহারিক নীতিরূপে মর্যাদা লাভ করে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এই বুদ্ধি-নির্ভর ধারণাগুলি মানবকেন্দ্রিক, ধর্মীয়, জাগতিক বা অতিজাগতিক কোন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত নয়। অভিজ্ঞতানির্ভর বিষয়গুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলেই এই নৈতিক ধারণাগুলি শুদ্ধ কর্তব্যরূপে, নৈতিক নিয়মরূপে ব্যক্তির মনকে আবেগের থেকে অধিকমাত্রায় প্রভাবিত করে। এভাবেই বুদ্ধি তার মর্যাদার কারণে ক্রমশ আবেগ, প্রবণতা, ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রা হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি নৈতিক আদর্শ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা শুদ্ধ প্রজ্ঞার অতিরিক্ত

অভিজ্ঞতাকেও ব্যবহার করি তবে ব্যক্তিমন তার উদ্দেশ্য নির্ধারণে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে না, যেহেতু বুদ্ধি ও আবেগের বিরোধিতা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটিতে বাধা সৃষ্টি করবে। নৈতিক জ্ঞান হলো অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান। নীতিদর্শনের অভিজ্ঞতাপূর্ব অংশটি হলো শুদ্ধ নীতিবিজ্ঞান। বুদ্ধির কাজ হলো জ্ঞানের শর্ত নির্ধারণ করা—যা জ্ঞানতত্ত্বের বিষয় এবং তা তাত্ত্বিক। দ্বিতীয় কাজ হলো নৈতিক নিয়ম নির্ধারণ করা । এক্ষেত্রে শুদ্ধ প্রজ্ঞা ব্যবহারিক বুদ্ধিতে পরিণত হয়, কারণ সাধারণ ব্যবহারিক জীবন চালিত করার জন্য নৈতিক নিয়ম উদ্ভব করার প্রয়োজন হয়। তাই এখানে শুদ্ধ প্রজ্ঞাকে শুদ্ধ ব্যবহারিক প্রজ্ঞা বলা হয়। তাই বুদ্ধিবৃত্তি নৈতিক জগতে অত্যন্ত জরুরী, যেখানে প্রবৃত্তি কোন না কোন উদ্দেশ্যের অভিমুখে ক্রিয়া করে চলেছে। তাই বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা কান্টের মতে সর্বোচ্চ ভালো যার উপর আমাদের সমস্ত সুখের চাহিদাও নির্ভর করে রয়েছে। কারণ এই শর্তনিরপেক্ষ প্রজ্ঞা আমাদের অভিজ্ঞতা লাভের, সুখলাভের উদ্দেশ্য এবং তার চরিতার্থতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ বুদ্ধি দু'ভাবে তার বিবেচ্য বিষয়কে নির্ধারণ করতে পারে। বুদ্ধির তাত্ত্বিক শক্তি বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট আকারে বিবেচনা করতে পারে, আবার বুদ্ধি তার বিবেচ্য বিষয়কে যখন বাস্তবে পরিণত করে তখন বুদ্ধির এই ভূমিকাকে ব্যবহারিক বুদ্ধিশক্তি (Practical reason) বলা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি আমাদের মধ্যে ব্যবহারিক শক্তিরূপেই বর্তমান থাকে এবং আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, বুদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এমন একটি ইচ্ছার জন্ম দেওয়া যা সৎ, যা কোন কিছু লাভ করার জন্য নয়, তা তার নিজের জন্যই ভালো। এই সৎ ইচ্ছার সামর্থ্যেই ব্যক্তি কেবলমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যই ন্যায়সঙ্গত কর্ম পালন করে, কোন স্বার্থপূরণের চাহিদা তার উদ্দেশ্যকে কলুষিত করতে পারে না।[৫]

কান্টের মতে, আমাদের নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত এমন কর্ম পালন যা বুদ্ধি নিঃসৃত নীতি থেকে অপরিহার্যভাবে সম্পাদিত হবে। তাঁর মতে, কর্তব্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কর্মের নৈতিকমূল্য থাকতে পারে না। কর্তব্য হল আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে কর্মপালনের অত্যাবশ্যকতা। কান্ট বলেন, প্রবণতার (Impluse) বিপরীত হল আইন। নীতিহীন কর্ম আমরা ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে করে থাকি। আমরা যখন কোন প্রবণতা দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করি তখন সেখানে কোন নীতি উপস্থিত থাকে না। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার কারণে যখন আমরা তার বিপদে সাহায্য করি তখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কোন কর্ম পালনের সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। 'বিপদে অপরকে সাহায্য করা উচিত'- এরূপ কোন নীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে আমরা এ জাতীয় কর্ম করি না। ফলে এ জাতীয় কর্ম অন্যায় না হলেও নৈতিক আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধিপ্রসূত নীতি প্রবণতা প্রসূত কার্যকে বাধা দান করে। এখানে নীতি বা

বিধান বলতে কান্ট সর্বজনীন নিয়মকে নির্দেশ করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিসাপেক্ষ নীতি এমন হবে যে তা বিশ্বজনীন নীতিতে পরিণত হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, বিধান বা নীতি সকল মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না, বরং সকলের জন্য বিধান অভিন্ন হবে। ফলে ব্যক্তিগত নীতি এমন হবে যা সর্বজনের নীতিতে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রেই তা বিধান বা নীতিরূপে পরিগণিত হবে। ফলে ইচ্ছাবৃত্তির আদেশকে কান্ট বিধান ও নীতিরূপে গণ্য করেন। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা হওয়ায় মানুষের সদিচ্ছা কোন শর্তের অধীন নয়। এই আদেশ প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে বলেই তা বিধানরূপে জ্ঞাত। ফলে নৈতিক আদেশই হল নৈতিক বিধান (Law)। ব্যক্তি নিজেই এ বিধানের অধীন। এ বিধান স্ব-আরোপিত। কান্ট কর্তব্য পালনের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার কোন বিষয়কে স্বীকার করেননি। নৈতিক নিয়মকে তিনি তাই বিষয়হীন বলে মনে করায় সূত্রের আকারে প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, যদি ইচ্ছা শর্তসাপেক্ষ হয় তবে তা আমাদের নির্দিষ্ট সুখলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা ঐ বিষয় লাভের জন্য আমরা কোন কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারি। এই রকম নিয়ম নৈতিক নিয়ম হতে পারে না, কেননা সেক্ষেত্রে এই নিয়ম সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকরী হবে না। যে ব্যক্তির ঐ বিষয়ে সুখ-দুঃখবোধ আছে কেবল তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। সুখ-দুঃখবোধ আমাদের বিশিষ্ট সংবেদন শক্তির উপর নির্ভর করে। বাহ্য বিষয়ের কারণে আমাদের মনে অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্ট হয় বলে আমাদের সুখ-দুঃখবোধ হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখের দ্বারা প্রভাবিত হন না বলে এ সকল ব্যক্তিগত নীতি তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নৈতিক নিয়ম সার্বত্রিক হওয়ায় সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত বিষয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া সুখের জন্য যখন আমরা কর্ম করি তখন সেই কর্মকে নৈতিক কর্ম বলা যায় না। আমাদের সুখলাভের সব চেষ্টার মূলেই আত্মপ্রীতি বর্তমান। আত্মপ্রীতি আর নৈতিকতা বিরুদ্ধ বিষয়। ফলে জাগতিক বস্তু যখন আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয় তখন তার মূলে আমাদের সুখলিপ্সা কাজ করে থাকে, যা নৈতিকতা বিরোধী। সুখ–দুঃখের বোধ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু কান্ট অভিজ্ঞতাকে নৈতিক নিয়ম নির্ধারণের উপায় বলে গণ্য করেননি। কোন বিষয়ের সংস্পর্শে আমরা সুখ পেতে পারি, তা বাস্তব অনুভব থেকে বোঝা যায়। সুতরাং কোন নিয়ম যদি বিষয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য হয় তাহলে আমাদের ইচ্ছার মূলে আমাদের অভিজ্ঞতা বর্তমান এমনই বুঝতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে কোন নৈতিক নিয়ম সিদ্ধ হতে পারে না। শুদ্ধ প্রজ্ঞা থেকেই নৈতিক নিয়ম পাওয়া যায়। অতএব কোন অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিষয় নৈতিক নিয়ম বা সদিচ্ছার নিয়ামক হতে পারে না। ফলে বিষয়বস্তুকে বাদ দিলে যে আকার অবশিষ্ট থাকে সেই আকারই শুধুমাত্র নৈতিক নিয়মরূপে আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কান্টের মতে, কোন বিষয় লাভের জন্য আমরা নৈতিক কর্ম করি না, নৈতিক নিয়মের জন্যই সেই

অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হই। আকারসর্বস্ব নৈতিক নিয়মের জন্যই আমরা ঐ নিয়ম পালন করতে বাধ্য হই। আকার অনুসারে আমরা যা করি তাই নৈতিক। কোনরকম বিষয় বাসনায় যদি কোন কর্ম করে থাকি, সে কাজের ফল যতই সুখদায়ক বা জনহিতকর হোক না কেন তার নৈতিক মূল্য থাকে না। কিন্তু যদি নৈতিক নিয়মের আকারের দ্বারাই আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ কেবলমাত্র উচিত বলেই যদি কোন কর্ম করা হয় তাহলেই সেই কর্মের নৈতিকমূল্য বর্তমান থাকে। নৈতিক দৃষ্টিতে সেই কর্মই ভাল বলে বিবেচ্য হয়।

কান্ট নৈতিক নিয়মের আবশ্যকতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাধ্যতাবোধের ধারণাটিকে নৈতিক ধারণারূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন, এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ আইন বা বিধি ব্যক্তির নিকট বাধ্যতামূলক বলে অনুভূত হবে। মানুষের নিকট নৈতিক বিধি যেন আদেশের মত আরোপিত হয়। এই আদেশের যে আকারগত রূপ তারই নাম অনুজ্ঞা (Imperative)বা আদেশ। যখন একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতি একটি বিশেষ ইচ্ছাবৃত্তির (Wille) পক্ষে বাধ্যতামূলক, তখন সেই বিশেষ নীতির ধারণাকে আদেশ (Command) বলে, আর যে আকারে সেই আদেশ প্রকাশিত হয় তাকে বলে অনুজ্ঞা (Imperative)। অনুজ্ঞা দুপ্রকার—শর্তসাপেক্ষ এবং শর্তহীন।[৬] যখন কোন অভীষ্ট লাভের জন্য কোন নীতি অনুসুরণ আবশ্যক হয় তখন সেটিকে শর্তসাপেক্ষ অনুজ্ঞা বলা হয়। যদি তুমি সফল ব্যবসায়ী হতে চাও তবে তোমাকে পণ্যের ন্যায্য মূল্য ধার্য করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি সফল ব্যবসায়ী হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে আগ্রহী হয়, তবে সে এই অনুজ্ঞাটি অনুসরণ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তির এই জাতীয় কোন মনোবাসনা নেই, তাঁর নিকট এই অনুজ্ঞাটি মূল্যহীন এবং অবশ্যপালনীয় নয়। ফলে এই অনুজ্ঞাটি হলো শর্তযুক্ত, যেহেতু কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্যই কেবলমাত্র এটি অনুসরণীয়। অপরপক্ষে যে নীতিটি শর্তহীনভাবে, সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হয় সেটি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে যুক্ত থাকে না। এইরূপ অনুজ্ঞাগুলি অনুসরণ করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কোন বিশেষ অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে বা কোন বস্তু লাভের চাহিদা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঐ কর্তব্য পালন আবশ্যক বলেই ঐ নীতি অনুসরণ করবে। সেক্ষেত্রে সেই নীতি অনুসারে কৃত কর্মের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, ব্যক্তি কেবলমাত্র কর্তব্য বলেই ঐ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করবে। কান্ট এই দুটি অনুজ্ঞার পার্থক্যে বলেন-‘ If the action would be good solely as a means *to something else*, the imperative is *hypothetical*; if the action is represented as good *in itself*, and therefore as necessary, in virtue of its principle, for a will which of itself accords with reason, then the imperative is *categorical.*”[৭] অর্থাৎ শর্তাধীন আদেশ উপায়রূপে কোন সম্ভাব্য কর্মের ব্যবহারিক

আবশ্যকতাকে প্রকাশ করে। এই আদেশ কোন কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্যে উপযোগী কর্ম পালনের নির্দেশ দেয়। ফলে শর্তযুক্ত আদেশ নৈতিক আদেশ হতে পারে না। নৈতিক আদেশ ঔচিত্যমূলক আদেশ বলে অভীষ্ট লাভের জন্য অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। এ আদেশ নিঃশর্তরূপে অনুসরণযোগ্য। ফলে শর্তহীন আদেশই নৈতিক আদেশ যা কোন কর্মকে বাহ্যিক ফললাভের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাব্যতিরেকে আবশ্যকরূপে অনুসরণীয় বলে মনে করে। আকারগত শর্তহীন অনুজ্ঞা এমন বিষয় যে ইচ্ছাবৃত্তির পক্ষে এই অনুজ্ঞার বিপরীত কোন কর্মপন্থা নির্বাচন করা সম্ভব নয়। কোন বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত ইচ্ছাবৃত্তির নীতিকে আইন বলা যায় না, যেহেতু ঐ নীতিটি অভিজ্ঞতা নির্ভর। কিন্তু বুদ্ধিপ্রসূত নীতিটি কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করে না বলেই এটি চরম আদেশ বলে গৃহীত হয়। এই কারণে একমাত্র শর্তহীন অনুজ্ঞার মধ্যেই আইনের অপরিহার্যতা লক্ষ্য করা যায়। অতএব কান্ট মনে করেন যে, অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিষয়গুলি পৃথক করতে পারলে তবেই নীতিদর্শনের আলোচনায় অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলতাকে রোধ করা যাবে।

কান্টের মতে, শর্তহীন অনুজ্ঞাই একমাত্র আমাদের কর্মনীতির নির্দেশক পন্থারূপে নির্বাচিত হতে পারে। এই শর্তহীন অনুজ্ঞা কীভাবে আমাদের কর্মপন্থার নির্দেশক হয় তার ব্যাখ্যায় কান্ট বলেন, আমাদের কৃতকর্মকে নৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে হলে প্রথমে আমাদের ঐ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নীতিকে (maxim) সনাক্ত করতে হবে। কেননা ব্যক্তিগত নীতিটি (maxim) হল ব্যক্তির নির্বাচিত ব্যক্তিগত নীতি (Subjective Principle)—যা অনুসরণ করে কোন ব্যক্তি কোন নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। সেই ব্যক্তিগত নীতিটির উদ্দেশ্য বুদ্ধিপ্রসূত কিনা তা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে। কেননা ঐ ব্যক্তিগত নীতি বুদ্ধিপ্রসূত হলে তবেই সকল ব্যক্তিই ঐ একই নীতি প্রয়োগ করতে সমর্থ হবেন। কান্টের মতে, একমাত্র যুক্তিবোধসম্পন্ন কর্মকর্তার পক্ষেই ব্যক্তিগতনীতির (maxim) আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব। কারণ কেবলমাত্র যুক্তিবোধসম্পন্ন কর্মকর্তাই তার উদ্দেশ্যের সামাণ্যীকরণ ঘটাতে পারে। ব্যক্তি যাচাই করে যে, তার কর্মের জন্য নির্ধারিত নীতিটি সকলের ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নীতিরূপে গ্রাহ্য হতে পারে কিনা। যদি দেখা যায় ব্যক্তি তার কর্মের নীতিটিকে কেবলমাত্র নিজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী এবং সকলে সেটি অনুসরণ করলে সমস্যা সৃষ্টি হবে তবে ঐ ব্যক্তিগত নীতিটি নৈতিক নিয়ম বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ তাহলে বলতে হবে ঐ নীতিটি ব্যক্তিগত আবেগ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা কর্তব্যবোধে চালিত হয়ে কোন নীতি নির্ধারণ করে তবে তার ঐ ব্যক্তিগত নীতিটি সকলের নীতিরূপে গণ্য

হতে পারে। কারণ সেটি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য গঠিত হয়নি। প্রতিটি ব্যক্তিগত নীতি এভাবেই সামাণ্যীকরণের মাধ্যমে পূর্বতসিদ্ধ নৈতিক নিয়মে পরিণত হয় যা যেকোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তিগত নীতির ভিত্তি ইন্দ্রিয়জাত প্রবৃত্তি, কান্টের মতে তা হল পরতঃসাধ্য ব্যক্তিগত নীতি। অপরদিকে ব্যক্তি যখন কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য আচরণ করে তখন সে পূর্বতসিদ্ধ বা আকারসর্বস্ব ব্যক্তিগত নীতি (a priori or formal maxim) অনুযায়ী কাজ করে। যেহেতু আকারসর্বস্ব ব্যক্তিগত নীতি বস্তুত শূন্যগর্ভ, অর্থাৎ এর কোন বিশেষ বিষয়বস্তু থাকতে পারে না তাই একমাত্র এরকম নীতি অনুসরণ করেই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আচরণে অংশ নেওয়া যায়। কান্ট ব্যক্তিগত নীতিকে আকারসর্বস্ব অভিজ্ঞতাপূর্ব নীতি বলেছেন যা নির্দিষ্ট কোন বাস্তব শুভফল উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্ধারিত হয় না। ফলে এই ব্যক্তিগত নীতি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তাই এই নীতি সার্বিক নীতিতে পরিণত হয়। তাই কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞায় বলা হয়, এমন ব্যক্তিগত নীতি অনুসারে আচরণ করা কর্তব্য যে নীতিটিকে একই সঙ্গে সর্বজনপ্রযোজ্য বিধানরূপে অনুমোদন করাও সম্ভব।[৮] কান্ট দৃষ্টান্তের সাহায্যে স্পষ্ট করেছেন কীভাবে ব্যক্তিগত নীতি একটি সার্বিক নীতিতে পরিণত হয়, যা আমাদের সকলের নিকট অবশ্যপালনীয় আদর্শরূপে স্বীকৃত হয়। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আমাদের নিকট আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে কিনা - তা নির্ণয় করতে হলে আমরা দেখি এমন অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যেখানে আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সাহায্যে কোন সুবিধা লাভ করতে পারি। কিন্তু আমাকে বিচার করতে হবে যে, ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানের নীতিটি সার্বিক নীতিরূপে আমার নিকট গ্রাহ্য কিনা। যখন মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদানের নীতিটিকে সার্বিক নীতিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে তখনই দেখা যাবে ব্যক্তিগত নীতিটি আত্ম-অসঙ্গতির সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ সকলেই ইচ্ছামত প্রতিশ্রুতি দেবেন এবং তা ভঙ্গ করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি প্রতিশ্রুতি দান করে এবং তা রক্ষা না করে তাহলে 'প্রতিশ্রুতি' শব্দটিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। কাজেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির নিয়মটিকে সার্বত্রিক ভাবতে গেলে সেই নিয়মটি আত্মবিরোধী হয়, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে। কান্ট বলেন, ব্যক্তিগত নীতিটি যদি সার্বিক নীতির বিরোধী হয় তাহলে সেই ব্যক্তিগত নীতিটিকে বর্জন করতে হবে। ঐ ব্যক্তিগত নীতি প্রয়োগ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দেখা গেল কান্ট আদর্শ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছাকে তিনি ব্যক্তিসাপেক্ষতামুক্ত ইচ্ছারূপে গঠন করতে বলেছেন। এই ইচ্ছা আদর্শ অনুজ্ঞার আকারে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে কর্ম পালন করে বলে ন্যায্যতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে

ব্যক্তিসাপেক্ষতার কোন প্রভাব থাকে না। কারণ কোন বিশেষ চাহিদা পরিপূরণের উপায়রূপে এ নীতি রচিত হয় না। কিন্তু এ নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছার ভূমিকাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। তাই ঐ আদর্শ, যা ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে বুদ্ধির সর্বোচ্চ নীতিরূপে নির্ধারিত হয়েছে সেটিকে ব্যক্তির ইচ্ছায় স্থাপন করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছাই ঐ নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেহেতু ব্যক্তিগত নীতিটির সার্বিক নীতিতে উত্তরণ ঘটবে। কিন্তু ঐ নীতি ব্যক্তির মনে স্থাপন করার জন্য তিনি ব্যক্তির ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ইত্যাদি ব্যক্তিসাপেক্ষ বৃত্তিগুলি থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিপ্রসূত ইচ্ছাবৃত্তিরূপে গঠন করতে বলেছেন। সেক্ষেত্রেই কেবল ঐ ইচ্ছা, যা কেবলমাত্র বুদ্ধিচালিত সেটি আদর্শ নীতি গঠনে সক্ষম হবে। এভাবেই ব্যক্তিসাপেক্ষ নীতিটি সর্বজনীন নীতিতে পরিণত হবে। শর্তহীন অনুজ্ঞা ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে অভিন্ন হবে। কিন্তু এরূপ অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তির মনকে সমস্ত আবেগ মুক্ত হতে হবে। ব্যক্তি নিজের মনকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে। ইচ্ছার উত্তরণের মাধ্যমে একান্ত ব্যক্তিনির্ভর বিষয়গুলি উপেক্ষা করে ব্যক্তি ঐ শর্তহীন আদেশের আকারেই নিজের ইচ্ছাবৃত্তিকে আকারিত করবে। কারণ নীতিটি বিশুদ্ধ বুদ্ধিপ্রসূত হওয়ায় ব্যক্তিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করার, সেগুলিকে দমন করার শক্তি দেবে। কান্ট ব্যক্তির চাহিদার প্রকৃতি বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তিনি মনে করেছেন যে, চাহিদা ব্যক্তির ইচ্ছাকে সংকীর্ণতার পথে চালিত করে। সে কারণেই বুদ্ধির সাথে ঐ ইচ্ছার দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক। তিনি মনে করেছেন, ঐ দ্বন্দ্বকে দমন করে, ব্যক্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করে, বুদ্ধির আদেশ অনুসারে কর্ম পালন করলে তবেই ব্যক্তিকে নৈতিক আদেশ অনুসারী কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি বলে গণ্য করা সম্ভব। সুতরাং তাঁর দর্শনে তিনি ইচ্ছার শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য আবেগ ইত্যাদিকে দমন করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি এই দ্বন্দ্বকে উৎপাটন করার জন্য চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনের কথা বলেননি। কারণ তিনি ইচ্ছার একটি অংশকেই, অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রসূত ইচ্ছাবৃত্তিকেই নৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই অপর অংশের সাথে যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থিত হয় সেই দ্বন্দ্বকে দমন করে বুদ্ধির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এইভাবেই বুদ্ধিপ্রসূত নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ব্যক্তিনিরপেক্ষতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে নৈতিক আদেশ পালনকে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকেই তিনি নৈতিক জীবনের আদর্শ বলে মনে করেছিলেন।

জন রলস

পরবর্তীকালে কান্ট অনুসারী দার্শনিক জন রলস একইভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধিপ্রসূত নীতি নির্ধারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রলস যদিও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলি পরিচালনার জন্য কতকগুলি নীতি নির্ধারণের কথা বলেছিলেন, তা সত্ত্বেও আমি তাঁর মতাদর্শটি এখানে আলোচনা করতে আগ্রহী, যেহেতু তিনিও মনে করেছিলেন, ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়ের দ্বারা ন্যায়ের ধারণাটি কলুষিত হতে পারে। কান্টকে অনুসরণ করে রলসও বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই নীতি নির্বাচন করার কথা বলেছিলেন। কান্টের ন্যায় রলসও মনে করেন, ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলি যদি নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে তাহলে নীতিগুলি কখনই সর্বজনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী হতে পারে না। তিনি যদিও ব্যক্তির কর্তব্য বিষয়ে কথা আলোচনা না করে সামাজিক কাঠামোয় ন্যায় প্রতিষ্ঠা কীভাবে সম্ভব তা আলোচনা করেছেন, তবুও তাঁর দর্শন আলোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয় যে, ঐ নীতিগুলির মাধ্যমে তিনি একটি নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক সবই নির্ধারিত হয় সাম্যের ধারণার ভিত্তিতে। সমাজে সকল ব্যক্তির অধিকার সমান--এই মনোভাবই সুস্থ সমাজের ভিত্তি। কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার অপরব্যক্তির তুলনায় কম বা বেশি হতে পারে না—এই সাম্যের ধারণাই ব্যক্তির মনে ন্যায়ের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে। সমাজে ব্যক্তি তার নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে। এই নির্ধারিত কর্মপন্থা যদি নির্দিষ্ট ন্যায্যতার নীতি অনুসারে না হয় অর্থাৎ, সমাজ ও অন্য ব্যক্তিদের নির্ধারিত কর্মপন্থার সাথে যদি ব্যক্তির কর্মপন্থার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ভিন্ন প্রকার বলে নিজস্ব চাহিদা পরিতৃপ্তির চেষ্টায় অপরব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাই সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্যে, সমাজের অগ্রগতির জন্য নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই নীতি হবে সকলের জন্য সমান। অর্থাৎ সকলের কর্মপন্থা নির্ধারণের ঐ নীতি হবে সকল ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত ন্যায্য নীতি। এই নীতিকে তিনি সামাজিক ন্যায্যতার নীতি বলেছেন। এই নীতি হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক অধিকার, কর্তব্যনির্ধারক নীতি। এই নীতি অনুসরণের দ্বারা সামাজিক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতা ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করবে। এই কারণে তাঁর মতে, ন্যায্যতা হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সদ্‌গুণ।

রাজনৈতিক উদারপন্থায় বিশ্বাসী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রলস মনে করেছিলেন, নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করবে এবং এই নীতিগুলি প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা ও মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে। সার্বিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি মনে করেছলেন, এই নীতিগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হবে না এবং এগুলি প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা আবশ্যক বলে গণ্য হবে। কেননা এই ন্যায্যতার নীতি বৈষম্য দূর করতে সক্ষম। একেই তিনি Justice as fairness[৯] বলেছেন। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নীতিগুলিকে তিনি সামাজিক প্রয়োজন এবং গঠন অনুসারে নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ এই নীতিগুলি যে সমস্ত সমাজেই একইরূপ হবে এমন কথা তিনি বলেননি। যদি সমস্ত ব্যক্তি নীতিগুলির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং নীতিগুলি যদি আমাদের স্বজ্ঞা নির্ধারিত পূর্বনির্ধারিত ধারণাগুলির বিরোধিতা করে তবে সেগুলি প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যায়। এ জন্যই তিনি 'Reflective Equilibrium'[১০]বা প্রতিবিম্বিত ভারসাম্যের ধারণাটি তাঁর তত্ত্বে যুক্ত করেন। তিনি মনে করেছিলেন, যে ন্যায় নীতিগুলি আমাদের সাধারণ স্বজ্ঞালব্ধ ধারণাগুলিকে বিঘ্নিত করবে না, সেগুলিই গ্রহণযোগ্য। সেইজন্য তিনি প্রতিবিম্বিত ভারসাম্যের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ন্যায়ের নীতির সাথে পূর্বনির্ধারিত প্রচলিত ধারণার ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং কোন নীতি অনুসারে কোন বিধানটি বা কোন কর্মপালন করা হবে সেটি আমরা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবো। অর্থাৎ আমাদের সার্বিক নীতিটিরই প্রতিফলন ঘটবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে। এরূপ আদর্শ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যদি আমরা নিজেদের স্বার্থপূরণের জন্য নীতিনির্ধারণ না করে, সমাজের সকলের জন্য নীতিগুলি প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হই। রলস সেই কারণে বলেছেন, নীতি নির্ধারণের সময় আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চাহিদা, সামাজিক অবস্থান, আমাদের বৌদ্ধিক সামর্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন না থাকা উচিত। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিষয়ের দ্বারা ন্যায়ের নীতিটি প্রভাবিত হয় না। তাঁর বিখ্যাত ধারণা 'Vail of ignorance'[১১] বা অন্ধকারের আবরণ নীতির সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই স্বীকৃত হয়েছিল। তিনি মনে করেছেন যে, আমরা প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান অর্জন করি এবং আমাদের জীবনের পরিকল্পনা অর্থাৎ, আমরা জীবনে কি হতে চাই বা কীরূপ জীবনযাপন করতে চাই তা নির্ধারিত হয় এই সামাজিক অবস্থান অনুসারে। ফলে সামাজিক বৈষম্যের সূচনা হয় জন্মের সময় থেকেই। এই বৈষম্য দূর করার জন্যই এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি ন্যায্যতার নীতিগুলি নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। সুতরাং এই ন্যায্যতার নীতিগুলি নির্ধারণ করার কালে কখনই কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক অবস্থান প্রতিফলিত হওয়া

উচিত নয়। তাই তিনি মনে করেছেন নীতিনির্ধারণ পক্ষপাতহীন হবে তখনই যখন নীতিনির্ধারক ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্মরণে না রেখে নীতিনির্ধারণ করবে। এই প্রাথমিক অবস্থাকে তিনি তুলনা করেছেন রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের সাথে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই একটি সাম্যের অবস্থায় বিরাজ করত। প্রত্যেকের মর্যাদা সমান হলেই একমাত্র এই নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি কোনরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে না।

কিন্তু একথাও সত্য যে, রলস বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা নীতি নির্ধারণের কথা বললেও এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি না দিলেও তিনি পারস্পরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেছেন, মানুষ যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব তাই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার, মনোভাব না থাকলে কখনই এই নীতি নির্ধারণ করা এবং সেগুলি অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর তত্ত্বে 'purity of heart'--এর ধারণাটির উল্লেখ করেন। রলস বলেন, "Purity of heart, if one could attain it, would be to see clearly and to act with grace and self-command from this point of view."[১২] এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রলস যদিও সাম্যের কথা বলেছিলেন তিনি কিন্তু আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেননি। তিনি অজ্ঞানতার আবরণের দ্বারা আত্মার শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যাতে প্রতিটি ব্যক্তি নৈতিকভাবে উন্নত ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং পক্ষপাতহীন আচরণে সক্ষম হয়। তবে অন্যের জীবনের পরিকল্পনায় বাধাদান না করার সাথে সাথেই প্রতিটি ব্যক্তি যেহেতু আত্মসচেতন তাই তারা তাদের জীবনের প্রয়োজনকেও উপেক্ষা করবে না। একথা তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে উল্লেখ করেছিলেন যে, অজ্ঞানতার আবরণ কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে আবৃত করে রাখলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সুযোগ, ক্ষমতা, সম্পদ, উপার্জন ইত্যাদিগুলি যে প্রাথমিকভাবে জীবনযাপনের জন্য ভালো সে বিষয়ে ব্যক্তি সজাগ থাকবে। সুতরাং রলস বুদ্ধি অনুসারে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বজনীনতাকে গুরুত্ব দিলেও ব্যক্তিগত মঙ্গলকে কখনও উপেক্ষা করেননি। অজ্ঞানতার আবরণের কথা বলেছিলেন কেবলমাত্র পক্ষপাতশূণ্য, সহযোগিতামূলক মনোভাব ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ইচ্ছা, চাহিদাকে উপেক্ষা করেছিলেন। সুতরাং কান্টকে অনুসরণ করলেও আমরা দেখছি তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করেননি। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্বকে স্বীকার করলেও এবং নীতিগুলি সর্বজনস্বীকৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও, তিনি সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে নীতিগুলি পরিমার্জন করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেননি।

আমরা লক্ষ্য করলাম, কান্ট এবং রলস উভয় দার্শনিকই সর্বজনীনতাকে মূল লক্ষ্য বলে মনে করেছিলেন। সে কারণেই বুদ্ধি অনুসারেই এমন আদর্শ স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন যে আদর্শটি সকলে পালন করতে বাধ্য থাকবে। তাঁরা আবেগকে বুদ্ধির বিরোধী বলে চিহ্নিত করেছেন, সেহেতু বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্ব আমরা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে অনুভব করি। আবেগ যেহেতু একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় তাই সেই আবেগ সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার উপায় বলে গণ্য হতে পারে না বলেই আবেগের ব্যবহার আদর্শ গঠনের অনুকূল পথ নয়। যে বুদ্ধি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তার উপর তাঁরা নির্ভর করতে চেয়েছেন, যেহেতু বুদ্ধিনিঃসৃত আদর্শ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। বুদ্ধির বিরোধী বলেই আবেগ তাঁদের নিকট ত্যাজ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাছাড়া আবেগ ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক বলে তার সর্বজনগ্রাহ্যতার অভাব রয়েছে। সে কারণেই তাঁরা ব্যক্তিনির্ভর বিষয়টির দ্বারা আদর্শের যাথার্থ্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে মনে করেছেন।

আদর্শ ব্যক্তিসাপেক্ষ-

পূর্বে আলোচিত নীতিদার্শনিকদের অন্যতম দাবি হলো নীতিবিদ্যাকে একটি আদর্শমূলক বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করা, যার উদ্দেশ্য হবে কতকগুলি বিষয়গত নৈতিক নিয়ম নির্ধারণ করা। তাঁরা নীতিগুলিকে বিষয়গত বলে মনে করেন। কারণ তাঁদের মতে, নৈতিক মূল্যের ব্যক্তিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে। ভালো-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় কোনভাবেই ব্যক্তির মত বা পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। নৈতিক অবধারণগুলি প্রকৃত অর্থে সত্য বা মিথ্যা হয়, সত্য বা মিথ্যা বলে প্রতিভাত হবে এমন নয়। অর্থাৎ নৈতিক অবধারণের সত্যতা কোন ব্যক্তির মতামত নির্ভর হবে না। অন্যভাবে বলা যায়, নৈতিক আদর্শ অনুসারে গৃহীত নৈতিক অবধারণের সত্যতা কোনভাবেই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর হবে না। অর্থাৎ ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা নৈতিক অবধারণের বৈধতার প্রমাণ নয়। নৈর্ব্যক্তিক সত্যতার ধারক নৈতিক অবধারণ বৈধ হবে, যদি সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীর নিকট ঐ অবধারণটি সত্য বলে গৃহীত হয়। ইমানুয়েল কান্ট, জন স্টুয়ার্ট মিল ইত্যাদি দার্শনিক, যাঁরা নৈতিক আদর্শরূপে কতকগুলি বুদ্ধিপ্রসূত নীতি বা নিয়মের কথা বলেন, মনে করেন নৈতিক আদর্শ হল বুদ্ধিপ্রসূত নিয়ম যেগুলি সকল ব্যক্তি নৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ন্যায়নিষ্ঠবান হতে সক্ষম হবেন। কারণ তাঁদের মতে, ব্যক্তির মঙ্গলময় জীবন নয়, নৈতিক কর্ম পালনই নৈতিক জীবনের আদর্শ বা লক্ষ্য। তাঁদের মতে, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির কর্মের বিচারই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু। ফলে ব্যক্তি নৈতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষাকে, পরিবেশ পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে নীতি দ্বারা চালিত হবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বুদ্ধিপ্রসূত

নীতিগুলি সকল পরিস্থিতিতে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এছাড়া নীতিগুলি ব্যক্তিকে অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্রকে, তার প্রবণতা, মানসিকতাকে উপেক্ষা করে। ব্যক্তির চরিত্র এবং কর্মের মধ্যে একটা বিভাজন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করে। কারণ ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতা নয়, ব্যক্তির কর্মই একমাত্র বিবেচ্য হয়। নৈতিকতা কেবলমাত্র কর্তব্য পালন ও উপযোগিতা উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভালো জীবনযাপন কীভাবে সম্ভব—এ প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থেকে যায়। এই কারণে নীতিবিদ্যায় একদল নীতিদার্শনিক ব্যক্তির কর্মকে নয়, ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিলেন। ব্যক্তির কর্ম নয়, নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত কর্তব্যপালন নয়, ব্যক্তির জীবনে নৈতিক উত্তরণই আদর্শরূপে বিবেচিত হল। চরম মঙ্গলময় জীবনে উত্তরণের লক্ষ্যে ব্যক্তির চরিত্রে কতকগুলি আবেগের উপস্থিতির আবশ্যকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হল। এই আবেগগুলি অবশ্যই নৈতিক সদ্‌গুণ বলে বিবেচ্য হবে। যেমন বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা, উদারতা ইত্যাদি। তাঁরা মনে করেন, নৈতিক জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ফলে কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ব্যক্তির যথাযথ ইচ্ছা, মনোভাব, প্রবণতা, আবেগ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। সে কারণেই উদারতা, ভালোবাসা, সমমর্মিতা, করুণা, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতাবোধ—ইত্যাদিকে নৈতিক জীবনযাপনের জন্য আদর্শ বলে গণ্য করলেন --যা প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্রে থাকা কাঙ্ক্ষিত।

আদর্শ অপরিবর্তনীয়

কোনও কোনও নীতিদার্শনিক নৈতিক আদর্শরূপে অপরিবর্তনীয় নৈতিক বিধি বা অনুশাসনের কথা বললেও অনেক দার্শনিকই মনে করেন, বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তিবর্গের চাহিদা অনুযায়ী নৈতিক আদর্শ পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন সমাজের আচার অনুষ্ঠান সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন হওয়ায় মানুষের নৈতিক চেতনাও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি সমাজে একটি নৈতিক আদর্শকে সমাজের সকলে স্বীকৃতি দেয়। সেই নৈতিক আদর্শ সকলের ইচ্ছার স্বীকৃতিতে প্রণীত হয়। নৈতিক সমাজের সদস্যরূপে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নৈতিক উৎকর্ষময় জীবনের লক্ষ্যে সকল ব্যক্তি কিছু সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করে, যে নিয়ম সমাজের সকল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বীকৃতিতে গড়ে ওঠে। সমাজের সকলের মঙ্গলের লক্ষ্যে নির্ধারিত এই নিয়মগুলিকে সকলেই আদর্শরূপে স্বীকৃতি দান করে। সেই আদর্শকে সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গ মান্য করতে বাধ্য থাকে নিজেদের এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য। এই আদর্শ গোষ্ঠীভেদে, সমাজভেদে, কালভেদে পৃথক হয়। কেননা এই আদর্শ নির্দিষ্ট

ভৌগলিক পরিবেশ, প্রথা, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে। ফলে নৈতিক আদর্শ সময়, স্থান, সমাজ অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

নৈতিক আদর্শ ব্যক্তিসাপেক্ষ

যে সকল দার্শনিকেরা নৈতিকতাকে ব্যবহারিক জীবনের সহায়ক বলে মনে করেন তাঁদের মতে, নৈতিক আদর্শ বা জ্ঞান হবে বিষয়ীগত ও আপেক্ষিক। অর্থাৎ নৈতিক আদর্শ হল ব্যক্তিসাপেক্ষ। এই মতবাদে বিশ্বাসী সমর্থকদের মতে, নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড কখনও শাশ্বত ও দেশকাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই লক্ষ্য অনুযায়ী তার জীবনের কর্মপন্থাকে নির্বাচন করে, জীবনের অগ্রগতি সাধন করে। মানুষ নৈতিক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে একটা নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করে। ফলে ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নতি নির্ভর করে নৈতিক আদর্শের উপর। অর্থাৎ নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে ব্যক্তির প্রয়াস বা প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নতি ঘটে থাকে। তাই নৈতিক আদর্শকে নৈতিক জীবনের পরিচালক বলে মনে করা হয়। যে ব্যক্তির জীবনে কোন আদর্শ থাকে না, তার কোন নৈতিক লক্ষ্য থাকতে পারে না। জীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য নৈতিক আদর্শ মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নৈতিক আদর্শ ব্যক্তি তথা সমাজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে -- যা ব্যক্তি তথা সমগ্র সমাজের নৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে থাকে। ফলে নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড অনুসারে মানুষের নৈতিক ক্রিয়াকর্মের ভালোত্ব বা মন্দত্ব, ন্যায় বা অন্যায় ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়। সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক পরিমণ্ডলের নিরিখেই নৈতিক আদর্শ রূপ লাভ করে। নৈতিক আদর্শ হল ব্যক্তি জীবনের চরম মঙ্গলময় অবস্থা। অর্থাৎ ব্যক্তি নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে চরম মঙ্গলময় অবস্থায় পৌছাতে সক্ষম হয়। আদর্শকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন কারণ, একই নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে আমাদের আচরণের মধ্যে একরূপতা থাকা উচিত। পারস্পারিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সকলের স্বীকৃতির বিষয় এক হওয়ার লক্ষ্যে এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণ পালনের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শের উপস্থিতি এবং সেটি পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। এই আদর্শ ব্যক্তি বিশেষের সাথে, সমাজের চরিত্রের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না। আমরা অনেক সময় পূর্ববর্তী সমাজে প্রচলিত কোন প্রথাকে নৈতিক নিয়মের আখ্যা দিয়ে পরবর্তীকালে সেটি অনুসরণ করাকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করি। কিন্তু প্রথা বা custom হলো তাই যা কোন

একটি নির্দিষ্ট সমাজের চরিত্র, ব্যক্তির প্রয়োজনের সাথে যুক্ত। Custom বা প্রথা সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। সমাজের ব্যক্তিবর্গ সমাজস্বীকৃত প্রথাকেই অসচেতনভাবে অনুসরণ করে, কারণ সেগুলি আমাদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে। প্রথাগুলি এত দৃঢ়ভাবে আমাদের সমাজ জীবনে উপস্থিত থাকে যে, সেগুলিকে আমরা প্রায়ই মানব প্রকৃতির অংশ বলেই গ্রহণ করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উক্ত প্রথাগুলিকে আমাদের কর্মের একমাত্র সঠিক পদ্ধতি বলেও মনে করে থাকি। অর্থাৎ সমাজ জীবনের নিয়ামক বা আদর্শরূপে প্রথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা এগুলিকে লঙ্ঘন করা যায় না। প্রথা হল প্রাচীনদের অনুকরণ। এগুলি সমাজ অনুমোদিত এবং স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রথার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোন নির্দিষ্ট বিধিকে প্রথারূপে স্বীকৃতি দেবার জন্য কোন সার্বভৌম ক্ষমতা বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ঘোষণার প্রয়োজন হয় না বা বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে স্বীকৃতিও দেওয়া হয় না। ফলে যুগের পরিবর্তনের ফলে প্রথা পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। যেমন, হিন্দুধর্মে বাল্যবিবাহ প্রথারূপে স্বীকৃত ছিল। সমাজ স্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী হিন্দু রমনীর বাল্যবয়সে বিবাহ দেওয়া হত। এর ব্যতিক্রম সমাজে নিন্দিত ছিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনায় সমাজ শাস্তি ঘোষণা করত। কেননা প্রথাই ছিল সমাজের ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিয়ামক। এই প্রথাটি সমাজে নৈতিক বলে গৃহীত ছিল এবং বাধ্যতামূলকভাবে অবশ্যপালনীয় বলে গণ্য হতো। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে সেই প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। বরং বর্তমানে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয় এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য এই প্রথাকে বর্জন করা হয়। দেখা যাচ্ছে, সমাজ নিয়ন্ত্রণের জন্য বা সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রথা একসময় কর্ম নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করলেও তার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এখানে দুটি কথা বলা যায়। প্রথমত কোন নির্দিষ্ট আদর্শ স্বীকার করার আবশ্যিকতা আছে, যেহেতু আচরণের একরূপতা বজায় রাখা সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত এবং দ্বিতীয়ত, আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়।

নীতিগুলির পরিবর্তিত প্রকৃতি প্রমাণ করে যে ভালো-মন্দের ধারণা বস্তুগত নয়, বিষয়ীগত। আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত বলে স্বীকার করলে সামাজিক ধ্যানধারণার পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যাবে কীভাবে? অতীতে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার মধ্যে সতীত্বের যে আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল সেই প্রথা আজ নিষ্ঠুর বলে গণ্য হয়েছে, কারণ সতীত্বের ধারণাটি পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে প্রচলিত জহর ব্রত রাজপুত রমনীদের সতীত্ব রক্ষার জন্য পুণ্য আদর্শরূপে গণ্য হলেও, বর্তমানে এ জাতীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধ হয় না, যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকা ভিন্ন জাতীয়। ফলে যা আদর্শ বলে গণ্য হয়েছিল তা আজ সম্পূর্ণ

মূল্যহীন, বরং দুর্বলতার পরিচয় বলে মনে হয়। নৈতিকতাকে বিষয়গত মনে করলে ভালো-মন্দ সম্পর্কে ব্যক্তি বা সমাজের গুরুত্ব মূল্যহীন বলে মনে হতো। কিন্তু কোনটি আদর্শরূপে গৃহীত হবে সে বিষয়ে মতভেদ থাকার কারণেই বলা যায় এখানে আমরা ব্যক্তির মনোভাবের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং নৈতিক অবধারণগুলিকে আমরা কখনো স্বতঃপ্রমাণিত বলতে পারি না । কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন আচরণ পালন করা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে আমরা সহমত পোষণ করলেও পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে কোনটি ভালো বা মন্দ বলে চিহ্নিত হবে সে বিষয়ে, অর্থাৎ আদর্শের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে মতভেদ লক্ষ্য করি। অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু যখন কোন পরিস্থিতিতে আমরা কোনটি ভালো তা নির্ণয় করতে চাই তখন সাধারণত সকলেই সহমত পোষণ করি। পথে দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত আহত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করলে তৎক্ষণাৎ তাকে চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়াই উচিত—সে বিষয়ে সকলেই সম্মত হবেন। তবে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ অনুসারে ঐ কর্মটিকে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করবেন। কেউ মনে করবেন কর্মটি উপযোগিতা উৎপন্ন করবে; সুনাগরিকরূপে অপরের মঙ্গল উৎপাদন করাই ব্যক্তির দায়িত্ব। ফলে অপর ব্যক্তির হিতসাধনে ব্রতী হওয়া উচিত। আবার কর্তব্যবাদে বিশ্বাসীরা সেটিকে কর্তব্য বলে মনে করবেন, কারণ বুদ্ধিপ্রসূত নীতি সেই কর্মটিকেই ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। আবার সদ্‌গুণকে যে সকল দার্শনিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সদ্‌গুণের চর্চাকেই আদর্শ বলে মনে করেন তাঁরা মনে করবেন, এই কাজটিই সৎ, মানবিক চরিত্রের ব্যক্তির কর্ম। এই তিনটি মতে কৃত কর্মটি নির্দিষ্ট হলেও আদর্শটি ভিন্ন হয়ে যায়। প্রথম মত অনুসারে মঙ্গল উৎপাদন আমাদের আদর্শ হলেও, দ্বিতীয় মতে আদর্শ হলো বুদ্ধিপ্রসূত নীতি অনুসারে কর্মপালন। তাঁরা ফলের প্রতি মনোযোগী না হওয়াই উচিত বলে মনে করেন। আবার তৃতীয় মতে কর্মটির গুরুত্ব গৌণ। আচরণটি সৎ চরিত্র থেকে নিঃসৃত হলে সৎ বলেই গণ্য হবে। বরং চরিত্রটি সদ্‌গুণসম্পন্ন করে গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং কোন নৈতিক আদর্শই স্বতঃসিদ্ধ নয়। আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা জনগণের উপর নির্ভর করে।

আদর্শ নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে, তার অভিজ্ঞতাকে এবং বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ প্রথমত নৈতিক আদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন কর্মসংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়ত কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ নির্ধারণ করার জন্য আদর্শটি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তির কর্ম নৈতিক কর্ম বলে গণ্য হয় তখনই যখন ঐ কর্মটির আমরা নৈতিক মূল্যায়ন করি। নৈতিক মূল্যায়ন করার অর্থই হলো কর্মটি ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় পালন করেছে একথা স্বীকার করা। কোন ক্রিয়া যদি ব্যক্তি বাধ্য হয়ে পালন করে তবে সেই কর্মের নৈতিক বিচার

করা হয় না। তাহলে ব্যক্তি যখন কোন আদর্শ অনুসারে কর্ম সম্পাদন করছে তখন ঐ আদর্শটি ব্যক্তি নিজে নির্ধারণ করেছে বা অন্ততপক্ষে আদর্শটিকে সে স্বীকৃতি দিয়েছে, আদর্শ বলে সমর্থন করেছে - একথা মানতে হবে। কারণ স্বাধীন কর্মের অর্থই হলো ঐ কর্মের উদ্দেশ্যটি ব্যক্তি নিজে নির্ধারণ করে, ঐ কর্মের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ব্যক্তি কর্ম পালন করে। উদ্দেশ্য নির্ণয় করার সময়ে অবশ্যই ব্যক্তি ঐ আদর্শটির প্রয়োগ করেছে। সুতরাং আদর্শটি গঠন ও প্রয়োগে ব্যক্তির সচেতনতাকে অস্বীকার করা যায় না। আবার একথাও সত্য যে, আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য পরিস্থিতির প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না। পরিস্থিতি অনুসারে আমরা কোন আদর্শটি গ্রহণ করব তা স্থির করি। পরিস্থিতির কারণে, পরিবেশের আকস্মিকতার কারণে বিশেষ প্রকার আচরণ করার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারাও আচরণ প্রভাবিত হয়। মা এবং শিশুর আচরণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে এই সম্পর্ক দ্বারাই আদর্শ নির্ধারণ করা হয়। আবার আদর্শ নির্ণয়ে ধর্মের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা যখন আদর্শ বলে গণ্য হয় তখন ব্যক্তির বিশ্বাস, আত্মনিবেদনের মানসিকতা আদর্শের উৎস বলে স্বীকৃত হয়। ঐরূপ মানসিকতার অভাববিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট ঐ আদর্শটি অর্থহীন বলে বিবেচ্য হয়। এভাবেই ব্যক্তি যখন পরিণত হয় তখন তার আচরণে বুদ্ধি, সংস্কৃতি, শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার ফলস্বরূপ যে জাতীয় প্রতিক্রিয়া আমরা আমাদের আচরণে প্রকাশ করি সেগুলি আমাদের সুচিন্তিত নৈতিক অভিমতের ফল এবং ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। আমাদের নৈতিকবোধ আমাদের এরূপ আচরণের উৎসরূপে ক্রিয়া করে বলেই আমরা ভালো, ন্যায়সঙ্গত আচরণগুলিকে প্রশংসা করি এবং অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করি। অর্থাৎ আমরা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের সমাজস্বীকৃত আদর্শটিকে বৈধ বলে গণ্য করি। নৈতিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির প্রভাব এবং পেশাগত প্রশিক্ষণও সম্মিলিতভাবে ক্রিয়া করে। যখন কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে হত্যা করছে, তখন তার পেশাগত দায়িত্ববোধ তার নৈতিকবোধকে পুনর্গঠিত করছে। তার দায়িত্ববোধ এখানে তার লক্ষ্যটিকে কেবলমাত্র সর্বজনীন নৈতিকবোধের প্রেক্ষিতে যাচাই করছে না। শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন, তাকে হত্যা করা এখানে একজন সৈনিকের নিকট অন্যায় কর্ম বলে বিবেচিত হবে না। বিপরীতপক্ষে হত্যা করাই এখানে ন্যায্য কর্ম বলে স্বীকৃত হবে।

যে সকল দার্শনিক নৈতিকতার প্রায়োগিক মূল্যকে গুরুত্ব প্রদান করেন তাঁরা মনে করেন, নৈতিক ধারণাগুলি মানব ইতিহাসের বিবর্তনের ফল। আমরা আমাদের সমাজের প্রয়োজনসাপেক্ষে আদর্শ, নৈতিক

ধারণাগুলি পরিবর্তন করি। ব্যক্তিসাপেক্ষতার অর্থ হল ব্যক্তির চাহিদা অনুসারে, ইচ্ছা অনুসারে নৈতিক ধারণা গঠন করা। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্য কোন কর্তার দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে নিজের কর্তব্য নির্ণয় করতে আগ্রহী নয়। এমনকী কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত সর্বজনীন নিয়ম অনুসরণও তার লক্ষ্য নয়। তার নিজের নৈতিকবোধের আলোকে জীবনযাপন করতেই সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস তাই বলেন, 'Man is the measure of all things.'[১৩] সুতরাং আদর্শ কোন ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয় নয়। কোন কর্মটি ভালো বা কোনটি মন্দ – তা ব্যক্তি নির্ধারণ করে তার নিজস্ব নৈতিকবোধের দ্বারা, যে নৈতিকবোধ ব্যক্তি তার সমাজ থেকে, তার নিজের জীবনবোধ থেকে গঠন করেছে। নৈতিকবোধসঞ্জাত প্রতিক্রিয়াগুলি সমাজ--নির্ধারিত নৈতিকতার ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যেহেতু এই নৈতিকবোধ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কোন কিছুকে ভালো বা ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকৃতি দিতে হলে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরী। ব্যক্তি যখন কোন ঘটনা বা অপর ব্যক্তির আচরণকে অন্যায় বলে প্রতিবাদ করে তখন সে প্রচলিত প্রথা বা আদর্শ অনুসারে আচরণ করাই বাঞ্ছনীয় - এমন মনোভাব পোষণ করে একথা বলতে হয়। এভাবেই ব্যক্তি তার ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাটি গঠন করে সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে। তাই আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে লিখেছেন, 'So far, about morals, I know only that what is moral is what you feel good after and what is immoral what you feel bad after.'[১৪] সুতরাং আদর্শ যেহেতু আমাদের সমাজ, সংস্কৃতির ফলশ্রুতি, আমাদের মনের প্রতিফলন তাই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সর্বজনীন, সর্বজনপ্রযোজ্য কোন আদর্শ স্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত আইন বা মানদণ্ডটি আমরা পরিস্থিতির প্রয়োজনে নির্ধারণ করি, ঠিক যেমন আমরা গাড়ী চলাচলের জন্য প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন নিয়ম সংযোজন করি এবং সেগুলি অনুসরণ করাই আদর্শ বলে মনে করি। নৈতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্যও আমরা একইভাবে নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করি যা পূর্বের সমাজে অস্বীকৃত অথবা অপ্রয়োজনীয় ছিল। 'গাড়ী চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয়'- এটি বর্তমানে একটি আইনরূপে স্বীকৃত হয়েছে, যেহেতু বর্তমান বিশ্বে মোবাইল ফোনের বহুল ব্যবহারের কারণে দুর্ঘটনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে নৈতিকতার ক্ষেত্রেও এরূপ নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয় - যা সমাজের প্রয়োজনে, আধুনিক ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে।

নিয়ম ব্যক্তির প্রয়োজনসাধক

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি নৈতিক অবধারণগুলি পরিস্থিতিনিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল নয়। কর্মকর্তা যখন কোন পরিস্থিতিতে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন তখন তিনি নিয়ম বিষয়ে সচেতন হয়ে নীতির সার্বিকতা স্পর্শ করার লক্ষ্যে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন না। বরং পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনের ভালো-মন্দ ব্যক্তির কর্মকে প্রভাবিত করে এমন ঘটনাই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করি। যখন কোন নীতি প্রণয়ন করা হয় তখন তার পূর্বশর্তরূপে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, সামাজিক বিশ্বাস আমাদের প্রভাবিত করে। যখন অপরের দ্রব্য হরণ করাকে দোষণীয় বলে মনে করা হয় তখন ঐ নীতি নির্ণয়ের কারণ হলো ঐ সমাজে শোষণ, অত্যাচারকে প্রতিহত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই আদর্শ বলে গণ্য হয়। অপরের দ্রব্য অপহরণ করার প্রবণতা ব্যক্তিদের চরিত্রে বর্তমান একথা জেনে তবেই সেই নীতি প্রণয়ন করা হয়। অথচ অতীতে ছলে বলে কৌশলে, শারীরিক বল ও লোকবলের আনুকূল্যে একজন রাজা যখন অপর রাজ্য হস্তগত করেছে তখন সেই সমাজে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হয়নি। বরং সেটিই রাজধর্মরূপে, শৌর্য্য ও বীরত্বরূপে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানযুগে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশই তাদের সীমান্ত রক্ষায় সেনাবাহিনী যুক্ত রেখেছে এবং পাকিস্তান ভারতবর্ষের সীমানায় প্রবেশ করার প্রচেষ্টা করলে সেটিকে আমরা নিন্দনীয় বলে মনে করি। অর্থাৎ ভালো- মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিভাজনটি অপরিবর্তিত কোন বিষয় নয়। অপরিবর্তনীয় নিয়ম বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ যে কীরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা আমরা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' গীতিনাট্যে লক্ষ্য করি, যেখানে নিয়মের বেড়াজালে মানুষের স্বাভাবিকতাকে দমন করে তাকে ভিন্ন ছাঁচে গড়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ তারা নিরানন্দ, আবেগ প্রকাশে অক্ষম যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্পের চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্যের অভাব প্রমাণ করার জন্যই তাদের বিভিন্ন প্রতীক যেমন হরতন, চিঁড়েতন, রুইতন, ইস্কাবন প্রভৃতি নামে নামাঙ্কিত করেছেন। এই চরিত্রগুলি তাদের বিচারবুদ্ধি বা মানসিকতা অনুসারে নীতি নির্ধারণ করেনি। এমনকি নীতিগুলি তাদের মনোভাবেরও পরিপন্থী। কিন্তু সেগুলি কেবলমাত্র নিয়ম বলেই কর্তব্যরূপে তাদের নিকট পালনীয়। এখানে ব্যক্তিসাপেক্ষতার প্রকাশ অনৈতিক বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে নিয়ম ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য। সুতরাং ব্যক্তির প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে যদি নীতিগুলি প্রস্তুত করা হয় তবে তা কোনোভাবেই ব্যক্তির মঙ্গল সাধনকারী হতে পারে না। ফলে সেগুলি

দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, যেহেতু মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে অপারগ হয়। একইভাবে ব্যবহারিক জীবনের বহু ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি সময় ও সামাজিক পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে একই বিষয় পূর্বে আদর্শ বলে গ্রাহ্য হলেও পরে সেটি অন্যায় এবং অসামাজিক বলে গৃহীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা মহাভারতে বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি কোন স্বামী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে স্ত্রী সন্তান লাভের জন্য অন্য পুরুষের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। মহাভারতে পদ্মাবতী বিচিত্রবীর্যের স্ত্রীদের গর্ভবতী করার জন্য ব্যাসদেবকে অনুরোধ করেন। সেক্ষেত্রে বংশরক্ষা করা, রাজ্যচালনা এবং প্রজা পালন জন্য আবশ্যিক কর্তব্য এবং ধর্ম বলে গণ্য হওয়ায় এ জাতীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং গর্হিত কর্ম বলে গণ্য হতো না। ফলে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু অবৈধ বা জারজ সন্তান বলেও বিবেচিত হননি। এক্ষেত্রে রাজধর্ম পালনের জন্য এ জাতীয় ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে গণ্য হতো। এমনকী পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের পিতা পাণ্ডুর ঔরসজাত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে এহেন প্রথা নৈতিক আদর্শ বলে গণ্য হয়নি। বলা যায় এই প্রথাটি অসততা বলে এবং বিকৃত লালসা বলেই গণ্য হয়েছে। এ জাতীয় পন্থা অনুসরণকারী স্ত্রীকে অসতী এবং সেই সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন সন্তানকে অবৈধ, জারজ সন্তান বলে সমাজ পরিত্যাগ করেছে। এই সময়ে শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করাই স্ত্রীজাতির কর্তব্য হওয়া উচিত বলে সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে স্পার্ম ব্যাঙ্কের সাহায্যে অন্য পুরুষের শুক্রাণু অপরের স্ত্রীর শরীরে স্থাপন করা সম্ভব হওয়ায় সন্তানহীন দম্পতি সন্তানলাভের সুখ লাভে সমর্থ হয়েছে। *সারোগেসি* পদ্ধতির দ্বারাও অন্যের গর্ভে নিজের সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এখন এ জাতীয় পদ্ধতি অনৈতিক বলেও মনে করা হয় না। ফলে একথা স্পষ্ট যে, নৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে বাস্তব পরিস্থিতি। সুতরাং ব্যক্তির চরিত্রকে, তার ইচ্ছা , আবেগ, সামাজিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করলে চলবে না। নৈতিক আদর্শ প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি মূর্ত ধারণা নির্ভর। যে সমস্ত বস্তু আমাদের মনকে কষ্ট দেয় অথবা যেগুলিকে আমরা আমদের ভয়-ভীতির কারণরূপে চিহ্নিত করে মন্দ বলে গণ্য করি সেগুলিকে আমরা আমাদের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করি। সুতরাং আমরা যখন কোন আদর্শ অনুসরণ করে আচরণ করার কথা বলি তখন সেই আচরণকারী ব্যক্তিকে, তার পরিস্থিতিকে আদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বুদ্ধি নিজে আদর্শটি নিজের আচরণে প্রয়োগ করবে, অর্থাৎ আদর্শ অনুসারে তার কর্মটিকে স্থির করবে একথা ব্যক্তিনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী নীতিতাত্ত্বিকেরাও স্বীকার করবেন। কারণ ব্যক্তির সেই কর্মের নৈতিক অবধারণই সম্ভব যে আচরণ ব্যক্তি নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নির্ণয় করে। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তিবোধ, তার নিজস্বতার ব্যবহারকে স্বীকার করে নিতেই হবে। ব্যক্তি সেই আদর্শ অনুসারেই কর্ম পালন করবে যে আদর্শটি তার নিকট তার পরিস্থিতিসাপেক্ষে ভালো, ন্যায়সঙ্গত বলে মনে

হবে। মিষ্টতা আমাদের নিকট প্রিয় বলেই যেমন আমরা ফল ক্রয় করার সময় তা মিষ্টি কিনা পরীক্ষা করি, তেমনই সততা সুখজনক বলেই আমরা ব্যক্তির আচরণে সততা প্রত্যাশা করি এবং সেটি আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করি।

আদর্শের ধারণাটি কিভাবে সমাজ অনুসারে পরিবর্তিত হয় তা স্পষ্ট হয় যদি আমরা প্রজাপালক, রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, দশরথপুত্র রামকে বিচার করি। প্রজার হিতসাধক বলে প্রশংসনীয় এবং পূজ্য রাম প্রজাদের দাবি অনুসারে নিজের স্ত্রীকেও বনবাসে পাঠাতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু বর্তমানে রামকে সমালোচিত হতে হয়, যেহেতু তিনি স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে স্বামীনিষ্ট সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। স্বামীরূপে স্ত্রীর সম্মান রক্ষার যে দায়িত্ব তাঁর ছিল তাকে অস্বীকার করায় রামের চারিত্রিক দৃঢ়তা বিষয়ে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর এই কাপুরুষোচিত কর্মকে নৈতিক বলে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। সেই সময়ে রাজার কর্তব্য পালনই আদর্শ বলে গণ্য হয়েছিল, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে তুচ্ছ করাই আদর্শ ছিল। অথচ বর্তমানে একই কর্মকে আদর্শহীন বলে গণ্য করা হয়। ফলে বলতে হয় নৈতিক বিষয়ের সত্যতা যে বস্তুর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য থেকে নিঃসৃত হয় এমন নয়। সেই সত্যতা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর, সামাজিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শের ভিন্নতার কারণেই একই কর্ম কোন সমাজে গ্রহণীয় হলেও অন্য সমাজে বর্জনীয় হয়। তাই ব্যক্তি যে নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করছে তার সেই সমাজে প্রচলিত নৈতিকতার মূল প্রত্যয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নৈতিক মূল্য সম্পর্কে সচেতন হলে তবেই প্রত্যেকে একই নৈতিক গোষ্ঠীর সদস্য বলে গণ্য হয়। কারণ প্রত্যেক সদস্য তাদের সকলের মঙ্গলের লক্ষ্যে ভাল-মন্দ সম্পর্কে ধারণা গঠন করে। সকলের স্বীকৃতিতে গড়ে ওঠা এই ভাল মন্দের ধারণাই হল নৈতিক আদর্শ।

নৈতিক আদর্শ হবে সার্বিক এবং গাণিতিক সত্যতার অনুরূপ—এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে রোসালিণ্ড হার্ষ্টহাউস[১৫] বলেন, নৈতিক বিষয় গাণিতিক বিষয়ের অনুরূপ নয়। গণিতের বিষয় আকারগতভাবে সত্য হয়। সকল ব্যক্তি গণিতের ক্ষেত্রে সার্বিক নিয়ম প্রয়োগ করে সার্বিক সত্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়। কেননা গাণিতিক নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, অনুভূতি, আবেগ, বাস্তব পরিস্থিতির কোন মূল্য নেই। কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্র কখনই বিমূর্ত বিষয় নয়। মরিজ স্লিকও[১৬] মনে করেন, কোন একটি নিয়মের মূল্যায়ন ঘটনা বা বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে করতে হয়। পরিস্থিতিনিরপেক্ষভাবে কোন নিয়মই কার্যকর হতে পারে না। নৈতিকতার উদ্দেশ্য যেহেতু আদর্শ নির্ণয় করা তাই সেটি মানব আচরণের সঙ্গে সম্বন্ধিত। নৈতিক

নিয়মকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপায় হলো মানব আচরণের বাস্তব দিকটিকে ব্যাখ্যা করা। ফলে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষভাবে নৈতিক নিয়ম নির্ধারণ বা নৈতিক মূল্যায়ন করা যায় না। প্রতিটি ব্যক্তির পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে নৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ম প্রয়োগ করে সার্বিক সত্যতা লাভ করার প্রচেষ্টা করা হলে ব্যক্তির বিচার করা সম্ভব হবে না। কোন পরিস্থিতিতে কোন আদর্শটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ বলে বিবেচিত হবে সেটি বিচার করার জন্যও ব্যক্তিকে বিচার করতে হয়। প্রাণনাশ করা অন্যায় কর্ম হলেও কোন পরিস্থিতিতে ঐ অবধারণটিই আমার আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। ফলে কোনটিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করবো তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, পরিস্থিতি ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। কোন পরিস্থিতিতে যখন আমরা আমাদের স্বজ্ঞার দ্বারা কোন বিষয়কে সত্য বলে মনে করি তখন নীতিগুলি আমাদের সেই অভিমতের বিরোধিতা করতে পারে। যখন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে মিথ্যা বলা সঠিক বলে মনে করি, তখন সদা সত্য ভাষণের আদর্শ –সেই অভিমতের বিরোধিতা করে। আদর্শগুলি যে ব্যক্তির পরিস্থিতিনিরপেক্ষ নয় তা স্পষ্ট হয় যদি আমরা নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলি ব্যাখ্যা করি। একাধিক নীতির প্রয়োগ ব্যক্তিকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন করে এবং নীতিগুলি পরস্পর বিরোধী নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ইঙ্গিত দেয়। ফলে আমাদের নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, গ্রীক ট্র্যাজেডিতে[১৭] দেখা যায় গ্রীক সেনাধিপতি এ্যাগামেমনান ট্রয় নগরী আক্রমণের জন্য তাঁর নৌসেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করলেও তিনি নৌবহরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন না, যেহেতু ঈশ্বরের আদেশে বায়ুর গতিবেগ রুদ্ধ হয়। দৈব আদেশে তিনি জানতে পারেন যে, যুদ্ধযাত্রা সম্ভব হবে না যদি তিনি তাঁর কন্যা ইফিজিনিয়াকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ না করেন। এমন ক্ষেত্রে এ্যাগামেমনানের মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সেনাপ্রধানরূপে রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষাকে যদি তিনি আদর্শ বলে মনে করেন তবে তাঁর কন্যাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে। ফলে তিনি পিতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবেন। আবার পিতারূপে কন্যার জীবনরক্ষা করাও তাঁর আদর্শ। এই আদর্শ দুটিকে ব্যক্তির জীবন নিরপেক্ষভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। যেহেতু যে ব্যক্তি এই আদর্শ দুটি পালন করতে বাধ্য সে কয়েকটি সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ। ফলে এক্ষেত্রে ব্যক্তি এ্যাগামেমনন নয়, আদর্শগুলি প্রযোজ্য হয়েছে সেনানায়ক এবং পিতা এ্যাগামেমননের ক্ষেত্রে। সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সমাজ এবং সম্পর্কের অপর প্রান্তের ব্যক্তিবর্গ তার নিকট থেকে কিছু নির্দিষ্ট আচরণ প্রত্যাশা করে এবং ঐ নির্দিষ্ট আচরণ পালন করা এ্যাগামেমনানের কর্তব্য বলেই গণ্য হয়। সুতরাং এখানে ঐ আদর্শ দুটির মধ্যে তুলনা করে কোন একটি আদর্শকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে। দুটি আদর্শই যদি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে ব্যক্তিকে পরিস্থিতি অনুসারে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা

অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিচার করতে হবে, ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটিতে কোন আদর্শটি অধিক সুবিধাজনক, কল্যাণকারী ফলের উৎপাদক, কোনটির প্রায়োগিক মূল্য অধিক।

আদর্শ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন নয়

আবার একথাও বলা যায় যে, নৈতিক দ্বন্দ্বের যদি সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হলে সেক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মগুলিকে বিষয়গত, সার্বিক এবং গাণিতিক সত্যতার অনুরূপ বলে দাবি করা সম্ভব হতো। কিন্তু নৈতিক দ্বন্দ্বের সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নয়, কারণ আমরা যদি সঠিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করি তবুও আমরা যে আদর্শটি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি সেটি না করতে পারার জন্য অনুতপ্ত বোধ করি। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নৈতিক নিয়মগুলির কোন বস্তুগত সত্যতা নেই, এগুলি বিষয়ীগত। নৈতিক আচরণগুলিকে সেই কারণেই স্বতঃসত্য বলা যায় না। আচরণগুলি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের স্বীকৃতিতে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই অবধারণগুলি পরিস্থিতি বা ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে শুভ অথবা অশুভ, যথোচিত অথবা অযথোচিত হতে পারে না। ওয়েস্টারমার্ক-এর মতে-"I am not aware of any moral principle that could be said to be truly self-evident."[১৮] ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নৈতিক অবধারণের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আদর্শগুলি ব্যক্তির বিশ্বাস, মনোভাব, পরিস্থিতি অনুসারে নির্ধারিত হওয়ার অর্থ এমন নয় যে, আদর্শ কেবলমাত্র ব্যক্তির মতামতের উপর নির্ভর করে। নৈতিক ব্যক্তি এমন বিষয়ের প্রতিই সম্মান জ্ঞাপন করেন যা যুক্তিসঙ্গত, বিচারমূলক এবং সর্বজনকল্যাণকারী। কিন্তু ব্যক্তি ঐ আদর্শকে যুক্তি দ্বারা, তার নিজস্ব মনোভাব, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বীকৃতি দান করে বলেই বলা যায়, ব্যক্তির মতামত আদর্শ নির্ধারণে প্রয়োজন। ব্যক্তি কোনকিছুকে আদর্শ বলে মনে করবে কারণ, সেটি তার প্রয়োজনসাধক হবে এবং সেটি তার নিকট তৃপ্তিদায়ক হবে। আদর্শটি ব্যক্তির নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানের (Social Status) জন্য পালনীয় দায়িত্বগুলি পূরণে সহায়ক হলে তবেই ব্যক্তি তার পরিস্থিতির প্রয়োজন পূরণে ঐ আদর্শ অনুসরণ করবে। তাছাড়া এই আদর্শ ব্যক্তি যদি সাগ্রহে গ্রহণ করে তবেই সেটি একটি গ্রহণযোগ্য আদর্শ হবে। যদি আদর্শটি ব্যক্তির প্রবণতা, আবেগ ইত্যাদি পূরণে সাহায্য করে, আবেগের তৃপ্তি সাধন করে তবেই ব্যক্তি আদর্শটি সাগ্রহে গ্রহণ করবে। কোন সদাচারী ব্যক্তি যখন প্রতিজ্ঞা পালনকে আদর্শ বলে গণ্য করে তখন সে তার চারিত্রিক শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য, তার সৎ চরিত্র গঠনের প্রয়োজনে প্রতিজ্ঞা পালন করাকে কর্তব্য বলে মনে করে। আবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার ফলে তার মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকে, তার প্রবণতাগুলি ঐ আদর্শ পালনের অনুকূল হয় বলে সে ঐটিকে আদর্শ

বলে মনে করে। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট যে, আমরা আদর্শ বলে সেটিকেই গ্রহণ করি যা সর্বজনকল্যাণকারী, সর্বজনহিতকারী। অর্থাৎ কল্যাণ বা মঙ্গল কোনটি সেটির প্রকৃতি পরিবর্তিত হলেও কল্যাণই যে লক্ষ্য, আদর্শ তা সমস্ত সমাজে স্বীকৃত। সে কারণেই মঙ্গল বা কল্যাণ সম্পর্কে প্রত্যেকের মধ্যে সমান ধারণা বর্তমান থাকা প্রয়োজন। ভালো বিষয়ের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং অন্যায় বর্জন করে নিজেদের নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জন করাই ব্যক্তির নৈতিকবোধের উদ্দেশ্য। ফলে ব্যক্তির স্বার্থের সমরূপতা নৈতিক আচরণের পূর্বস্বীকৃতি রূপে স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ একই নৈতিক সমাজের সদস্যরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি সাধারণ স্বার্থ বর্তমান থাকে। প্রত্যেকেই বাহ্যিক সুখ অন্বেষণে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের পরিচয় দিলেও চরম মঙ্গল বা আনন্দ লাভ করার জন্য সকলের মধ্যে একটা মৌল চাহিদা থাকে। এই চরম আনন্দ লাভের লক্ষ্য কিন্তু সকলের এক। প্রত্যেকেই নৈতিক উৎকর্ষ লাভের মাধ্যমে ঐ পরম আনন্দময় অবস্থাকে লাভ করতে চায়। এজন্য নৈতিকভাবে সমাজের সকলেই পরমানন্দকে পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। হিউম বলেন যে, নৈতিক সমাজের সদস্যরূপে সকলের স্বার্থের ঐকীকরণ রয়েছে। ফলে সেখানে একটা সাধারণ নীতি আবিষ্কার করা সম্ভব যা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। আর কোন বিষয়ে যখন সাধারণ স্বার্থযুক্ত থাকবে তখন একের স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। ফলে সেখানেই মতের ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হবে। ফলে ব্যক্তিবর্গই তাদের মূল্যবোধে ঐ পরমমূল্যের আদর্শকে নির্ধারণ করে থাকে। সেই আদর্শ তাদের নৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনের কাম্য বিষয় বলে পরিগণিত হয়। এজন্য সকলের স্বীকৃতিতে যে নৈতিক আদর্শ নির্ধারিত হয় তাকে পূর্বস্বীকৃতিরূপে ধরে নিয়েই নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করার লক্ষ্যে নৈতিক পথ অবলম্বন করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে। কেননা সমাজের প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্য অপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে তোলে। অপরের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়। এইভাবে অপরের ভাল-মন্দ বোধের দ্বারা সমাজের ব্যক্তিগণ উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তারা একই সমাজে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়।

তবে একথা ঠিক যে, ব্যক্তি যখন পরের মঙ্গলের অংশীদার হচ্ছে তখন তার সঙ্গে যুক্ত থাকে নিজের মঙ্গল। এমন নয় যে, ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে নিজেকে পরার্থে সমর্পণ করবে। ব্যক্তির মঙ্গলের সঙ্গে সমাজের মঙ্গলের বোধ যুক্ত আছে। ফলে সমাজের মঙ্গল উৎপাদন মানেই নিজের প্রতিও মঙ্গলসাধন করা। ব্যক্তির মঙ্গল সামাজিক মঙ্গলের পরিপন্থী নয়। আবার সমাজের মঙ্গল ব্যক্তির মঙ্গল উৎপাদনে বাধা হতে পারে না। সমাজকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্য যে আদর্শ বা নীতি প্রণীত হয়

সেই নীতিগুলি বিমূর্ত নয়, অর্থাৎ সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সমাজের প্রেক্ষিতে সেই নীতিগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে সকলের মঙ্গল, বিশেষত সমাজের মঙ্গল। ফলে সমাজের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তিই ঐ নীতিগুলিকে মান্য করবে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের লক্ষ্যে। যারা ঐ নীতিগুলিকে লঙ্ঘন করবে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। এভাবেই ভালত্ব হল সমাজের মঙ্গলের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত। তাকে এই অর্থে সার্বিক বলতে হয়, কেননা এই ভালোত্বের সঙ্গে যুক্ত হল সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা সমাজের সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্য। গার্ডনার উইলিয়াম বলেন, "This goodness from the social point of view, is universal in the sense that it applies to all persons."[১৯] কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ভাল বা মন্দ বিষয়ে ধারণা বর্তমান। আমরা বুঝতে সক্ষম কোন বিষয়গুলি ভালোত্বের সঙ্গে যুক্ত। কোন বিষয় ভালো হবে তখনই যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভালোত্ব বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। এই অর্থে ভালোত্ব আপেক্ষিক নয়। এইভাবে ভালোত্ব চূড়ান্ত বা বস্তুগত অর্থে ভালো বলে যে নির্ণীত হয় তা সামাজিক পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক হয়। তাই বলা যায়, এই সাধারণ স্বার্থের ধারণাই নৈতিক অবধারণের বস্তুগত সত্যতাকে প্রমাণ করে। এর জন্য আমরা বলি যে, ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নৈতিকতার বস্তুগত সত্যতা বর্তমান। এইভাবেই সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রমাণিত হয় নৈতিক অবধারণ বস্তুগতভাবে সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সার্লে বলেন, নৈতিক বস্তুগত সত্যতা কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুভূতি বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নয়, যা ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করে থাকেন। আবার সমাজ-নিরপেক্ষভাবে নৈতিক বিষয়ের সার্বিক বৈধতা প্রতিপাদন করাও সম্ভব নয়। নৈতিক অবধারণের বস্তুগত সত্যতাকে অনুসন্ধান করা যেমন অর্থহীন তেমনই নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভরও বলা যায় না।

ঈশ্বরের আদেশের প্রকৃতি

রেনেসাঁ পূর্ববর্তী সময়ে খ্রীষ্টধর্মের বিপুল প্রতিপত্তির কারণে দার্শনিকেরা মনে করতেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্ঠা এবং নিয়ন্ত্রক। তাঁর আদেশই সর্বোচ্চ আদেশ এবং তা অলঙ্ঘনীয়। পরমকরুণাময় ঈশ্বর মানুষকে মঙ্গলময় জীবনযাপনে চালিত করার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি আদেশ বা নীতি নির্ধারণ করেন যা আদর্শ বলে গণ্য হওয়ায় প্রশ্নাতীতভাবে অবশ্যপালনীয়। এই আদর্শগুলি যেহেতু জগত অতিবর্তী কোন সত্তা দ্বারা নির্ধারিত এবং ঈশ্বর যেহেতু সর্বোত্তম তাই এগুলিকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বে আস্থা থাকার কারণে মানুষ ঐ উপদেশকে অবশ্যপালনীয় বলে মনে করে। যদিও কতকগুলি ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ অর্জনকে অর্থাৎ আস্থা, বিশ্বাস, মহানুভবতা, ভালোবাসা, করুণা ইত্যাদিকে এই

আদেশগুলি পালনের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়েছিল। তবুও এই আদর্শগুলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দার্শনিকেরা ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। এ সকল নীতিদার্শনিক নৈতিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যুক্তি প্রয়োগ করে নৈতিক সত্যতার বিষয়নিষ্ঠ সার্বিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু বর্তমানকালের যে সকল দার্শনিক ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিনিষ্ঠ নৈতিকতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাঁরা এজাতীয় মনোভাবকে স্বীকৃতি দেননি। তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর আমাদের জন্য কোনটি মঙ্গলজনক তা নির্ধারণ করলেও আমরা ঈশ্বরকে মঙ্গলময়রূপে নির্ধারণ করি। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি। তাহলে ঈশ্বরের আদেশ আমাদের নিকট তখনই গ্রাহ্য হবে যদি আমরা তার পূর্বস্বীকৃতিরূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে এবং তাঁর অধীনতাকে স্বীকৃতি দিই। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হয় ঈশ্বরের উপদেশের বৈধতা তখনই থাকবে যদি ঈশ্বর জনকল্যাণকারীরূপে প্রমাণিত হন। ঈশ্বরকে যেহেতু আমরাই 'ঈশ্বর' বলে স্বীকৃতি প্রদান করি তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে রয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় বলে তাঁর উপদেশকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলা যায় না। কেননা নৈতিকতার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির মঙ্গল। ফলে মঙ্গলের ধারণা ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা জীবননিরপেক্ষ হতে পারে না। মঙ্গলের ধারণায় ব্যক্তির চাহিদা আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। যে ঈশ্বরাদেশগুলি জীবনের জন্য মঙ্গলজনক বলে স্বীকৃত হয় সেগুলি প্রকৃত অর্থে মঙ্গলকারী হলে তবেই আমরা সেগুলিকে গ্রহণ করে নিই। ফলে জীবনের চাহিদা, আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে ঈশ্বর কোন মঙ্গলময়তার ধারণাকে অবশ্যপালনীয় বলে বিবেচনা করতে পারেন না। বলা যায়, নৈতিক ক্ষেত্রে চরমমঙ্গল সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। নাস্তিক ব্যক্তির নিকট ঈশ্বরাদেশের গুরুত্বহীনতা একথার প্রমাণ। ফলে নৈতিক আদর্শ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, আবার ঈশ্বরের আদেশ নয়। নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত আছে সমাজের ব্যক্তিবর্গের চাহিদা বা মঙ্গল, তাদের মানসিক প্রবণতার তৃপ্তি যা তারা জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য পালন করে।

নীতি নয়, যথাযথ আবেগ অর্জনই আদর্শ

এলিজাবেথ এ্যানস্কোম্ব[২০], ফিলিপা ফুট[২১] প্রমুখে সমসাময়িককালের দার্শনিকেরা নীতির ভূমিকাকে অস্বীকার করলেন। তাঁরা অন্ধভাবে নীতি অনুসরণের দ্বারা নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব নয় বলে মনে করলেন। এই সকল দার্শনিকেরা ইতিহাসের বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, প্রতিটি সমাজেই

জীবনযাপনের জন্য কতকগুলি মানবিক সদ্‌গুণ অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়েছে। কারণ মানবিক সদ্‌গুণ বা কতগুলি আবেগ যদি আমাদের জীবনে যথাযথ গুরুত্ব লাভ না করে তাহলে আমাদের জীবন নৈতিকতা শূণ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁরা একথাও স্বীকার করলেন যে, এই আবেগগুলি সমাজব্যবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই আবেগগুলিকেই তাঁরা সদ্‌গুণ বলে মনে করলেন। কারণ এই আবেগগুলি উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের আবশ্যিক শর্ত। ফলে নীতি নয়, নৈতিক আবেগগুলি সদ্‌গুণরূপে আমাদের নৈতিকবোধ গঠন করে ভালো জীবনযাপনে সহায়তা করে। এভাবেই তাঁরা বুদ্ধির অতিরিক্ত আবেগকে গুরুত্ব প্রদান করার মনোভাব জ্ঞাপন করলেন -- যা নৈতিকতার ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করলো। রলস নীতি নির্ধারণের জন্য হৃদয়ের শুদ্ধতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, কিন্তু সদ্‌গুণসম্পন্ন দার্শনিকেরা হৃদয়ের শুদ্ধতাকেই আদর্শ বলে মনে করলেন। এই সকল নীতিবিদগণ ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনকে নৈতিকতার মূল লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন। সৎ চরিত্রের ব্যক্তি হবেন দৃঢ়, স্থায়ী মানসিক অবস্থার অধিকারী। এরূপ ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলি ব্যক্তিকে মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত করে। আমরা সেই ব্যক্তিকেই প্রশংসা করি যার মধ্যে মহৎ গুণাবলি বর্তমান। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শরূপে নির্ধারণ করে জীবনকে পরিচালিত করি। আদর্শ কোনটিকে বলা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয় যদি আমরা সত্য কথা বলা কর্মটি কোন আদর্শ দ্বারা সমর্থিত তা নির্ণয় করি। কান্টের কর্তব্যবাদী মতে, আমাদের সত্য কথা বলা কর্তব্য, যেহেতু সেটি সর্বজনীন, বুদ্ধি নিঃসৃত নীতি দ্বারা সমর্থিত বলে কর্তব্য বলে গণ্য হয়। উপযোগবাদীরা এটিকে ভালো বলে ব্যাখ্যা করবেন, যেহেতু এর দ্বারা সর্বাধিক উপযোগিতা উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিকেরা সত্য কথা বলাকে ভালো বলে মনে করেন, যেহেতু এটি সততা নামক চারিত্রিক গুণ থেকে নিঃসৃত, মানবিকতাবোধের দ্বারা সমর্থিত।[২২]

সুতরাং এই সকল দার্শনিকেরা সদ্‌গুণগুলিকে নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেন, যেহেতু তাঁরা মনে করলেন চরিত্রে যদি সৎ প্রবণতা, আবেগ ইত্যাদি উপস্থিত থাকে তবে অবশ্যই আমরা কর্তব্যকর্ম পালন করব। তাঁরা মনে করলেন, "... ultimate moral reasons...makes essential reference to the rationality of virtue itself."[২৩] এ্যারিস্টটল মনে করেছেন, সদ্‌গুণ আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের অভ্যাসমূলক কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি উদারতা নামক আবেগের অধিকারী তিনি সর্বদাই সেরূপ কর্মই পালন করবেন যে কর্মে উদারতা প্রকাশিত হবে। উদারতা যদি তার স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয় তবে সে ক্ষেত্র বিশেষে ঐরূপ মনোভাব প্রকাশ করবে না। কারণ উদারতা তার অভ্যাসে পরিণত

হবে। কিন্তু এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সৎ আবেগ যেমন সৎ ব্যক্তির প্রতিটি কর্মে প্রতিফলিত হবে, মন্দ আবেগ, যেমন হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদিও অসৎ ব্যক্তির সকল কর্মে প্রকাশিত হয়। তাহলে আমরা সৎ আবেগ বা সদ্‌গুণকে কিভাবে মন্দ আবেগ বা অসদ্‌গুণ থেকে পৃথক করব? এডমাণ্ড এল পিনকফস[২৪] এর একটি সমাধান দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, সদ্‌গুণের কারণে আমরা ব্যক্তিকে পছন্দ করি, আবার অসদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে অপছন্দ করি। বাস্তবে আমরা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করি যিনি কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষ। যেমন, একজন মিস্ত্রীকে দক্ষ বলা হয় যদি সে পারদর্শীতার সাথে গাড়ীর যন্ত্রাংশ মেরামতীতে সমর্থ হয়। একটি স্থপতিকে দক্ষ বলা হয় যদি তাঁর সৃষ্ট স্থাপত্য দৃষ্টিনন্দন হয়, তেমনি আমরা ব্যক্তিকে ভালো বলে মনে করি যদি তার চারিত্রিক গুণগুলি জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। তবে চারিত্রিক গুণগুলি দক্ষতা অর্জনের মতো গুণ নয়। এটি ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক। তাই সদ্‌গুণ বলতে বোঝায়, "... *a trait of character, manifested in habitual action, that it is good for a person to have.*"[২৫] আমরা সেই ব্যক্তিকে প্রশংসা করি যে ব্যক্তির চরিত্রে ক্ষমা, স্নেহ, সমমর্মিতা, করুণা, সততা, বিশ্বাস ইত্যাদি আবেগগুলির যথাযথ মাত্রায় অবস্থান করে। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে চালিত হন তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হলেও তাকে আমরা পছন্দ করি না। আমরা একে অপরের কাছে সহযোগিতা, সমমর্মিতাবোধ আশা করি। একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ হই কতকগুলি মানবিকগুণের দ্বারা বা আবেগের দ্বারা। আবেগের যথাযথ উপস্থিতিই হল সদ্‌গুণ। তবে সেই গুণগুলিই সদ্‌গুণ বলে চিহ্নিত হবে, যেগুলি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে সদ্‌গুণগুলির প্রকৃতি ভিন্ন হয় সমাজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী। ফলে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুণগুলির চরিত্রও পরিবর্তিত হতে থাকে। সামাজিক পরিস্থিতি বা সামাজিক চাহিদা অনুসারে সদ্‌গুণগুলি নির্ধারিত হয়। নৈতিকতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী, ব্যক্তি চরিত্রে উপস্থিত আবেগ, ইচ্ছা, প্রবণতা, আকাঙ্ক্ষার চরিত্র যুগভেদে, স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়েছে।

আদর্শ সদ্‌গুণ সমাজনিরপেক্ষ নয়

প্রাচীন গ্রীসে ভৌগলিক প্রতিকূলতায় একাধিক নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। পাহাড়, পর্বতময় গ্রীসে ভৌগলিক কারণে একটি একক রাষ্ট্র গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। প্রতিটি নগর রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন গ্রীসে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী নৈতিক মূল্যবোধগুলি নির্ধারিত

হয়। হোমারের যুগে তাই নৈতিক আলোচনায় দৈহিক স্বাস্থ্য, বীরত্ব, দেশপ্রেমকে নৈতিক সদ্‌গুণ বলে মনে করা হতো। নিজ দেশকে রক্ষা করাই ছিল নাগরিকদের একমাত্র নৈতিক কর্তব্য। সেই সময়ে যোদ্ধা সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন, বীরত্ব অর্জন করাই আদর্শ বলে গণ্য হত। সে যুগে দৈহিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া ছিল ব্যক্তির চরম উৎকর্ষতা লাভ। নৈতিক আদর্শ ছিল দেশভক্তি; দেশকে ভালোবাসা বা দেশের জন্য নিজেকে বিসর্জন দেওয়াই ছিল নাগরিকদের একমাত্র নৈতিক কর্তব্য। ফলে হোমারের যুগে মহৎ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হওয়ার লক্ষ্যে দৈহিক স্বাস্থ্য, শক্তিমত্তা অর্জন ছিল নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য। দেশপ্রেম নৈতিক আবেগরূপে ভালো ব্যক্তির চরিত্রে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় বলে গণ্য হতো। অর্থাৎ তৎকালীন ভৌগোলিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিল নৈতিকতার ধারণা। নৈতিক সদ্‌গুণগুলি নির্ণীত হতো সামাজিক মঙ্গলের নিরিখে। যে ব্যক্তি সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম সেই ব্যক্তিই সমাজের জন্য কাঙ্ক্ষিত। যে ব্যক্তি রক্ষক, বীর, মহৎ, সেই ব্যক্তিই পূজিত। ফলে পরিস্থিতির চাহিদা নৈতিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই দেখা যায়, হোমারীয় যুগে নৈতিক আদর্শ রূপায়ণে ব্যক্তির দৈহিক স্বাস্থ্যের সাথেই গুরুত্ব লাভ করেছে তার দেশের প্রতি ভালোবাসা, সাহস, আত্মত্যাগ, বীরত্বের মনোভাব -- যেগুলি কতকগুলি সৎ নৈতিক আবেগরূপে তার চরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা নয়, দেশের প্রতি ভালোবাসাই গুরুত্ব লাভ করেছে। পূর্বে উল্লিখিত গ্রীক বীর এ্যাগামেমনান যখন ট্রয় নগরী আক্রমণে নৌবহর সুসজ্জিত করেছেন সেই সময় বীরের ধর্মরূপে দেবতার আদেশে নিজ কন্যা ইফিজিনিয়াকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। কেননা নৈতিক আদর্শে অবিচল গ্রীক বীর এ্যাগামেমনানের নিকট দেবতার আদেশে দেশকে রক্ষা করাই ছিল প্রধান কর্তব্য। নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী তাঁর কর্মকে ন্যায়সঙ্গত বলেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু হোমারের যুগে দৈহিক উৎকর্ষতা নৈতিক সদ্‌গুণরূপে বিবেচিত হলেও বর্তমানকালে সদ্‌গুণের আলোচনায় দৈহিক সদ্‌গুণকে নৈতিক সদ্‌গুণ বলে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কেননা বর্তমানে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তে ঠাণ্ডা লড়াই-এর ধারণা স্থান পেয়েছে। কূটকৌশল অবলম্বন করে একটি দেশের সমৃদ্ধিকে অচল করে দেওয়াই হল ঠাণ্ডা লড়াই। সেখানে দৈহিক উৎকর্ষতা প্রদর্শন করা নয়, বরং যান্ত্রিক উন্নতিতে কোন দেশ কতটা ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে তারই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যকে নৈতিক সদ্‌গুণ বলা না হলেও, মানবিক সদ্‌গুণ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তির সুস্থ থাকার জন্য দৈহিক সুস্বাস্থ্যকে আবশ্যিক শর্ত বলে ধরা হয়। অর্থাৎ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যই দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তা অস্বীকার করা হয় না। ফলে

সমসাময়িককালে দৈহিক উৎকর্ষতা নয়, মানবিক সদ্‌গুণ অর্জনকেই নৈতিকতার আদর্শরূপে বিবেচনা করা হয়।

এ্যারিস্টটলীয় যুগে নৈতিক আদর্শ লাভের উপায়স্বরূপ যে চারিত্রিক সদ্‌গুণ অর্জন করার কথা বলা হয়েছে তার কারণ প্রোথিত আছে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে। এই সময় সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা সমাজে উচ্চস্থান ও মর্যাদা লাভ করত, এরাই সমাজের নিয়ন্ত্রকরূপে ক্রিয়া করত। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল রাজনীতিবিদ, এদের চালনা করত অভিজাত শ্রেণী। সর্বনিম্নশ্রেণী ছিল দাস, যাদের সমাজে প্রভুসেবা করাই একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত ছিল। সমাজে অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকায় এযুগে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরাই নৈতিক সদ্‌গুণ লাভে সমর্থ ছিল। ফলে আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্য শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ছিল। সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ আদর্শ মানুষরূপে পরিগণিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এ্যারিস্টটলের মতে, সৎ কর্ম সাধনের জন্য বিশেষ চারিত্রিক সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ব্যক্তিকে প্রথমে সদ্‌গুণের অধিকারী হতে হবে। সদ্‌গুণকে তিনি প্রবণতা বলে মনে করেছেন, যা আমাদের কর্ম পালনে প্ররোচিত করে। সাহস, মিতাচার, বন্ধুত্ব প্রভৃতি আবেগ অর্জন করতে হবে তার স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতারূপে। ব্যক্তি সদ্‌গুণ অভ্যাসের মাধ্যমে নৈতিকতার চরম আদর্শ *eudaimonia* [২৬] বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভ করতে সক্ষম হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে নৈতিকতার আদর্শ যুগভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। হোমারীয় যুগের দৈহিক গুণের উৎকর্ষতা পরিবর্তিত হয়েছে মানবিক গুণের উৎকর্ষতায়। এর কারণ অবশ্যই ছিল সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। এ্যারিস্টটলীয় যুগে সমাজে মহৎ ব্যক্তি প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হতো। মহৎ ব্যক্তি বলতে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অপরের নিকট কাঙ্ক্ষিত বলে গণ্য হবেন। অর্থাৎ এ যুগে নৈতিক আদর্শরূপে সদ্‌গুণের চর্চার মাধ্যমে ভাল মানুষ বা নৈতিক মানুষ গঠনই লক্ষ্য ছিল। সেই মানুষকেই ভাল মানুষ বলে মনে করা হতো যিনি সদ্‌গুণের অধিকারী। এখানে ব্যক্তি জীবনই মুখ্য ছিল। কেননা ব্যক্তির জীবন ভালো হলে সমাজ জীবনও ভালো হবে। সেই কারণে নৈতিক আদর্শই হলো সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠা। অর্থাৎ ব্যক্তির মনকে প্রস্তুত করা, তার চাহিদা, ইচ্ছা, আবেগ, প্রবণতাকে যথাযথভাবে গঠন করা।

এ আলোচনা থেকে বলা যায়, সৎ আবেগ অর্জন করার সামর্থ্য কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলেছিলেন। কিন্তু সমসাময়িককালের যে সকল দার্শনিক সদ্‌গুণ অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁরা একটি ভিন্ন আঙ্গিক থেকে সদ্‌গুণকে বুঝেছেন। তাঁদের আলোচনায় সদ্‌গুণ কোন নির্দিষ্ট

শ্রেণীর কুক্ষিগত বিষয় নয়। সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার সামর্থ্য সকলেরই রয়েছে। বর্তমান যুগে নৈতিক আদর্শরূপে সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তা কেবলমাত্র সমাজে উচ্চবর্গের শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট নয়। সমাজের সকল ব্যক্তি, অর্থাৎ ধনী, দরিদ্র, শ্রেণী, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ভালো জীবন যাপন করতে সক্ষম। অর্থাৎ নৈতিক আদর্শ অনুসারে আচরণ করা সকল মানুষের জন্যই নির্ধারিত। সমাজের সকল মানুষই নৈতিক জীবনযাপন করতে সমর্থ। সমসাময়িককালের নীতিবিদ জেমস র‍্যাচেলস[২৭] নৈতিক আদর্শ লাভের উপায়স্বরূপ চব্বিশটি সদ্‌গুণের তালিকা দিয়েছেন। এই চব্বিশটি সৎ গুণের মধ্যে আত্মসংযম, আত্মনির্ভরশীলতা, ধৈর্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সৎ আবেগকে ব্যক্তি চরিত্রে অর্জন করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সমাজই ব্যক্তির মূল্যবোধকে নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সামাজিক ব্যক্তিবর্গ কোন পথে নৈতিক জীবনে পূর্ণতা অর্জন করবে তার নির্ধারক সমাজ। বর্তমানযুগে যেমন সকলেই সদ্‌গুণের, সৎ আবেগের অধিকারী হতে পারে তেমনি নিউটেস্টামেন্টেও আমরা লক্ষ্য করি সমাজে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিই বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণের অধিকারী হতে সক্ষম ছিল। তবে বর্তমানযুগে সমাজজীবনের জন্য উপযোগী সৎ আবেগগুলি অর্জন করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হলেও, মধ্যযুগে ঈশ্বর বিশ্বাসের কারণেই এই আবেগগুলি ধাবিত হত ঈশ্বরের প্রতি। সেখানে সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন লক্ষ্য বলে স্বীকৃত ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস বা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই ছিল নৈতিক আদর্শ। ঈশ্বরে ভক্তিই হল ব্যক্তি মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। সে কারণে ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ হিসাবে আস্থা ও বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবা হয়েছে। সমাজ ছিল ধর্মের কাঠামোতে বিধৃত। ফলে সমাজের ব্যক্তিবর্গের নৈতিক উন্নতি ধর্মের কাঠামোতেই সম্ভব বলে মনে করা হতো। ধার্মিক ব্যক্তি সেযুগে প্রকৃত নৈতিক ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হতো। কেননা নৈতিকতার আদর্শ হল ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার লক্ষ্যে আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা- এই সদ্‌গুণগুলিকে ধার্মিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবশ্যিক বলে গণ্য করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় নীতিবিদ টমাস অ্যাকুইনাসের[২৮] মতে, নৈতিকতার আদর্শ হল ঈশ্বরে নির্বিচার বিশ্বাস স্থাপন করা। কেননা তাঁর মতে, ঈশ্বর স্বীকৃতির মধ্যেই বা ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস জ্ঞাপনের মাধ্যমেই জীবনের চরম আনন্দময় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। অর্থাৎ ঐশ্বরিক মহিমায় বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারই মানব জীবনের চরমলক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাবিদগণ ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার ধারণার তুলনায় ব্যক্তিকেই নৈতিকতার ক্ষেত্রে মুখ্য বলে গণ্য করলেন। কেননা নাস্তিক ব্যক্তিগণের পক্ষে ঈশ্বর স্বীকৃতি এবং তাঁর প্রতি আকুতি অর্থহীন বলে গণ্য হলো। ঈশ্বর স্বীকৃতির পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের জীবনকে কীভাবে

মঙ্গলময় করে গড়ে তোলা যায় তা নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করল। ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য বা আদর্শ হল মঙ্গলময় জীবন লাভ করা। এ্যারিস্টটলের ভাবনার প্রতিফলন দেখা গেল এ্যাকুইনাসের পরবর্তী সময়ে। জেন অস্টিনের[২৯] নিকট নৈতিকতার আদর্শ হল কীভাবে সুন্দরভাবে জীবনকে গড়ে তোলা যায়। জেন অষ্টিন এই আদর্শ লাভ করার জন্য সদ্‌গুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অভিমতে, সদ্‌গুণের চর্চা বা সৎ আবেগ অর্জনই ব্যক্তিকে মঙ্গলময় জীবনের লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম। তবে তাঁর সদ্‌গুণের তালিকা নির্ধারিত হয়েছিল সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে। সে কারণে তিনি যেগুলিকে আদর্শ সদ্‌গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন তার সাথে এ্যারিস্টটল ও এ্যাকুইনাস বা হোমারের সদ্‌গুণের কোন সাদৃশ্য নেই। জেন অস্টিন সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অভিজাত শ্রেনীর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজের বেশিরভাগ মানুষই হল মধ্যবিত্ত, যারা জৈবিক প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে যুক্ত এবং সমাজে অন্য ব্যক্তিদের সাফল্যকে বর্ধিত করতে সহায়তা করছে। এই শ্রেনীর নৈতিক উন্নতিকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন, সমাজস্থ ব্যক্তিদের চারিত্রিক উন্নতি হলেই সমাজের উন্নতি সম্ভব। মঙ্গলময় জীবনের লক্ষ্যে উত্তরণের জন্য তিনি চারটি সদ্‌গুণ, যথা বিচক্ষণতা, যুক্তিযুক্ততা, সৌজন্যবোধ ও আত্মমর্যাদার কথা বলেছেন। বিচক্ষণতা নামক সদ্‌গুণের উপস্থিতিতে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ পূরণে যথাযথ কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হবেন। তাঁর সৌজন্যবোধের কারণে সে পরিবারস্থ এবং অপরিচিত ব্যক্তি উভয়ের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করবেন। তাঁর যুক্তিযুক্ততার সদ্‌গুণটি তাকে সদ্‌গুণ অনুযায়ী সঠিক কর্ম পালনে সহায়তা করবে এবং আত্মমর্যাদার কারণে সে নিজেকে স্বতন্ত্র নৈতিক ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি দেবে। তাঁর সদ্‌গুণের তালিকা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, তিনি সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্যই ব্যক্তির চরিত্রে কতগুলি মানবিকগুণের বিকাশের প্রতি যত্নশীল হয়েছিলেন।

এ আলোচনা থেকে বলা যায়, কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে কতকগুলি আকারসর্বস্ব নীতিপালনই নৈতিক জীবনের আদর্শ নয়। বিপরীতপক্ষে বলা যায়, কতগুলি মানবিক গুণ এবং আবেগ অর্জন করতে সক্ষম হলেই ভাল জীবনযাপন লাভ করা সম্ভব হবে। অস্টিনের মতে, Developing amiability is central to most people's lives, since we must work and live in close confinement with others with whom we have to get along.[৩০] তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ব্যক্তিবিদ্বেষ সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। এই কারণে তিনি সহৃদয়তা অর্জন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তির আবেগকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনই যুক্তি প্রদর্শন করাকে

সদ্‌গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন। যুক্তিযুক্ততা বলতে তিনি বুঝেছেন, সৎবোধের উপলব্ধি এবং সেটি অনুসারে কর্ম পালন। অস্টিন সামাজিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে কিভাবে সকল ব্যক্তি পরমমঙ্গলময় বা পরমানন্দময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে তার আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী অস্টিন ব্যক্তি মানুষের উন্নতির ফলে সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব হতে পারে বলে মনে করেন বলেই ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করেছেন। তবে এই স্বার্থগুলিকে অবশ্যই তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে মনে করেন না। কারণ একইসাথে তিনি সৌজন্যবোধকেও একটি জরুরী সদ্‌গুণ বলে মনে করেছেন। আবার যুক্তিযুক্ততাও তাঁর তত্ত্বে সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে অস্টিন ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন তেমনই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে দূর করার প্রয়োজনীয়তাকেও তিনি সমানভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলেই এই সদ্‌গুণের তালিকাটি তিনি প্রস্তুত করেছেন। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যে কেবলমাত্র সৎ কর্ম সম্পাদনেই সদ্‌গুণকে আদর্শ বলে ব্যবহার করবে তা তিনি মনে করেননি। তাঁর মতে, সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেও আদর্শরূপে সমাজের অন্য ব্যক্তিদের নিকট দৃষ্টান্ত বলে স্বীকৃত হবেন। তিনি কেবলমাত্র সদ্‌গুণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান না করে কীভাবে সদ্‌গুণ অর্জন করা যায় সেকথাও ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর রচিত নাটকের চরিত্রের মাধ্যমে। কিভাবে সমাজের ব্যক্তিবর্গ সেই আবেগগুলিকে অর্জন করতে পারে তিনি নাটকের চরিত্রের মাধ্যমে ব্যবহারিকভাবে তার প্রয়োগ কৌশল দেখিয়েছেন।

সতোরোর দশকে অস্টিন–পরবর্তী দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মতে, আদর্শরূপে স্বীকৃত সদ্‌গুণগুলি সমাজসাপেক্ষ। অর্থাৎ সদ্‌গুণগুলি সমাজের ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছা, চাহিদার উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হবে। সেযুগে আমেরিকার উন্নতির লক্ষ্যে, আমেরিকার অধিবাসীদের ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির জন্য যে নৈতিক সদ্‌গুণের আলোচনাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেই আলোচ্য বিষয়কে বর্তমানে "The American dream"[৩১] বলা হয়। The essence of the dream is that any man can prosperity, economic security, and community respect through hard work and honest dealings with others.[৩২] সেই সময় ফ্রাঙ্কলিন দেখেন সমগ্র ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় অর্থের আধিক্য বিশেষ শ্রেণীর কিছু মানুষের কুক্ষিগত, শ্রেনীভেদ প্রথা সমাজকে পঙ্গু করে তুলেছে, অর্থনীতি দ্বারাই নির্ধারিত হচ্ছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক নিয়ম। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকার সমাজকে উন্নত করার লক্ষ্যে তিনি ব্যক্তিদের নৈতিক জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে সদ্‌গুণের আলোচনা করেছেন তা যেমন ব্যক্তি মানুষকে উন্নত

করবে, তেমনই সমাজকেও উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেবে। তিনি তেরোটি সদ্‌গুণ অর্জনের কথা বলেছেন। মিতাচার, নৈঃশব্দ, সুশৃঙ্খলতা, সংকল্প, মিতব্যয়িতা, অধ্যবসায়, বিশ্বস্ততা, ন্যায়, পরিমিতিবোধ, পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক সততা, প্রশান্তি, বিনয়। তাঁর এই সদ্‌গুণের বা সৎ আবেগের আলোচনাতে প্রাধান্য লাভ করেছে ফিলাদেলফিয়ার উন্নতি। পরিচ্ছন্নতা, নৈঃশব্দ, অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎ আবেগ ফিলাদেলফিয়ার সামগ্রিক উন্নতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ফলে সমাজের পরিস্থিতির চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েই এই সৎ আবেগগুলিকে তিনি মুখ্য সদ্‌গুণ বলে গণ্য করেছেন।

মুক্তমনের অধিকারী হওয়া-- যা সে যুগে নৈতিক লক্ষ্য বলে নির্ধারিত ছিল, বর্তমানকালে সদ্‌গুণের আলোচনাতেও কোনও কোনও নীতিদার্শনিক একইভাবে মুক্তমনকে সদ্‌গুণ বা সৎ আবেগ বলে বিবেচনা করেছেন। মুক্তমন বা স্পষ্টমনের অধিকারী হওয়া অন্যতম সদ্‌গুণ কেননা অপরের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা বা নিজের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা তাকে পরিত্যাগ করে অপরের বিষয়কে বিচার করার ক্ষেত্রে মুক্তমনের অধিকারী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। উদার, ন্যায়পরায়ণ মনের অধিকারী না হলে অপরকে বিচার করা বা নিজেকে বিচার করা সম্ভব নয়। এ্যারিস্টটলের ন্যায় ফ্রাঙ্কলিন চারিত্রিক উন্নতি এবং উন্নত প্রবণতাকে গুরুত্ব দিলেও তাঁদের দর্শন আলোচনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ্যারিস্টটলের দর্শনে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি সদ্‌গুণ অর্জনকে বা চারিত্রিক উৎকর্ষতাকেই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের মূল লক্ষ্য হলো বাহ্যজগতের সুখলাভ। অর্থাৎ সদ্‌গুণের অভ্যাস করা হয় বাহ্যিক সৌভাগ্য, সাফল্য এবং স্বর্গীয় আনন্দ লাভের জন্য। ব্যক্তি সদ্‌গুণ অভ্যাস করে বা সদ্‌গুণকে উপায়রূপে গ্রহণ করে লক্ষ্যরূপে লাভ করবে বাহ্যিক বিষয়। এ্যারিস্টটল জাগতিক সমৃদ্ধি, সুখ ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেও সেগুলিকে তার লক্ষ্য লাভের আবশ্যিক শর্ত বলে গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন ব্যবহারিক জীবনকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করায় সেটিকেই জীবনের চরমলক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করেছেন। তবে একইসাথে তিনি নৈতিক আদর্শের দ্বারা চালিত ছিলেন বলেই ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পথ নির্ধারণ করেছিলেন তা কোনভাবেই অনৈতিক বলে গ্রাহ্য নয়। তিনি সদ্‌গুণের তালিকার মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। বাহ্য সুখ অর্জন করতে হলে আন্তঃস্তরীণ উৎকর্ষতা সাধন আবশ্যক।

এ্যালেসডায়ার ম্যাকিনটায়ারঃ আদর্শ ব্যক্তি ইচ্ছানির্ভর

নৈতিক আদর্শ যেহেতু ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানিরপেক্ষ নয়, তাই ব্যক্তির স্বীকৃতি ভিন্ন কোন আদর্শ তার নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই মতটি স্পষ্ট হয় যদি আমরা সমসাময়িককালের নীতিবিদ ম্যাকিনটায়ারের[৩৩] দর্শন আলোচনা করি। অস্টিনের সদ্‌গুণসংক্রান্ত আলোচনার সাদৃশ্য পাওয়া যায় ম্যাকিনটায়ারের সদ্‌গুণসংক্রান্ত আলোচনায়। তিনি মনে করেন, সদ্‌গুণের অভ্যাসের মাধ্যমে ব্যক্তি নৈতিক জীবনের চরম আদর্শ লাভ করতে সক্ষম। আদর্শ নির্ধারণের জন্য তিনি কেবলমাত্র বুদ্ধি নির্ভরতার পথ ত্যাগ করে ব্যক্তির মন, তার আবেগ ইত্যাদির ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। নৈতিকতা যে কেবলমাত্র বুদ্ধিনির্ভর বিষয় নয়, ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে গভীরভাবে যুক্ত—তা তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, আদর্শটি আমাদের মনের সাথে যুক্ত না হলে তার দ্বারা আমাদের অন্তরের ভালোত্ব অর্জন সম্ভব নয়। কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞা বা কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালন আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করতে পারে না, আনন্দ প্রদান করতে পারে না। ব্যক্তি কঠোরভাবে কর্তব্যবোধে আদর্শকে অনুসরণ করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু কর্তব্য পালনকে আনন্দে পরিণত করতে হলে আদর্শটিকে আমাদের মনের সাথে যুক্ত করতে হবে। সুতরাং আদর্শ কোন অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট বিষয় নয়, এটি ক্রমপরিবর্তনশীল প্রগতির ফল। কারণ তাঁর মতে, আদর্শ নির্ধারিত হয় ঐতিহাসিকভাবে। যেমনভাবে সৌন্দর্যের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজের চিন্তা ভাবনার সাথে প্রাচীন ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটে, সেভাবেই সমাজ দ্বারা নির্ধারিত শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। ফলে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা অনুসারে আমার আদর্শটি নির্ধারিত হয়। আদর্শের সংজ্ঞাটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে গ্রাহ্য হলে তবেই আমি নিজেকে তার নিরিখে যাচাই করতে সচেষ্ট হবো, ঐ মানদন্ডটির শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করব। যদি আমাদের মানসিক সমর্থন ঐ আদর্শের প্রতি না থাকে তবে কখনই তার কর্তৃত্বকে আমি স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক হবো না। আমার মনোভাব, পছন্দ, অভিজ্ঞতা ঐ মানদণ্ডকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিলে তবেই আমি ঐটি অনুসরণ করতে সম্মত হবো। বিপরীতপক্ষে, যদি ঐ মানদণ্ডটি ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য বলে স্বীকার না করে তবে সেটির কর্তৃত্বকে মূল্য দিতে ব্যক্তি সম্মত হবে না। সুতরাং ব্যক্তি তখনই ঐ মানদণ্ড অনুসরণ করবে যখন সেটি তার আবেগ, ইচ্ছা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হবে। ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানদণ্ড কখনও ব্যক্তির ব্যবহারকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই ম্যাকিনটায়ারের মতে, প্রত্যেক সমাজেই নৈতিক আদর্শ স্বীকৃত। ব্যক্তি সেই আদর্শকে গ্রহণ করবেন কিনা সেক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যক্তি সেই আদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। যেমন শিল্পকলার ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের

ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মাবলি বর্তমান। ব্যক্তি নিজেই নিজের পছন্দ অনুযায়ী কোনটিকে তিনি গ্রহণ করবেন সে ব্যাপারে তিনি স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে যে বিষয়টিকে তিনি নির্বাচন করবেন সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের নিয়মাবলিকে স্বীকার করতে তিনি বাধ্য থাকবেন। তবে প্রয়োজনে সেই নিয়মাবলিকে পরিবর্তন করার স্বাধীনতাকেও স্বীকার করা হয়েছে। তাই নৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক সমাজে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেও সেই নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দ করার অধিকার থাকবে। তিনি মনে করেন, কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা আদর্শ নিরূপণ করলে চলবে না। ব্যক্তির সামাজিক বোধ, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সমাজ নির্ধারিত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকেই ঐ মানদণ্ডটি নিঃসৃত হয়। তবে শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে এবং আদর্শকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের কতকগুলি সৎ আবেগ বা সদ্‌গুণের উপস্থিতিকে পূর্বশর্ত বলে স্বীকার করে নিতে হবে। ন্যায্যতা, সাহস, সততা ইত্যাদি আমাদের আদর্শ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। যদি আমাদের চরিত্রে ন্যায্যতার অভাব থাকে তাহলে কখনও আমরা অপরের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হবো না; আবার কোন মন্দ আদর্শের বিরোধিতা করার জন্যও সাহসের প্রয়োজন। সমাজ নির্ধারিত বিষয়ের সাথে আমার মতবিরোধ দেখা দিলে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করার সাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। সাহস এবং সততা না থাকলে আমরা আমাদের অপূর্ণতাকেও স্বীকার করতে সমর্থ হবো না। ন্যায্যতা ও সততার অভাব থাকলে আমরা অন্তর থেকে ঐ আদর্শের কর্তৃত্বকে স্বীকার করব না। ঐ আদর্শটি যদি আমরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, সেটিতে আস্থা স্থাপন করি তবেই সেটি অন্তর থেকে অনুসরণ করা সম্ভব। সুতরাং সততা, সাহস, ন্যায্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি আমাদের আদর্শ নির্ণয়ের জন্য আবশ্যক।

দেখা যাচ্ছে প্রতিটি সমাজে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মঙ্গলের লক্ষ্যে সেই সমাজের নৈতিক আদর্শ নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিদের চাহিদা, সমাজের চাহিদাই নৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করে। ফলে আদর্শ কখনই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, পরিস্থিতিনিরপেক্ষ সর্বজনীন হতে পারে না। নৈতিক আদর্শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অর্থ বিশেষ কোন ব্যক্তির চাহিদা বা আশা--আকাঙ্ক্ষা নয়। বরং বলা যায় সমাজস্থ ব্যক্তির আশা–আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা অনুযায়ী নৈতিক আদর্শ নির্ধারিত হয়। কোন স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন নিয়ম আদর্শ বলে চিহ্নিত হয় না, বরং মানুষের মনই নৈতিক আদর্শের মূল উৎস। ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি, যার মাধ্যমে আমরা অন্যের সুখ কামনা করি এবং অপরের দুঃখে কাতর হই সেই সুখ দুঃখের অনুভূতি, ভালোলাগা, ভালোবাসা, সহমর্মিতাই হলো নৈতিক আদর্শের উৎস। সমাজের ব্যক্তিবর্গের অনুভূতির স্বীকৃতিই নৈতিক বিষয়কে নির্ধারণ করে। পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিমনের ধারণাকে যে সকল দার্শনিক আদর্শ নির্ণয়ে ব্যবহার করার কথা বলেছেন তাঁদের মতে,

নৈতিকতার কোন স্থায়ী মানদণ্ড নেই, নৈতিক আদর্শ ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা সমাজনিরপেক্ষ নয়। সুতরাং মানবজীবনের নৈতিক আদর্শ হল পরমকল্যাণ অর্জন বা আনন্দময় জীবনযাপন। পরমকল্যাণ বা আনন্দময় জীবনের অর্থ হলো সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনযাপন। সদ্‌গুণ চর্চার মাধ্যমে সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠাই আদর্শ। এখানে লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। অর্থাৎ ঐ লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য ঐ নির্দিষ্ট উপায়টিই একমাত্র অনুসরনীয়। অর্থ লাভের জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায় অনুসরণ করতে পারি। চাকুরীজীবি ব্যক্তি তার সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থবান হতে পারে, ব্যবসায়ী ব্যবসার লভ্যংশের দ্বারা অর্থবান হতে পারেন; আবার অসৎ উপায় অবলম্বনকারী ব্যক্তি চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টি সেরূপ নয়। কারণ আনন্দময় জীবনযাপন অর্থই হলো সৎ মানসিকতায় পূর্ণ থাকা, অর্থাৎ মনে সৎ দ্বন্দ্বহীন অবস্থা বজায় রাখা, এমন মানসিক অবস্থা বজায় রাখাই আদর্শ জীবনযাপনের অর্থ বলে দার্শনিক প্লেটোও মনে করেছিলেন। আবার এই লক্ষ্যটি অর্জন করতে হলেও আমাদের সৎ আবেগের কর্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে লক্ষ্য এবং উপায় সমরূপ। লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান।[৩৪]

তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, নৈতিক আদর্শ শুধুমাত্র আমাদের কামনাবাসনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় তা নয়, ব্যক্তির বুদ্ধিও এক্ষেত্রে কার্যকর। সমাজের কোন্ বিষয়গুলির চাহিদা ব্যক্তি মানুষকে প্রভাবিত করে তা বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি অনুসারে নির্ধারিত হয়। নৈতিক জগতের সদস্যরূপে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভাল, মন্দের ধারণা বর্তমান। ব্যক্তি মানুষই যুক্তিবুদ্ধি সহকারে সমাজের মঙ্গলের লক্ষ্যে আদর্শকে নির্ধারিত করে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানুষই যুক্তি প্রয়োগ করে আদর্শটি পরিবর্তন করে। বলা যায় সমাজের চাহিদা, ব্যক্তির প্রয়োজন, আশা, আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে নৈতিক আদর্শ নিরূপণ করা যায় না। আবার যে আদর্শ আমরা অনুসরণীয় বলে মনে করি সেটি আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য দ্বারা এবং অপর সকল ব্যক্তির দ্বারাও স্বীকৃত হয় বলেই সেটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতামুক্ত। সামাজিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্যরূপে আমরা প্রত্যেকেই এমন আদর্শকেই অনুসরণ করতে আগ্রহী হই যা আমাদের সৎ আবেগগুলির পরিতৃপ্তি ঘটাতে সক্ষম হবে এবং একইসাথে সমাজস্থ অপর ব্যক্তিদের প্রত্যাশা-পূরণে সক্ষম হবে। ফলে আদর্শ যেমন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, তেমনি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়ও নয়।

তথ্যসূত্র

১। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৪৮

২। মিল, জন, স্টুয়ার্ট, ১৯৭৯

৩। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৪৮

৪। ঐ

৫। দাস, রাসবিহারী, ১৯৯৫

৬। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৭৯, পৃ ৭৮

৭। ঐ, পৃ ৭৮

৮। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৪৮

৯। রলস, জন, ১৯৯৯, পৃ ১০

১০। ঐ, পৃ ১৮

১১। ঐ, পৃ ১১

১২। ঐ, পৃ ৫৩

১৩। সিজউইক, হেনরী, ১৯৬৭, পৃ ২০

১৪। হেমিংওয়ে, আর্নেষ্ট, ২০০৩, পৃ ৩০৫

১৫। হার্স্টহাউস, রোসালিন্ড, ২০০৪

১৬। শ্লিক, মরিৎ, ১৯৩৯

১৭। নুসবাম, মার্থা. সি, ১৯৮৬, পৃ ৩২

১৮। ওয়েস্টারমার্ক, এডওয়ার্ড, ১৯৩২, পৃ ৮৮

১৯। গার্ডনার, উইলিয়ামস, ১৯৪৩, পৃ ৩৫২

২০। এ্যানস্কোম্ব, জি, ই, এম, ১৯৯৭

২১। ফুট, ফিলিপা, ১৯৯৭

২২। ক্রিস্প, রজার এবং স্লট, মাইকেল, ১৯৯৭, পৃ ৩

২৩। ক্রিস্প, রজার এবং স্লট, মাইকেল, ১৯৯৭ , পৃ ৩

২৪। র‍্যাচেলস, জেমস, ১৯৯৮, পৃ ৬৭১

২৫। ঐ, পৃ ৬৭১

২৬। বস্টক, ডেভিড, ২০০০, পৃ ২৪

২৭। র‍্যাচেলস, জেমস, ১৯৯৮, পৃ ৬৭১

২৮। এ্যাকুইনাস, থমাস, ২০১৪

২৯। গ্যালপ, ডেভিড, ১৯৯৯

৩০। ঐ, পৃ ১০৩

৩১। ঐ, পৃ ১০৫

৩২। ঐ, পৃ ১০৫

৩৩। ম্যাকিনটায়ার, এ্যালেসডায়ার, ১৯৯৭

৩৪। ঐ

সূত্রনির্দেশ

১। এ্যানস্কোম্ব, জি, ই, এম, (১৯৯৭), 'মডার্ন মরাল ফিলজফি', *ভারচু এথিক্স,* ক্রিস্প, রজার এবং স্লট, মাইকেল সম্পাদিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

২। এ্যাকুইনাস, থমাস, (২০১৪), *সাম্মা থিওলজিকা,* ফ্রেডোসে, জে, আলফ্রেড অনূদিত, ইউনিভার্সিটি অব নটরডাম

৩। ওয়েস্টারমার্ক, এডওয়ার্ড, (১৯৩২), *এথিক্যাল রিলেটিভিটি,* হারকোর্ট ব্রাস এন্ড কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক

৪। কান্ট, ইমানুয়েল, (১৯৪৮), *গ্রাউন্ডওয়ার্ক অব দি মেটাফিজিক অব মরালস,* প্যাটন, এইচ. জে. অনূদিত, হাচিসন ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন

৫। কান্ট, ইমানুয়েল, (১৯৭৯),*গ্রাউন্ডওয়ার্ক অব দি মেটাফিজিক অব মরালস,* প্যাটন, এইচ. জে. অনূদিত, বি, আই পাবলিকেশন্স, কলকাতা

৬। ক্রিস্প, রজার এবং স্লট, মাইকেল (১৯৯৭) , *ভারচু এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

৭। গার্ডনার, উইলিয়ামস, (জুন, ২৪, ১৯৪৩), 'ইউনিভার্সালিটি এন্ড ইনডিভিজুয়ালিটি ইন এথিক্স', *দি জার্নাল অব ফিলোজফি,* ভলিউম-৪০, নং-১৩, পৃ ৩৪৮-৩৫৬

৮। গ্যালপ, ডেভিড, (এপ্রিল, ১৯৯৯), 'জেন অস্টিন এন্ড দি এ্যারিস্টটলীয়ান এথিক্স', *ফিলোজফি এন্ড লিটারেচার* ভলিউম-২৩, নং-১, পৃ ৯৬-১০৯

৯। দাস, রাসবিহারী, (১৯৯৫), কান্টের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা

১০। নুসবাম, মার্থা. সি, (১৯৮৬), *দ্য ফ্রাজাইলিটি অব গুডনেসঃ লাক এন্ড এথিক্স ইন গ্রীক ট্রাজেডি এন্ড ফিলজফি,* কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ

১১। ফুট, ফিলিপা, (১৯৯৭), 'ভারচুস এ্যান্ড ভাইসেস', *ভারচু এথিক্স,* ক্রিস্প, রজার এবং স্লট, মাইকেল সম্পাদিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১২। বস্টক, ডেভিড, (২০০০), *এ্যারিস্টটল'স এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৩। মিল, জন, স্টুয়ার্ট, (১৯৭৯), *ইউটিলিটিরিয়ানিজম,* শের, জর্জ সম্পাদিত, ইন্ডিয়ানাপোলিসঃ হ্যাকেট পাবলিশিং কোম্পানী

১৪। ম্যাকিনটায়ার, এ্যালেসডায়ার, (১৯৯৭), 'দি নেচার অব দি ভারচুস', রজার ক্রিস্প এবং স্লট, মাইকেল সম্পাদিত, *ভারচু এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৫। রলস, জন, (১৯৯৯), *এ থিয়োরী অব জাস্টিস,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৬। র‍্যাচেলস, জেমস, (১৯৯৮), 'দি এথিক্স অব ভারচু', চান, স্টিভেন, এস এবং মার্কি পিটার সম্পাদিত, *এথিক্স, হিস্ট্রি, থিওরী এন্ড কনটেম্পোরারী ইস্যুস,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৭। শ্লিক, মরিৎ, (১৯৩৯), *প্রবলেম অব এথিক্স,* ডোভার পাবলিকেশন্স, নিউ ইয়র্ক

১৮। সিজউইক, হেনরী, (১৯৬৭), *আউটলাইনস অব দি হিস্ট্রি অব এথিক্স,* ম্যাকমিলান সেন্ট মার্টিনস প্রেস, নিউ ইয়র্ক

১৯। হার্স্টহাউস, রোসালিন্ড, (২০০৪), 'নরমাটিভ ভারচু এথিক্স', জনসন, অলিভার. এ এবং রেইথ, এ্যান্ড্রিস সম্পাদিত, *এথিক্স, সিলেকশন্স ফ্রম ক্যালিক্যাল এন্ড কনটেম্পোরারী রাইটার্স,* নাইন্থ এডিশন, থমসন, ওয়াডসওয়ার্থ, কানাডা

২০। হেমিংওয়ে, আর্নেষ্ট, (২০০৩), *ডেথ ইন দি আফটারনুন,* চার্লস স্ক্রিবনার'স সন্স, নিউ ইয়র্ক

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক কর্ম ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়

আদর্শ অনুসারে যখন আমরা কোন কর্মকে নির্ধারণ করি তখন আমরা ঐ কর্ম পালনের জন্য কোনরূপ বাধ্যতাবোধ অনুভব করি কি? যে সকল দার্শনিক নীতি অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাকেই আদর্শ বলে মনে করেন, তাঁরা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধ্যতাবোধের উপস্থিতি অনিবার্য বলেই মনে করেন। কারণ আদর্শ বলতে তাঁদের নিকট একটি বুদ্ধিপ্রসূত সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম—যা ব্যক্তিকে কর্তব্যকর্ম পালনে বাধ্য করে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি পরবর্তীকালের নীতিদার্শনিকেরা, যাঁরা আচরণের উৎস যে চরিত্র সেই চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আচরণের শুদ্ধতা নির্ধারণ করতে আগ্রহী, তাঁরা কেবলমাত্র বুদ্ধির ব্যবহারই আদর্শ নির্ণয়ের জন্য কাম্য—এমন কথা স্বীকার করেন নি। এই দার্শনিকেরা ব্যক্তির নিজস্বতা, পছন্দ, প্রবণতা, আবেগের প্রতিফলনকে আদর্শ নির্ধারণে গুরুত্ব দিলেন। তবে একথাও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন আদর্শ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যক বলে তাঁরা মনে করলেও আদর্শটিকে তাঁরা ব্যক্তিগত বলেননি। এই মতানুসারে আদর্শ সমাজসাপেক্ষ, অর্থাৎ সামাজিক ঐতিহ্য, সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি আদর্শটিকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলে। সুতরাং লক্ষ্য করা গেল, আদর্শের উৎস যাই হোক না কেন, আদর্শ সর্বজনপ্রযোজ্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই একমত। সর্বকালে, সর্বদেশে একই আদর্শ অনুসৃত হওয়ার বিষয়ে দ্বিতীয়দল দার্শনিকদের আপত্তি থাকলেও তাঁরা অন্তত এমন দাবি করেন না যে, আদর্শ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি এ্যালেসডায়ার ম্যাকিনটায়ার[১] আদর্শের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রতিফলনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আদর্শকে আমরা সমরূপ বলে স্বীকৃতি দিলেও কর্ম পালনের ক্ষেত্রে যখন আমরা ঐ আদর্শটিকে ব্যবহার করি তখন সেক্ষেত্রে, অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিসাপেক্ষতা না ব্যক্তিনিরপেক্ষতা—কোনটি আমাদের নৈতিক কর্ম সম্পাদনের মানদণ্ডরূপে গ্রাহ্য হবে সে বিষয়েও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি কি নিজের পরিস্থিতি অনুসারে, তার সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনা করে, তার আগ্রহ, ইচ্ছা ইত্যাদিকে মূল্য দিয়ে কোন আদর্শটি পরিস্থিতিসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় তা নির্ধারণ করবে? নাকি প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আদর্শের ব্যবহার সমরূপ হবে? অর্থাৎ নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজস্ব ইচ্ছা, আগ্রহ, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র আদর্শের জন্যই কর্মটিকে সম্পাদন করবে? এই অধ্যায়ে আমি এই বিষয়টিই আলোচনা করবো। অর্থাৎ ব্যক্তির কর্ম ব্যক্তিসাপেক্ষতা বর্জিত হবে, না

ব্যক্তিনিরপেক্ষ হবে; কেবলমাত্র বুদ্ধি প্রয়োগে সর্বজনীনভাবে সকলে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, না ব্যক্তিবিশেষের পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে কর্মের সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন হবে? ব্যক্তি কি কেবলই নীতির দাসত্ব স্বীকার করে নিরপেক্ষভাবে কর্মটি পালন করে, না ব্যক্তির সিদ্ধান্তেও ব্যক্তিসাপেক্ষতা উপস্থিত থাকবে? পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পরস্পরবিরোধী দুটি চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়—একদল নীতিদার্শনিক নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন। ইমানুয়েল কান্ট, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখেরা দাবি করেন, নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুভূতি, আবেগ এবং পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বুদ্ধিকে অনুসরণ করতে হবে। এই নীতিদার্শনিকগণ নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষতাকেই গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক। অপরদল, বিশেষত সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকগণ, যেমন এলিজাবেথ এনস্কোম্ব, এ্যালেসডায়ার ম্যাকিনটায়ার, ফিলিপা ফুট প্রমুখেরা নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে, অর্থাৎ ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতায় বিশ্বাসী দার্শনিকদের কথা আলোচনা করেছি এবং তারই বিপরীত মতবাদরূপে ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে যাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের মত আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অংশে।

নৈতিক কর্ম এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা

যেসকল দার্শনিক নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিরপেক্ষার ধারণায় বিশ্বাসী তাঁরা নীতির অনুশাসনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, কোন একটি কর্ম পালনের সমর্থনে যদি একটি সুনির্দিষ্ট নীতি উপস্থিত থাকে তবে ঐ কর্মটিকে পালন করতে আমরা বাধ্য থাকি। তাঁরা মনে করেছেন, নীতি আমাদের আদর্শকে ব্যক্ত করে এবং আদর্শের প্রতি, অর্থাৎ নীতির প্রতি অবধারিতভাবে বাধ্যতাবোধ উপলব্ধি করাই নৈতিক ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। বাধ্যতাবোধের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা সমসাময়িককালের দার্শনিকদের মতবাদে এবং গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের দর্শনেও বাধ্যতাবোধের কোন উল্লেখ লক্ষ্য করি না। কিন্তু রেনেসাঁ পরবর্তীযুগে প্রচলিত প্রধান নীতিতত্ত্বগুলিতে নীতির

প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এই সকল নীতিতত্ত্বগুলিতে নীতির ধারণার সাথেই বাধ্যতাবোধের ধারণাটি সংযুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং নৈতিক বাধ্যতাবোধের স্বরূপটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যায় আমরা সামাজিকজীবরূপে বাধ্যতাবোধের দ্বারা বহু কর্ম সম্পাদন করি। যেমন, রাষ্ট্রের আইন পালন করতে বাধ্য থাকি, কোনও কোনও সামাজিক প্রথা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকি। রাষ্ট্রীয় নিয়মগুলিকে মান্য করি, কারণ আমরা জানি যে, এই নিয়মগুলি লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র আমাদের শাস্তি প্রদান করবে। সামাজিক নিয়মগুলিকে আমরা পালন করি লোকলজ্জা, নিন্দার ভয়ে। তাছাড়া আমরা জানি যে, এই নিয়মগুলি অনুসরণ করলে সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খলভাবে অতিবাহিত করা সম্ভব হবে। ফলে এই সকল নিয়ম পালন করাকে আমাদের কর্তব্য বলে গণ্য করি। সামাজিক অনুশাসন বা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে মান্য করার পশ্চাতে যে বাধ্যতাবোধ অনুভূত হয় তা বাহ্যিক শক্তির প্রেরণায়। আবার এমন অনেক ক্রিয়া আছে যেগুলিকে ভালো-মন্দ কিছুই বলা যায় না, সেগুলিকে ন-নৈতিক ক্রিয়া বলা হয়, যেমন, স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া (Spontaneous action) , প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex-action)। এগুলিকে ভালো-মন্দ ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। কেননা এগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়াগুলি পালন করতে আমরা বাধ্য থাকি। আবার শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা, তীব্র আলোকে চোখের পাতা বন্ধ করা, গরম পাত্রে হাত দেওয়া মাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি ন-নৈতিক হলেও এই ক্রিয়াগুলি পালন করতে আমরা বাধ্য থাকি। কতগুলি শারিরীক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় আমরা এই জাতীয় কর্মগুলি পালনে বাধ্য থাকি। এখানে কিন্তু মানসিক বাধ্যতাবোধের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু নৈতিকতার বিষয় হল ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্ম। নৈতিক কর্মগুলি ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্ম হওয়ায় ব্যক্তির ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ ইচ্ছা যদি ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে তবে নৈতিক কর্ম তার চরিত্র চ্যুত হতে পারে। তাই অনেক দার্শনিকই মনে করেন, নৈতিক কর্মগুলি পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনে একটি বাধ্যতাবোধ অনুভূত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই নীতিনিষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে, ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্ম নৈতিক কর্মরূপে তখনই গ্রাহ্য হবে যদি তা কর্তব্যকর্ম হয়। কর্তব্য সম্পাদনকালে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে যে ব্যক্তি চালিত হবেন সেই ব্যক্তি নীতিবান বলে গণ্য হবেন। কেননা তাঁর মতে, সম্পাদিত কর্মের ফলাফল দ্বারা কর্মের নৈতিক বিচার করা যায় না। যেমন, দরিদ্র লোকালয়ে চিকিৎসালয় স্থাপন করা নিঃসন্দেহে একটি সৎ কর্ম। কিন্তু শুধুমাত্র এই বাহ্যিক কর্ম দেখে ব্যক্তির নৈতিক গুণ নির্ণয় করা যায় না। যদি কোন ব্যক্তি সুখ্যাতি অর্জনের জন্য, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতে চায়, তাহলে তাঁর কর্ম প্রশংসনীয় হলেও সে কর্মের কোন

নৈতিক মূল্য নেই। ব্যক্তি যদি কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কর্মটি সম্পাদন করে তাহলেই তাঁর ঐরূপ কর্ম নৈতিক কর্ম বলে গণ্য হবে। কিন্তু ব্যক্তি অনেক সময়ই কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত না হয়ে, কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত না হয়ে, প্রবৃত্তি, কামনা, লোভ , প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য সৎকর্মে ব্রতী হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মটি বাহ্যিক অর্থে মূল্যবান বা সৎ হলেও, কর্মের অনুপ্রেরণা বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধ থেকে নিঃসৃত হয় না। তাই কান্টের মতে, এ সমস্ত কর্মের কোন নৈতিক মূল্য থাকতে পারে না। কান্টের মতে, ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তি যখন প্রবৃত্তি, লোভ , সুখ , কামনা ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কর্তব্যবোধ দ্বারা এবং যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তি সদিচ্ছা বলে পরিগণিত হয়। সুতরাং কান্টের মতে, কোন কর্মের নৈতিক মূল্য থাকতে হলে কর্মটি শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে কোন ব্যক্তি বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার কারণে যদি তাকে সাহায্য করে তবে সেটিই কর্তব্যকর্ম বলে বিবেচিত হবে না।

কান্ট বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে মানুষই প্রকৃতি জগতের একমাত্র জীব যে নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের মধ্যে বুদ্ধি নামক যে বৃত্তিটি রয়েছে তার প্রধান কাজ হল ইচ্ছাবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তিকে বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার অর্থই হল কোন আকারগত নীতি বা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তি বুদ্ধিপ্রসূত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেই তা বিশ্বজনীন আইনে পর্যবসিত করা সম্ভব হবে । কেননা কান্টের নৈতিকতার উদ্দেশ্যই হল আবশ্যকতা ও সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করা। সকল ব্যক্তিই আবশ্যিকভাবে বুদ্ধিপ্রসূত আইনকে প্রয়োগ করে নৈতিকতায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। নৈতিকতায় সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কান্ট বলেন, ব্যক্তি যে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে তার পশ্চাতে উপস্থিত নীতি কখনই ব্যক্তিভিত্তিক নীতি নয়। ব্যক্তিভিত্তিক নীতিতে ব্যক্তির কামনা বাসনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নৈতিকতায় ব্যক্তিসাপেক্ষ কামনা বাসনাকে গুরুত্ব দেওয়া হলে নৈতিকতা ব্যক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করবে। অপরদিকে যে নীতি বস্তুগত, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ইচ্ছার প্রভাবমুক্ত সেই নীতি দ্বারা আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা'— এটি বস্তুভিত্তিক কর্মনীতি। কেননা এ জাতীয় কর্মনীতি সম্পর্কে সকল ব্যক্তিই সচেতন। সুতরাং নৈতিক ক্ষেত্রে বস্তুগত কর্মনীতির দ্বারা চালিত হয়ে নৈতিক কর্ম সম্পাদনই যথার্থ নৈতিক কর্ম বলে বিবেচিত হয়। ব্যক্তি শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীব হলে অথবা যুক্তিহীন প্রবৃত্তিসর্বস্ব জীব হলে ব্যক্তির জীবনে ব্যক্তিভিত্তিক ও বস্তুগত নীতির সংঘাত সম্ভব ছিল না। যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ইচ্ছা যেহেতু

সর্বদা যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাই ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তিকে যুক্তির পথে অর্থাৎ বস্তুভিত্তিক আইনের পথে নিয়ন্ত্রণের নামই নৈতিক বাধ্যতাবোধ। অন্যভাবে বলা যায়, নৈতিক অনুভূতি আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকলেও আমরা অনেক সময় প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে থাকি। যে কর্মটি সম্পাদন করলে আমার মনে সুখ উৎপন্ন হবে সেই কর্মটিকে ভাল বলে মনে করি। কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা, আবেগ, অনুভূতি ও আগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া হলে নৈতিক বিষয় ব্যক্তিসাপেক্ষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বুদ্ধি আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই আমাদের নৈতিক জীবন থেকে কামনা বাসনা এবং আত্মস্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হবে। কামনা বাসনাকে নৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কামনা বাসনা অনুসারে যদি কর্ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তবে আমাদের কর্মগুলি কাঙ্ক্ষিত ফললাভে সক্ষম হলেও ন্যায়সঙ্গত বলে গণ্য হয় না। আত্মসুখ পরিতৃপ্তির জন্য কর্মপালনকে নৈতিক বলে অধিকাংশ দার্শনিকই স্বীকৃতি দেবেন না। ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়ের দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে নৈতিক কর্মটি পালনে আগ্রহী হবে না। ফলে নৈতিক কর্মের বৈধতা লঙ্ঘিত হবে। এ কারণে কান্ট নৈতিক ক্ষেত্রে যে সর্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তা ব্যহত হবে। ব্যক্তি তার পছন্দের ব্যক্তির জন্য যথোচিত কর্মটি সম্পাদন করলেও অপরিচিত বা অপছন্দের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্পাদন করবে না। ফলস্বরূপ নৈতিকতার যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ পক্ষপাতহীনতা তা বিঘ্নিত হবে। সেই কারণে ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভূতির জন্য নয়, নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তিনিরপেক্ষ আইনের প্রতি বাধ্যতাবোধই স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতির প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছাকে চালিত করার নামই বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছাবৃত্তি যখন নিজে সম্পূর্ণভাবে সৎ হয় না, অর্থাৎ ইচ্ছাবৃত্তি যখন স্বেচ্ছায় ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক থাকে না তখন এ ধরণের ইচ্ছাবৃত্তিকে নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার নামই বাধ্যবাধকতা। কান্টের নৈতিকতার উদ্দেশ্য যেহেতু সার্বিকতা প্রতিষ্ঠা করা, সেহেতু তিনি নৈতিক ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার ধারণাকে দৃঢ় অর্থে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী। কান্টের মতে, ‘ Everyone must admit that a law has to carry with it absolute necessity if it is to be valid morality—valid, that is, as a ground of obligation.’[২] নৈতিক বাধ্যতাবোধ নৈতিক চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে তা প্রত্যেক নৈতিক জীবের একটি স্থায়ী ও অপরিহার্য মনোবৃত্তি, কোন নৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই কান্টের মতে, নৈতিক বাধ্যতাবোধে কর্তব্য কর্মই হলো নৈতিক কর্ম। ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হওয়ায় ব্যক্তির বুদ্ধিপ্রসূত নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধে কর্মই নৈতিক কর্মরূপে বিবেচিত হবে। ব্যক্তির বুদ্ধিই বিধি

বা নীতির প্রণেতা। যে বিধি সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় তা আইন বা বিধানরূপে বিবেচ্য হবে। এই আইন কখনই কোন ঈশ্বরনির্দিষ্ট বা সমাজ স্বীকৃত আইন বা বিধি নয়। এই আইন ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ নৈতিক বিধি বা আইন, এই আইন শর্তনিরপেক্ষ আদেশ। এই আইনের অনুসরণ করা বা আইনকে অপরিহার্য বলে অনুসরণ করাই হল নৈতিক বাধ্যতাবোধ।

সপ্তদশ শতকে ইমানুয়েল কান্ট নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার ধারণাকে দৃঢ় অর্থে প্রতিষ্টিত করলেও বাধ্যবাধকতার ধারণার মূল প্রোথিত আছে মধ্যযুগে। সেযুগে নৈতিক বিশ্বাস ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে নৈতিক কর্ম বলতে সেগুলিকেই বোঝাত যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা আদিষ্ট হতো। ঈশ্বর সর্বময়কর্তা হওয়ায় ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যবশত তাঁর আদেশ অনুসারে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে বাধ্য থাকত। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্যবোধ, আস্থাই হল ঈশ্বরের আদেশ বা নৈতিক আইন অনুসরণের আবশ্যক শর্ত। এই আইনকে অনুসরণ করে ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে, তবেই ব্যক্তির নৈতিক কর্মকে ন্যায়কর্মরূপে বিবেচনা করা হবে। কারণ ঈশ্বরের আদেশ পালনকেই মধ্যযুগের দার্শনিকেরা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষরূপে খ্রীষ্টান যুগে দেখা যায় ঈশ্বরের আদেশ পালনকে নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে মুখ্যরূপে গণ্য করা হতো। ঈশ্বরই ছিলেন নৈতিকতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাঁর আদেশ প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণীয় বলে গণ্য করা হতো। এখান থেকেই জন্ম নেয় নৈতিক ক্ষেত্রে আবশ্যকতার ধারণা, বাধ্যতাবোধের ধারণা। ব্যক্তি নৈতিক কর্ম পালন করতে বাধ্য, কারণ ঈশ্বর নামক উর্দ্ধতনের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য আছে। কেননা চরমমঙ্গল বা ন্যায়কে অর্জন করার জন্য ঈশ্বরের করুণা লাভ প্রয়োজন। তাই ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যবোধে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে বাধ্য থাকবেন। ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান হওয়ার কারণে অন্য সকল আদেশ ঈশ্বরের আদেশ অপেক্ষা তুচ্ছ বলে মনে করা হতো। ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে ধর্মযাজকেরা প্রচার করতেন যে, সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করবে—ঈশ্বরই এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের নিকট সকল ব্যক্তি অতিশয় প্রিয় এবং তাঁর নির্দেশে নৈতিক জীবন অতিবাহিত করার অর্থ জীবনের চরম মঙ্গলময়তাকে অর্জন করা । ঈশ্বরকে অমান্য করার অর্থ জীবনে চরম অমঙ্গলময়তাকে আহ্বান করা। সুতরাং বিনা বিচারে ঈশ্বর স্বীকৃতির মধ্যেই পরম পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা আনুগত্য প্রকাশই ব্যক্তিকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করে। প্যালির[৩] মতে, ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করা হল নীতিসম্মত কর্ম। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে মানুষ যদি কর্ম করে, সেই কর্মই হবে নীতিসঙ্গত। ঈশ্বর পরম শক্তিমান , তিনি ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন।

দেকার্ত ও লকও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে থাকেন। এঁদের মতে, ঈশ্বর মানুষের জন্য কতগুলি বিধিনিষেধ প্রবর্তন করেছেন, এগুলিই নৈতিক নিয়ম। এই মত অনুসারে কোন কর্ম যথোচিত, যেহেতু সেই কর্ম ঈশ্বরের বিধান। উচিত ও অনুচিত কর্ম বলেই যে সেই কর্মটি ঈশ্বরের বিধান তা নয়, বরং ঈশ্বরের বিধান বলেই কর্মটি যথোচিত। বলা যায়, নৈতিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য হলো পূর্বস্বীকৃতি। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতিকে বর্জন করে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পনের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা বা পছন্দকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে নৈতিকতার গণ্ডী থেকে।

উপরোক্ত মতের বিরোধিতায় বলা যায়, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য থাকার পুরষ্কারস্বরূপ মঙ্গলময় জীবন লাভ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পাদিত কর্মের কোন নৈতিক উৎকর্ষতা থাকে না। আবার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে অস্বীকার করতে পারেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে পারেন। নাস্তিকের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বই গ্রহণীয় নয়। ফলে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য করার অর্থ হলো ব্যক্তির মনে ভীতির সঞ্চার করে বলপূর্বক ঈশ্বরাদেশ অনুসরণ করতে বাধ্য করা। ফলে সে কর্ম ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত ইচ্ছাবৃত্তির কর্ম হতে পারে না। আবার স্বেচ্ছাকৃত কর্ম না হওয়ায় ঈশ্বরের প্রত্যাদেশকে আইনরূপে গণ্য করার বিষয়টি নৈতিকতায় গ্রাহ্য হতে পারে না। কারণ নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অবশ্যস্বীকার্য শর্ত বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিকে বলপূর্বক কোনকিছু স্বীকার করতে বাধ্য করার অর্থ হলো ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাকে প্রতিহত করা—যা নৈতিকতার বিরোধী বলে মনে করা হয়। তাছাড়া রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে মানুষ নিজের বুদ্ধির প্রতি আস্থাশীল হয়। ফলে নৈতিকতায় যে বিধিগুলি স্বীকৃত হয় সেগুলি আর ঈশ্বরপ্রদত্ত নীতি নয়, যুক্তি বা বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত নীতি বলেই স্বীকৃত হয়। কান্টের মতে, যাঁরা বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্মই নৈতিক কর্ম অথবা পূর্ণতা (Perfection) লাভই নৈতিক কর্মের লক্ষ্য সেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হয় না। আমরা পরতন্ত্রী (Heteronomous) হয়ে পড়ি। আমাদের প্রজ্ঞার দেওয়া নিয়মই হল আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক। ফলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চাওয়ার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে কর্ম সম্পাদন করা। সেক্ষেত্রে আমরা পরতন্ত্র হতে বাধ্য থাকবো। তাছাড়া কান্টের মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চাওয়ার কারণ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূল ইচ্ছা আমাকে দুঃখ দেবে এবং অনুকূল ইচ্ছা প্রকাশে পুরস্কার লাভ হবে। পূর্ণতালাভের জন্য যদি নৈতিককর্ম করতে বলা হয় তাহলে কান্টের মতে, প্রথমে প্রকৃত পূর্ণতার স্বরূপ কি বা কিসে পূর্ণতা পাওয়া যায় তা নির্ণয় করতে হয়। কান্টের মতে, "এইসব মত ধীরভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের নৈতিক ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যের বিসর্জন

দিতে হয়; কেননা সব মতেই নৈতিকতার মূল বীজ আমাদের নিজের মধ্যে ইচ্ছাতে বা প্রজ্ঞাতে, না রাখিয়া অন্যত্র রাখা হইয়াছে। সে অন্যত্র সুখই বল, ঈশ্বর ইচ্ছাই বল বা পূর্ণতাই বল, তাহার 'পর'ত্ব থাকিয়াই যায়। এগুলি যে আমাদের নিজ নয়, প্রজ্ঞা বা আত্মা নয়,তাহা ত তাহাদের নামেই ব্যক্ত হইতেছে। নৈতিক ব্যাপারে আমাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞাকে যদি এগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে পরতন্ত্র (Heteronomous) হইতে হয়।"[৪]

যখন ব্যক্তির ইচ্ছা কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং সর্বজনীন নৈতিকসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে একথা বলা যায়। অর্থাৎ কান্ট নৈতিকতাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ বলেছেন। ব্যক্তিনিষ্ঠ কারণ, ব্যক্তিগত নীতি তৈরী করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা বর্তমান। কান্টের মতে, সমস্ত নৈতিক কর্মের মূলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা (autonomy) আছে।[৫] অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার জন্য ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে পারে। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বুদ্ধি দ্বারা নীতি তৈরী করে এবং স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত নীতিটিকে সর্বজনীন নীতিতে পরিণত করে। ফলে ব্যক্তিনিষ্ঠ নৈতিকতা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ব্যক্তি নীতি প্রণয়নের জন্য স্বাধীন হলেও ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ ,আবেগ এগুলি গুরুত্ব লাভ করে না। বলা ভালো এগুলি ব্যবহারে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি যেহেতু নিজেরাই বুদ্ধির আলোকে কর্মের ভাল মন্দ বিচার করে তাই নৈতিকতাকে কান্ট ব্যক্তিনিষ্ঠ বলেছেন। আবার একইসঙ্গে নৈতিকতা সর্বজনীন, ব্যক্তিনিরপেক্ষ, কারণ নৈতিক কর্মকর্তা হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম পালনে বাধ্য। বাধ্যতাবোধের ধারণাকে স্বীকার করলে তবেই নৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। কেননা বুদ্ধিপ্রসূত নীতি প্রয়োগ করে কর্ম পালন করা সার্বিকভাবে বাধ্যতামূলক হলে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বুদ্ধিপ্রসূত নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধে কর্ম সম্পাদনকেই নৈতিক কর্ম বলে গ্রাহ্য করা হবে। দেখা যাচ্ছে, বাধ্যতাবোধের বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে। ঈশ্বর স্বীকৃতির পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত বিধি বা নিয়ম গুরুত্ব লাভ করছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, কান্টের দর্শনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষরূপে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নৈতিক ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হলেও বাধ্যতাবোধের প্রসঙ্গটি সমানভাবেই উপস্থিত রয়েছে। ঈশ্বরের পরিবর্তে বুদ্ধির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের আদেশ অর্থহীন হয়ে যায়। ঈশ্বরের আদেশের স্থান গ্রহণ করে বুদ্ধিপ্রসূত নীতি যা সর্বজনীন নীতিরূপে অবশ্য পালনীয় আইনে পর্যবসিত হয়। কিন্তু বাধ্যতাবোধের ধারণাটি মধ্যযুগে যেমন নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল, একইভাবে রেনেসাঁ পরবর্তীযুগে কান্টের দর্শনে

সমান গুরুত্ব লাভ করল। মধ্যযুগে ঈশ্বরের অনুশাসন অনুসরণ বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কান্ট বুদ্ধি নিঃসৃত নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধের ধারণাটিকে নৈতিক ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে ব্যাখ্যা করেন।

কান্ট বিশ্বাস করেন, নৈতিক বিধি শুধুমাত্র আকারসর্বস্ব আদর্শই নয়, এগুলি আচরণ নিয়ন্ত্রক বলে তা regulative. এই নৈতিক বিধিগুলিকে অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করা যৌক্তিকভাবে সম্ভবপর। বুদ্ধির নীতি অনুসারে সকল ব্যক্তি নৈতিকভাবে তা অনুসরণ করবে। ফলে নীতিগুলি যৌক্তিকভাবেও অনুসরণীয়। আবার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করার জন্যই তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। ফলে নৈতিক বিধির যেমন যৌক্তিক সম্ভাবনা বর্তমান, তেমনই ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা বর্তমান। সেই কারণেই নৈতিকবিধিগুলি আমাদের নিকট আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। নৈতিক বিধি অনুসরণ করে কর্ম পালন করাই নৈতিক কর্তার কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। কান্ট তাই মনে করেন, যদি কোন কর্ম বুদ্ধিনিঃসৃত সর্বোচ্চ নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে সেটি পালন করার ক্ষেত্রে কোন বাধা উপস্থিত হতে পারে না। তিনি মনে করেন, যা কিছু আমাদের কর্তব্য তা অবশ্যই পালন করা সম্ভব। তাঁর এরূপ যুক্তি কর্তব্য কর্ম পালন না করার সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে। ফলে বাধ্যতাবোধ স্বাভাবিকভাবেই কর্তব্য কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তাই নৈতিক বাধ্যতাবোধের দ্বারা চালিত হলে কর্ম পালনের ক্ষেত্রে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। একাধিক বিকল্পগুলির মধ্যে বুদ্ধি অনুযায়ী একটি কর্মকেই আমি নৈতিক কর্তব্য বলে নির্ধারণ করায় সেটি পালন করতে বাধ্য থাকি। তাই নৈতিকবাধ্যতাবোধ থেকে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে ঐ কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য থাকে। কোন কর্মটি কি কারণে কর্তব্য বলে গণ্য হবে সে বিষয়ে দ্বন্দ্ব থাকা সম্ভব হলেও দুটি কর্তব্যকর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে না। যেহেতু কর্তব্যকর্ম নির্ণয়ে বুদ্ধিই একমাত্র সহায়ক তাই বুদ্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়ে কোনরূপ সংশয় থাকা সম্ভব নয়। কান্টের মতে, "..duty and obligation in general are concepts that express the practical necessity of certain actions and since two opposing rules cannot be necessary at a time, then if it is a duty to act according to one of them, it is not a duty but contrary to duty to act according to the other. It therefore follows that a conflict of duties and obligations is inconceivable."[৬] ফলে নৈতিকবাধ্যতাবোধ থেকে অনিবার্যভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদিত হবে। এর ব্যতিক্রম নৈতিকতায় স্বীকৃত নয়। সাধারণ বাধ্যতাবোধের সঙ্গে নৈতিক বাধ্যতাবোধের পার্থক্য এখানেই। বাস্তবে প্রত্যহ আমরা অনেক সময় বাধ্যতাবোধে কর্ম সম্পাদন করি। যেমন, আমার যদি

হাওড়া স্টেশন থেকে বিকেল ৫টার সময় ট্রেন ধরার থাকে তবে ঐ ট্রেন ধরার প্রতি বাধ্যতাবোধে আমি বাড়ী থেকে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রওনা হবো। আবার সাধারণভাবে আমি আমার অসুস্থ পিতা-মাতার সেবা করার জন্য বাধ্য থাকি। এগুলি সাধারণ বাধ্যতাবোধে কর্ম করার উদাহরণ। কিন্তু নৈতিক বাধ্যতাবোধ এমন একটি প্রত্যয় যা কর্ম পালনের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে সম্পৃক্ত থাকে। এমন নয় যে আমি কোনও কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্যতাবোধ অনুভব করলাম, কিন্তু তা সম্পাদন করতে অসমর্থ হলাম। এক্ষেত্রে আমি যা কর্তব্য বলে নির্ণয় করি তা সকলের নিকটই কর্তব্য বলে গণ্য হবে এবং তা পালন করার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। নৈতিক বাধ্যতাবোধ হল এক বিশেষ ধরণের বাধ্যতাবোধ, যা নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রেই কেবল যুক্ত থাকে। নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকগণ মনে করেন প্রতিটি ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য বাধ্য থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, আবেগ—কোনভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন নয় যে, ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট নৈতিক মতের সমর্থক হলে, নীতিগুলিকে স্বীকার করলে বা বাধ্যতাবোধ অনুভব করলে তবেই নৈতিক কর্ম পালন করবে। বিপরীতপক্ষে বলা যায়, নৈতিক বাধ্যতাবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির বিষয় নয়। যেহেতু নীতিটি বুদ্ধি নির্ধারিত তাই ঐ নীতি দ্বারা নির্দিষ্ট কর্মটিও যুক্তিসঙ্গত। ব্যক্তি তার ব্যক্তিসাপেক্ষতা উপেক্ষা করেই ঐ কর্ম পালনে বাধ্য থাকবে। কেননা নৈতিক বিধি আমাদের বুদ্ধিতে আশ্রিত।

কান্টের মতে, কর্মের নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ফলাফল বা পরিণামের পরিবর্তে উদ্দেশ্যকেই বিচার করা উচিত। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কান্ট উদ্দেশ্যটির প্রকৃতি বিচারের সময় কেবলমাত্র সেটির সাথে নৈতিক বিধির সামঞ্জস্য বিধানের কথাই বলেননি। বাধ্যতাবোধের ধারণাটি সেক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি মনে করেছেন। ব্যক্তির উদ্দেশ্যই হবে ঐ নীতির প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে ঐ নীতি অনুসরণে বাধ্য থাকা। যদি ব্যক্তিগত বাসনার পরিতৃপ্তি কর্মের উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোন কর্ম নৈতিক বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও তার নৈতিক মূল্য থাকবে না। কিন্তু নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেই বিধিকে অনুসরণ করা যদি ব্যক্তিকর্তার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই কর্মকে অবশ্যই নৈতিক বলা হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অথবা প্রিয়জনের প্রতি প্রীতিবশত কোন কর্ম না করে যখন কেবলমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যই আমরা কর্তব্য পালন করি তখন আমাদের কর্ম নৈতিকমূল্য অর্জন করে। কান্টের কর্তব্যমুখী নীতিবিদ্যায় এইভাবে উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধ অনুভব করলেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ বলা যাবে। কর্তব্য পালনই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে কর্মটি যথোচিত হবে, নতুবা কর্মটি অযথোচিত হবে। আমাদের আচরণ যদি প্রত্যক্ষভাবে বা

পরোক্ষভাবে কামনার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সেই আচরণ কর্তব্য কর্মের সমরূপ হলেও কান্ট মনে করেন, তাকে নৈতিক আচরণ বলা যাবে না। কারণ সেখানে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা বা দায়বদ্ধতার কারণে ব্যক্তি ঐ নীতিটি অনুসরণ করছে না। যে আচরণ সাক্ষাৎভাবে কোন কামনাসিদ্ধ করার জন্য করা হয় এবং সেটি যদি নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তাকে ন-নৈতিক কর্ম বলা হয়। ফলে ব্যক্তিগত কামনা বাসনা নয়, নৈতিকতার ভিত্তি হল ব্যক্তির বুদ্ধি। কেননা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হওয়ায় আমরা সকলে বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে নিজেদের নৈতিক কর্মপন্থা নির্ণয় করতে পারি। কান্ট একেই বলেছেন বুদ্ধির স্বাধীনতা।

বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় সর্বজনীন ও অপরিহার্য হলেও এটি প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে পৃথক। প্রাকৃতিক নিয়মে যা ঘটে বলে ধরা হয়, বাস্তবে তা অবশ্যই ঘটে থাকে। কিন্তু নৈতিক নিয়মে যা ঘটা উচিত বলে ধরা হয়, তা যে সবসময় ঘটবেই তা হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে জল সর্বদা নীচের দিকে প্রবাহিত হয়-এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু দরিদ্রকে সাহায্য করা উচিত হলেও সব সময় প্রত্যকে দরিদ্রকে সাহায্য করে—এমন নয়। তবুও নৈতিক নিয়মকে সর্বজনীন বলা হয় এই কারণে যে, নৈতিক নিয়মে যা করণীয় বলে ধরা হয়, তা সবসময় সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলেও আমাদের বুদ্ধির কাছে ঐ কর্মের ঔচিত্যবোধ কখনও অস্বীকৃত হতে পারে না। ব্যক্তি তার নৈতিক দূর্বলতাবশত ঐ কর্ম সম্পাদন করতে ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু কর্মটি পালন করার সামর্থ্য না থাকায় কর্মটির ন্যায্যতা ক্ষুণ্ন হয় না। ফলে নৈতিক নিয়ম সর্বজনীন ও আবশ্যিক। আবার আমরা এমন অনেক নিয়ম নিজেরা প্রণয়ন করতে পারি, যা শুধু আমাদের নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে। এই নিয়ম আমরা পালন করতে বাধ্য থাকলেও অন্যরাও এই একই নিয়ম পালন করবে এরূপ আশা আমাদের মনে থাকে না। যেমন, কেউ অপমান বা ক্ষতি করলে আমি তার প্রতিশোধ নেবো, অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে টাকা ধার দেবো না—এমন ব্যক্তিগত নিয়ম প্রণয়ন করতে পারি। কিন্তু এরূপ নিয়ম সকলেই যে অনুসরণ করবে এমন না হতে পারে। তাই সেই নিয়মই নৈতিক নিয়ম যে নিয়ম সকল ব্যক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবে। নৈতিক নিয়ম পরিস্থিতি অনুসারে প্রযোজ্য নয় বলে ‘যদি-তবে’-এমনভাবে প্রকাশ করা হয় না। অর্থাৎ ‘সত্য কথা বলা উচিত’—এটি নৈতিক নিয়ম। কেননা সকল ব্যক্তি এই নিয়মকে অনুসরণ করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। এই নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে এমন বলা হয় না যে, যদি তুমি ‘ক’ উদ্দেশ্য লাভ করতে আগ্রহী হও, তবে তুমি সত্য কথা বলবে। এমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয় না। ব্যক্তিগত নিয়মও নিয়ম। কেননা এই নিয়মের দ্বারা আমাদের ইচ্ছা পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু এই নিয়মে আমরা সাধারণত ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে

থাকি। এই নিয়মের মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা থাকলেও সর্বজনীনতা অনুপস্থিত থাকে। আবার এই নিয়ম মানতে আমি যে বাধ্য থাকবই এমন কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ আমার উচিত-এটি আমার ব্যক্তিগত নিয়ম হতে পারে। কিন্তু এই নিয়ম আমাকে যে পালন করতেই হবে, না পালন করলে নৈতিকদৃষ্টিতে মন্দব্যক্তি বলে বিবেচিত হবো—এমন নয়। আবার এ কথাও বলা যায় না যে, এই নিয়ম সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত নিয়ম মেনে চললেও অন্যকেও যে সেই নিয়মে চলতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এই দুটি বৈশিষ্ট্য নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সাধারণ নিয়মের পার্থক্য বর্তমান। নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় এবং এই নিয়মের প্রতি আমরা চূড়ান্ত বাধ্যতাবোধ অনুভব করে থাকি। অর্থাৎ আমরা মনে করি, এই নিয়ম পালন করতে আমরা একান্তভাবে বাধ্য। এই বাধ্যতাবোধের উপস্থিতির জন্যই সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে কর্তব্য পালন করে। কান্ট তাই ব্যক্তির বুদ্ধিপ্রসূত নীতি বা নিয়মকে শর্তহীন বলেছেন। সুতরাং ব্যক্তির আবেগকে দমন করলে সেই নিয়ম সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রসূত নীতি হবে সর্বজনীন ও আবশ্যিক। আবেগকে দমন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি বাধ্যবাধকতার ধারণাটি তাঁর দর্শনে সংযোজন করেন। সেই কারণেই তিনি মনে করেন, নৈতিক নিয়ম হল অনুজ্ঞা বা আদেশ। এই আদেশ হবে শর্তহীন আদেশ। সুতরাং বুদ্ধিপ্রসূত নিয়মের প্রতি বা শর্তহীন আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য থাকবে।

নৈতিক কর্মে বাধ্যবাধকতার ধারণা অর্থহীন

নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নীতিনিষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট আবেগকে উপেক্ষা করার জন্য বাধ্যতাবোধের উপস্থিতিকে অত্যাবশ্যক বলে মনে করলেও সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদেরা নৈতিক নিয়মের প্রতি বাধ্যতাবোধকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কারণ তাঁরা নৈতিক কর্ম পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নৈতিক বোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় ব্যক্তির চরিত্র গঠনকেই অধিক আবশ্যক বলে মনে করেছেন। এই সকল দার্শনিকদের অভিমত হলো, ব্যক্তি যদি নৈতিকবোধসম্পন্ন হয়, সে যদি স্থায়ী, দৃঢ়, সৎ চরিত্রের অধিকারী হয় তবে তার নীতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না। যে ব্যক্তি উদারমনস্ক তিনি 'অপরকে সাহায্য করা উচিত'—এমন নীতির উপস্থিতির কারণে অপরের সহায়তা করবেন না। তিনি তাঁর স্বভাববশতই

অপরের সাহায্যার্থে কর্ম করবেন। তাছাড়া তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তি যদি মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হন তাহলে শুধুমাত্র নীতি বা নিয়মকে অনুসরণ করে মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করা যায় না। তবে সমসাময়িককালের সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিবিদেরা যে নৈতিকতায় নীতির ধারণাকে বর্জন করেছেন তা নয়। কোনও কোনও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদেরা নীতির ধারণাকে গুরুত্বপূর্ণ বলেও দাবি করেছেন। ফলে সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিবিদদের আলোচিত মতবাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতবাদকে প্রধানত চরমপন্থী ও নরমপন্থী—এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুটি মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকদের মতের পার্থক্য প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমি চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত আলোচনা করব, যেহেতু তাঁরা ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে, অর্থাৎ আবেগ, প্রবণতা, আগ্রহ ইত্যাদিকে বুদ্ধির সাথে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সেক্ষেত্রে নীতির প্রতি বাধ্যতাবশত পালিত কর্ম নৈতিক কর্মরূপে বিবেচিত নয়। ব্যক্তি পরিস্থিতিসাপেক্ষে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে। যে কর্ম সৎ ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে উৎসারিত হয়, সেই কর্মকেই তাঁরা নৈতিক বলেছেন। এই দার্শনিকেরা মনে করলেন, কর্মসংক্রান্ত অবধারণ হল গৌণ অবধারণ। কারণ সেটি চরিত্র সম্পর্কিত অবধারণ থেকে নিঃসৃত হয়। ব্যক্তির চরিত্র যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়, সৎ কর্ম পালনে তার প্রবণতা অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। ব্যক্তির চরিত্র যদি সৎ হয় তাহলে তার কর্মকে পৃথকভাবে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিপরীতপক্ষে বিষয়টি সত্য না হতে পারে। কোন ব্যক্তি সৎ কর্ম পালন করলেও তার চরিত্র মন্দ হতে পারে। যে ব্যক্তি দরিদ্রকে দান করেছে তার ঐ কর্মের প্রকৃতি থেকে তার চরিত্র সম্পর্কে নিঃসন্দিদ্ধভাবে কোন মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয় না।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা কর্মের মাধ্যমে কোন চাহিদা বা লক্ষ্য পূরণ করি। আমাদের কর্ম পালনে কোন না কোন লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্যটি ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে। ঐ লক্ষ্যটি যেহেতু আমরা নির্ধারণ করি তাই ঐ লক্ষ্য লাভের জন্যও আমাদের মধ্যে একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। আমরা লক্ষ্য লাভের প্রয়োজনেই কোন একটি কর্ম পালন করাকে আবশ্যক বলে মনে করি। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত বিভিন্ন বিকল্পগুলির মধ্যে যে বিকল্পটি ঐ লক্ষ্য লাভের জন্য যথোপযুক্ত বলে আমরা মনে করি সেটিকে আমরা সাগ্রহে অনুসরণ করি। আমরা যখন পুরী যাওয়াকে লক্ষ্য বলে স্থির করি তখন ঐ নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত ট্রেনের অনুসন্ধান করি। বিকল্প ট্রেনগুলির মধ্যে যেটি উপযুক্ত বলে বোধ হয় সেটিতেই যাত্রা করি। অর্থাৎ লক্ষ্য লাভের জন্য একটি ইচ্ছা বা আগ্রহ আমাদের মনে উপস্থিত থাকে যা আমাদের যথোচিত উপায় অনুসরণের মাধ্যমে লক্ষ্য লাভে সহায়ক হয়। হেগেল[৭] মনে করেন, নৈতিক কর্মের

ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর বা বিষয়ের ধারণা বর্তমান থাকবে। লক্ষ্য বলতে অভাববোধ দূর করার ইচ্ছাজনিত কোন বস্তু বা বিষয় লাভ করার কামনা এবং উদ্দেশ্য হল ইচ্ছার পরিচালিত শক্তি, যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। তবে স্মরণীয় যে, নৈতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তি বিশেষের নির্দিষ্ট কোন কাম্য বস্তু নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাম্য লক্ষ্যবস্তু বিভিন্ন হতে পারে। কোন ব্যক্তির সম্পদ, যশ, খ্যাতি লাভ লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। আবার কোন ব্যক্তির ইচ্ছার লক্ষ্যবস্তু দৈহিক স্বাস্থ্য হতে পারে। এই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যলাভের কামনা নৈতিকতায় গ্রাহ্য হতে পারে না। নৈতিকতায় আমাদের একটি চরমলক্ষ্য থাকে, যে লক্ষ্যটি আমরা অন্য কোন কিছুর জন্য নয়, সেই লক্ষ্যটি অর্জনের জন্যই কামনা করি। এই চরম বা অন্তিম লক্ষ্যটি নিজ মূল্যেই মূল্যবান। এই চরমলক্ষ্যটিকে এ্যারিস্টটল *ইউডেমোনিয়া* বলেছেন, যার অর্থ 'সুখ'।[৮] কিন্তু এই 'সুখ' বলতে সাধারণ সুখের মত ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থা নয়, এটি একটি স্থায়ী স্থিতিশীল মানসিক অবস্থা। এই সুখ আমরা অর্জন করি আমাদের অন্তর্নিহিত সত্তাকে উন্নত করার মাধ্যমে। অর্থাৎ *ইউডেমোনিয়া* বা অন্তিম লক্ষ্যটি অর্জন করতে হলে আমাদের হৃদয়কে, মনকে উন্নত করতে হবে। মনকে উন্নত করার অর্থ হলো সদ্‌গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠা। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মনে বুদ্ধি ও আবেগ সমান্তরালভাবে ক্রিয়া করে। অর্থাৎ সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির ইচ্ছা অন্ধ কোন আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়। সে ইচ্ছা যুক্তিসঙ্গত পথে চালিত হয়। ফলে যিনি নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করেছেন তিনি বুদ্ধি ও আবেগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে সক্ষম হয়েছেন। সদ্‌গুণ চরিত্রে অর্জন করলে তবেই সেই গুণগুলি আমাদের কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হবে। এমন নয় যে, সেই ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পদনের জন্য আবেগকে দমন করবেন, বরং আবেগ এবং বুদ্ধি তাঁকে একই উদ্দেশ্য লাভে চালিত করবে। একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ক্রিয়া সম্পাদনে সক্ষম হবে। কেননা এরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে আবেগ, আকাঙ্ক্ষাগুলি যুক্তির বিরোধী নয়। তাই ব্যক্তি যখন কোন কর্মকে নির্বাচন করেন তখন তাঁর বিচক্ষণতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবেন। ব্যক্তি বিচক্ষণ হওয়ায় বাহ্য কোন প্রভাব ব্যতীত নিজ চরিত্র অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সচেতনভাবে ব্যক্তিকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হবে না। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলিই তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। সহানুভূতি যার চারিত্রিক গুণ, সে সর্বদাই সহানুভূতিসম্পন্ন আচরণ করবে। সাহস সদ্‌গুণরূপে উপস্থিত থাকার জন্য ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে সাহসিকতা প্রদর্শন করবে। এমন নয় যে, ব্যক্তি নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাহসী আচরণ করবে। ব্যক্তির চরিত্রে যদি সঠিক আবেগ উপস্থিত থাকে তবে সে পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথ পরিমাণ আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কর্ম পালনে সমর্থ হবে।

সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র সঠিক কর্ম সম্পাদনই করেন না, তাঁর আচরণ অন্য ব্যক্তিকে সমভাবে প্রভাবিত করে বলে ফিলিপা ফুট মনে করেন। ব্যক্তির মনে সাহস থাকলে সে যেমন সাহসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম, তেমনি তার সাহসী পদক্ষেপ সমাজের পক্ষেও মঙ্গলময় হয়। সুতরাং সৎ আবেগ বা সদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তি নিজের নৈতিক মূল্য যেমন বৃদ্ধি করে সকলের নিকট ভালো ব্যক্তিতে পরিণত হয়, তেমনি তাকে অনুসরণ করে অন্য ব্যক্তিরাও উন্নত জীবন লাভে সক্ষম হয়। একজন স্থপতির শিল্পীকীর্তির গুণাগুণ যেমন শিল্পীকে উচ্চস্তরের শিল্পীরূপে পরিগণিত করে, তেমনি তার শিল্পকলার গুণাগুণ সমাজের অপর ব্যক্তিবর্গকে আকৃষ্ট করে। তাঁর সৃজনশীলতা অপরের নিকট উদাহরণস্বরূপ অনুসরনীয় হয়। সেই শিল্পকীর্তির কৌশল রপ্ত করে অনেক শিল্পী উন্নতি লাভে সক্ষম হতে পারে। সেইরূপ ভালো ব্যক্তি সমাজে সমাদৃত হয় তার মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা আমাদের জীবনে অনুসরণ করি এবং তাকে আদর্শরূপে নির্ধারণ করি। শহীদ ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম আমাদের উদ্বেলিত করে। আমরা ঐরূপ মনোভাব গঠনে যাতে আগ্রহী হই তাই ছোটবেলা থেকে আমারা ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কাহিনী পাঠ করি। ভালো ব্যক্তির লক্ষণে এ্যারিস্টটল বলেন, ভালো ব্যক্তি তিনিই যিনি ভালোমানুষ হয়ে উঠতে পারবেন। অর্থাৎ ভালো চরিত্রের অধিকারী হবেন। আমরা ভালো ব্যক্তি বলে তাকেই পছন্দ করবো যে ব্যক্তির চরিত্রে এমন কিছু বিশেষ গুণের উপস্থিতি রয়েছে যা প্রশংসার যোগ্য। এরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। ফুটের মতে, প্রজ্ঞা হলো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জ্ঞান ও সেই জ্ঞান অনুসারে সৎ কর্ম পালন। ব্যক্তি সর্বদাই কোন একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্ম করে। সেই লক্ষ্যের মধ্যেই ব্যক্তির ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। তাই কর্মের লক্ষ্য নির্ণয়ের জন্য আমাদের লক্ষ্য বস্তু সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন লক্ষ্যকে স্বীকার করে নিয়ে এবং লক্ষ্যটি লাভের জন্য সচেষ্ট হন। লক্ষ্য যেহেতু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নির্বাচিত লক্ষ্য, সেহেতু তা লাভের জন্য ব্যক্তি একটি দায়বদ্ধতা বা বাধ্যতাবোধ অনুভব করেন এবং সেই বোধে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। যদিও ঐ বাধ্যতাবোধ আমাদের অন্তরের থেকে উৎসারিত হয়। ঐ লক্ষ্যবস্তু লাভের বাধ্যতাবোধ হলো ব্যক্তির আন্তর ইচ্ছা—যা সৎ প্রবণতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত।

নৈতিকবোধই নৈতিক কর্মের সহায়ক

সদ্‌গুণ কেবলমাত্র ব্যক্তির প্রবণতাকেই উন্নত করে না, প্রবণতা অনুসারে তাকে কর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এ্যারিস্টটল তাই সদ্‌গুণ বলতে কর্ম পালনের প্রবণতাকে বুঝেছেন। কিন্তু ব্যক্তি যখন নৈতিক বোধের অধিকারী হয় তখন সে পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করে না। পরিস্থিতি বিচার করে সে তার আবেগগুলিকে ব্যবহার করে। পরিস্থিতি বিচার না করলে আবেগের যথাযথ ব্যবহারই সম্ভব হবে না। বার্নার্ড উইলিয়ামসের[৯] মতে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে বলপূর্বক এক মানদণ্ড সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আমাদের বাস্তব পরিস্থিতির জটিলতার কারণে কর্মকর্তা পরিস্থিতি অনুসারেই নির্ধারণ করেন কোন কর্মটি সম্পাদন করবেন। কেননা নৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। কোন পরিস্থিতিতে যে কর্মটি সম্পাদন করা গুরুত্বপূর্ণ বলে কর্মকর্তা বিবেচনা করেন সেই কর্মটি সম্পাদন করার প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন এবং সেই কর্মটি সম্পাদন করেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাই সার্বিক বাধ্যতাবোধের মানদণ্ডের ধারণার দ্বারা চালিত হওয়া সম্ভব হয় না। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা উচিত—এমন নীতি সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কোন একজন দেশদ্রোহী যদি তার প্রাণ রক্ষার্থে সাহায্যপ্রার্থী হয় তবে তাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য বলে গণ্য হয় না। কারণ তাকে রক্ষা করার অর্থ হলো নিজের এবং অন্যান্য অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন করা। মাইকেল স্লটের[১০] মতে, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করা অন্যায় নয়। পরিস্থিতি এমন হতেই পারে যেখানে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আক্রমণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা নৈতিক দিক থেকে সঠিক কর্ম বলা হয়। সেক্ষেত্রে 'হত্যা করা অন্যায়' এমন নীতি সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা হলে নিজেই নিজের মৃত্যুর পথকে প্রশস্থ করতে হয়। তাই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হত্যা করাকে রাষ্ট্রও স্বীকৃতি দেয়। আত্মহত্যা অনৈতিক বলে দার্শনিকেরা মত প্রকাশ করলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারীদের জহর ব্রত পালনকে অত্যন্ত মহৎ কর্ম বলে মনে করা হতো। এই ব্রত অনুযায়ী দেশ শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে হিন্দু নারীরা নিজেদের সম্মান রক্ষা করার জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিতেন। সুতরাং দেখা গেল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কর্মের ন্যায্যতা নির্ধারিত হয়। সত্য কথন কর্তব্য—এমন নীতিকেও পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মহাভারতের কর্ণপর্বে[১১] ঋষি কৌশিক সত্যভাষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন বলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে অস্বীকার করেন। শাস্তিস্বরূপ স্বর্গলাভের সুখ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে কেবল নীতি পালনের বাধ্যতা সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয় না। ফলে নৈতিক কর্মে বাধ্যতাবোধের ধারণাকে আবশ্যিক ধারণারূপে গণ্য করা যায় না।

তবে নৈতিকতায় পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিকেরা সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সৎ ব্যক্তির উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ায় তিনি সর্বদা মঙ্গলময় কর্মই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করবেন। আদর্শ ব্যক্তি গঠন করা নৈতিকতার উদ্দেশ্য। চতুর ব্যক্তি মনের দ্বন্দ্বকে গোপন করে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হলেও তাকে আমরা পছন্দ করি না, বরং আদর্শবান ব্যক্তিকে প্রশংসা করি, তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। বরং বলা যায় আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি তার নিজস্ব মতামত অনুসারে কোন কর্মটি সঠিক তা নির্বাচন করেন। সেজন্য কোন কর্ম আবশ্যকরূপে পালনীয় বলা সম্ভব নয়। ব্যক্তি সেই কর্মটিকেই সঠিক বলে মনে করে যা তার লক্ষ্যপূরণে সহায়ক। এই কারণেই বার্নার্ড উইলিয়মস দাবি করেন, একই পরিস্থিতিতে দুজন ব্যক্তি ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন, যদিও কোন মতটিকেই ভ্রান্ত বলা যায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিকট যে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হবে, সেই বিষয়টিকেই ব্যক্তি নির্বাচন করবেন। উইলিয়ামস এ কারণে বলেছেন— '… only an obligation can beat an obligation."[১২] ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা আগ্রহ থেকে নিঃসৃত হওয়ার জন্যই নৈতিক সিদ্ধান্ত আপেক্ষিক হবে একথা সত্য। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যেহেতু একই সাথে সমাজ স্বীকৃত নৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা অনুমোদিত সেহেতু ব্যক্তির সিদ্ধান্ত কখনই ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়কে প্রতিফলিত করবে না। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদদের মতে, নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে, অর্থাৎ ব্যক্তির আগ্রহ, ইচ্ছা ইত্যাদিকে অস্বীকার করে বাধ্যতাবোধের ধারণাকে দৃঢ় অর্থে গ্রহণ করার অর্থ ব্যক্তির মানসিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা। নিজের ইচ্ছা, আগ্রহকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে ব্যক্তি নৈতিক বাধ্যতাবোধবশত বস্তুগত সত্যতা বা সর্বজনীন সত্যতাকে প্রতিফলিত করতে প্রয়াসী হলে ব্যক্তির মানসিকতায় অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হবে। নিজস্ব মনোভাবকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি দীর্ঘদিন কর্তব্যবোধে কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য হলে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে নিজেই আত্মপ্রতারণা করবে। তাছাড়া বলপূর্বক বস্তুগত সত্যতা লাভ করার অর্থ ব্যক্তির আত্মিক উন্নতির পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া। তাই সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের মতে, ব্যক্তির নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বভাবকে অস্বীকার করে নয়, বরং সেগুলিকে গুরুত্ব দিয়েই নৈতিকতার বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ হবে। নতুবা নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি আপাতভাবে কর্তব্য পালন করলেও ঐ কর্তব্যকর্মের সাথে ব্যক্তির অনুভূতি যুক্ত না থাকায় নৈতিকতার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। তাই এঁদের মতে, নৈতিকতায় ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির অর্থ এমন নয় যে, তা ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করবে। নৈতিক জগতের সদস্যরূপে সমাজের মঙ্গলের ধারণা সম্পর্কে সকল সদস্য অবহিত। ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ বর্তমান থাকে

বলেই কোন বিষয় ন্যায়সঙ্গত, কোনটি অন্যায় সে বিষয়ে ব্যক্তি সচেতন থাকে। যেহেতু ব্যক্তি নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য তাই সে বস্তুগত সত্যতাকে অস্বীকার করবে না। কিন্তু বস্তুগত সত্যতা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে না। যে সামাজিক মঙ্গলকে চরমমঙ্গল বলে মনে করা হয় তা ব্যক্তি মঙ্গলের বিপরীত নয়। অর্থাৎ সামাজিক মঙ্গল সমাজস্থ ব্যক্তির মঙ্গলের সাথেই সম্পর্কিত। ফলে যে বস্তুগত সত্যতা বা চরমমঙ্গল অনুসারে নৈতিক কর্ম পালনের কথা বলা হয় সেটি অবশ্যই ব্যক্তির ইচ্ছা বিরুদ্ধ বিষয় হতে পারে না। ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিক জগত সম্পর্কে তার মনোভাব, নৈতিক চিন্তা, ইচ্ছা, নিজস্ব উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা—এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে নৈতিকতায় বস্তুগত সত্যতা গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা কখনই ক্ষুদ্র আত্মতৃপ্তিকে প্রকাশ করবে না। উৎকৃষ্ট নৈতিক অনুভূতিই ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের আত্মপ্রকাশকে বর্জন করতে সাহায্য করবে। ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভূতির সঙ্গে কর্তব্যবোধের সহাবস্থান বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এ দুটির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য বজায় থাকবে।

উইলিয়ামসের মতে, একই নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক অনুভূতি বর্তমান থাকে। এই অনুভূতির কারণেই কোন নৈতিক কর্ম সম্পাদন না করতে পারলে আমরা অনুতপ্ত হই, লজ্জিত হই। নৈতিক ক্ষেত্রে নিন্দা, লজ্জা, কৃতজ্ঞতা, অপরের প্রতি কর্ম সম্পাদন না করতে পারার যন্ত্রণা, অনুশোচনা—এই নৈতিক অনুভূতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই মানবিক সদ্‌গুণগুলিই মানুষকে পূর্ণতা দেয়। এই পূর্ণতাকে অস্বীকার করে নৈতিক বাধ্যতার দ্বারা চালিত হলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবক্ষয় হবে। আবেগের কারণেই সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধন সম্ভব হয়। যিনি নৈতিক চরিত্রের অধিকারী নন, যথাযথ আবেগ অনুভব করেন না তিনি নৈতিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেন না। অর্থাৎ নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে গণ্য হন না। এমন অনৈতিক ব্যক্তি সমাজের যেখানেই যাবেন তিনি সামাজিক স্বীকৃতির বিপরীতে তার মনোভাবকে প্রকাশ করবেন। তিনি সেক্ষেত্রে সমাজবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করবেন। তার সমাজ বিচ্ছিন্নতাই তাকে অবগত করাবে যে, তিনি সামাজিক সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছেন। ফলে তিনি চরিত্র সংশোধনে সচেষ্ট হবেন। আমাদের নৈতিকবোধের কারণে এবং আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা যখন কোন কর্ম করি তখন আমরা ঐ কর্মের প্রতি একটি সাধারণ বাধ্যতাবোধ অনুভব করি। এই বাধ্যতাবোধ নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধে কর্ম সম্পাদন করা নয়। নৈতিক অনুভূতির জন্যই আমরা ঐচ্ছিকভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করি। সেই কারণে নৈতিক বাধ্যতাবোধ অনুসারে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকতে

পারা যায় না। যেখানে আমরা ঐচ্ছিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সেখানে কোন বুদ্ধিপ্রসূত সার্বিক নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধ জ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। কেননা এ জাতীয় নৈতিক কর্ম সম্পাদন না করতে পারলে আমরা লজ্জিত হই, অনুতপ্ত হই। লজ্জা, পরিতাপ, অনুশোচনা, কৃতজ্ঞতা- এই বোধগুলি উইলিয়ামসের মতে first personal reaction.[১৩]এই বোধগুলি আমাদের থাকার জন্যই আমাদের নৈতিক কর্মের লক্ষ্য হল আমি কোন অনৈতিক কর্ম সম্পাদন করব না। এই মানসিকতার উপস্থিতির জন্যই আমরা নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য থাকি। নৈতিক ক্ষেত্রে কান্ট শর্তহীন ব্যবহারিক আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কর্মকর্তা ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে শর্তনিরপেক্ষভাবে নৈতিক নিয়মের প্রতি বাধ্যতাবোধের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করবে—এমন কথা বলেছেন। উইলিয়ামস এমন চিন্তাকে অদ্ভূত বলেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা ব্যতীত কোন কর্মের প্রতি বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হতে পারে না। ফলে উইলিয়ামসের মতে, নৈতিক কর্ম সম্পাদনে বাধ্যতাবোধবশত আমরা নৈতিককর্ম সম্পাদন করি, কিন্তু বাধ্যতাবোধের অনুভূতি সেক্ষেত্রে থাকবে না। বলা যায় ব্যক্তি বাধ্যতাবোধ সম্পর্কে সচেতন না থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদন করবেন এবং সেই কর্ম সম্পাদনে উৎসাহ বোধ করবেন। আমাদের চরিত্র, সামাজিকতাবোধকে অস্বীকার করে নৈতিক আচরণ করা সম্ভব নয়। আমাদের মহৎ চরিত্র থেকেই নৈতিক কর্ম সম্পাদিত হয়। অন্তর থেকে নৈতিক কর্ম উৎসারিত হয়। ফলে নৈতিকতার বিষয় বুদ্ধি থেকে নিঃসৃত হওয়া নয়, বরং হৃদয় থেকে নিঃসৃত হওয়া উচিত । বাস্তব পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে সাধারণ বাধ্যতাবোধ বা দায়বদ্ধতা থেকে নৈতিক কর্ম সম্পাদিত হয়।

পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে নৈতিক বিধানের প্রতি বাধ্যবাধকতা প্রদর্শন করে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই। যে নীতিটি বর্তমান পরিস্থিতিতে আবশ্যক বলে গৃহীত হয়, সেই একই নীতি ভিন্ন পরিস্থতিতে, ভিন্ন কালে উপেক্ষিত হতে পারে। যখন একাধিক কর্ম আমাদের নিকট সঠিক, ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন হয় অথচ আমাদের বাস্তব পরিস্থিতিতে যখন সকল কর্মগুলিকে যথাযথভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব হয়, তখন তাকে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি বলে। এরূপ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ দুটি বিকল্প আমাদের নিকট কর্তব্য বলে গ্রাহ্য হয়, অথচ দুটি বিরুদ্ধ কর্ম সম্পাদন অসম্ভব হয়। দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে কোন কর্ম নির্বাচন করার অর্থই অপর কর্তব্যটি উপেক্ষা করা। যেহেতু দুটি পরস্পরবিরোধী কর্মই ন্যায়সঙ্গত বলে গ্রাহ্য হয়। তাই যে কোন কর্ম পালন করাই অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। কারণ একটিকে পালন করার অর্থ অপর ন্যায়সঙ্গত কর্মটিকে উপেক্ষা করা। প্রতিজ্ঞা পালন করা নীতিটি স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্যপালনীয়

হলেও, ঐ নীতিটি অপরের জীবনরক্ষা নামক কর্তব্যের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, একজন ব্যক্তি সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। নির্দিষ্ট দিনে সেমিনারে যাওয়ার সময় পথ মধ্যে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়াকেই তাঁর কর্তব্য বলে নির্ধারণ করবেন। ফলস্বরূপ সেমিনারে বক্তব্য পরিবেশনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অসমর্থ হবেন। এক্ষেত্রে আহত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করাকে যথাযথ কর্ম বলে গণ্য করতে হবে। সেমিনারে অনুপস্থিত থাকার পর্যাপ্ত যুক্তি তাকে ন্যায্য, দায়িত্ববান ব্যক্তি বলেই প্রতিপন্ন করবে। অপরের প্রাণরক্ষা না প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা—কোনটি এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করতে হবে। তাই সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিতাত্ত্বিকেরা বলেন, নীতিকে অতিক্রম করে সদ্‌গুণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমরা সহজেই এরূপ দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে পারি। কেননা সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকেরা নৈতিক জীবন বলতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হওয়াকে বোঝেন না। এই নীতিতত্ত্বের উদ্দেশ্যই হলো সমগ্র জীবনের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রজ্ঞা ব্যক্তিকে নীতির অনুশাসন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি তার প্রজ্ঞা দ্বারা, তার অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের আলোকে পরিস্থিতির বিচার করে তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিক ডেভিড সলোমানের মতে, সদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তি সকল দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি সহজেই মোকাবিলা করতে সক্ষম। কেননা সেক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মকে বিচার না করে, চরিত্রের বিচার করে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির চারিত্রিক সদ্‌গুণ প্রকাশিত হচ্ছে কিনা—তা দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তাঁর মতে, সদ্‌গুণ সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে বলে ব্যক্তির চারিত্রিক সদ্‌গুণই তার কৃতকর্মকে সঠিক বা ন্যায়সঙ্গত করে তোলে। ফলে সংকটজনক বা দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতেও ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালবিলম্ব করবে না। সেকারণে ডেভিড সলোমানের মতে, ‘ The moral life is not, on this view, best regarded as a set of episodic encounters with moral dilemmas or moral uncertainty; it is rather a life-long pursuit of excellence of the person.’[১৪] যে ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন তার প্রবণতা ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য থাকায় ঐ ব্যক্তির কোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয় না। এ্যারিস্টটল মনে করেছেন, ‘Virtue of character, for this concerns feeling and actions, and in these there is excess and deficiency and a middle amount...but to feel them *at the right times, for the right objects, towards the right people, for the right reason, and in the right way* that in both middle and best, and is the part of virtue.[১৫] চরিত্র

একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য মানসিক অবস্থা। ফলে চরিত্রের প্রবণতাগুলি অবস্থার সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। ব্যক্তি যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক তার কর্মের মধ্যে তার প্রবণতাগুলি প্রতিফলিত হবে।

নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সমমর্মিতাবোধ

আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের আচরণের জন্য পরিস্থিতি বিচার করার প্রয়োজন আছে। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালো কর্মে প্ররোচিত হলেও তাঁর বিচক্ষণতা তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত না করলে তিনি কোন কর্মটি সেক্ষেত্রে ভালো বলে বিবেচ্য হবে তা না নির্ধারণ করতে পারেন না। আবার যে সকল দার্শনিক কর্মের মূল্যায়নে বিশ্বাসী তাঁরাও মনে করেন, নীতি প্রয়োগ করতে হলেও আমাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তবেই কোন নীতি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য তা নির্ধারণ করতে হয়। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সময় অপর ব্যক্তিদের মনোভাব, তাদের সুখ-সুবিধা জানাও আবশ্যক। সমাজে দায়িত্বশীল সদস্যরূপে আমাদের সচেতন থাকতে হয় যাতে আমাদের কৃতকর্ম অপরের স্বার্থ বিঘ্নিত না করে। সমমর্মিতাবোধের উপস্থিতি থাকলে তবেই ব্যক্তি অপরের মানসিকতাকে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। দার্শনিক ডেভিড হিউম[১৫] সেইজন্যই সমমর্মিতাকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানব ধর্ম বলে মনে করেছেন যার দ্বারা ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক গঠন সম্ভব হয়। সমমর্মিতার ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির আবেগ আমার আবেগরূপে প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ অপরের মনে উপস্থিত আবেগ আমার মনে সঞ্চারিত হওয়ার কারণে আমি অপর ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারি। সমমর্মিতা হলো এমন এক অনুভূতি যেখানে অন্যের অনুভূতিকে নিজের অনুভূতির সমার্থক বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ এই অনুভূতিবোধ থাকার জন্য অনুভূতিবোধের কর্তা এবং যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা হচ্ছে বা গ্রাহক উভয়ই সমান অবস্থানে বিচরণ করেন। সুতরাং নীতি প্রণয়নের পূর্বে সমমর্মিতা সহকারে অপর ব্যক্তির পরিস্থিতি ও মনোভাব অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। অপর ব্যক্তির মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সক্ষম হলেই ব্যক্তি ঐ পরিস্থিতিতে কোন নীতি প্রয়োগ যথার্থ – তা বুঝতে সক্ষম হবে। সমমর্মিতার কারণেই অন্য ব্যক্তির ঐ পরিস্থিতিতে উৎপন্ন আবেগ, অনুভূতি, বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা গঠন সম্ভব হবে। ফলে কর্মের বিচার সহজ হবে। যেমন, একজন ব্যক্তি চুরি করেছে বলেই পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। ঐ পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির কোন মনোভাব তাকে ঐরূপ কর্ম পালনে বাধ্য করল, সেই পরিস্থিতিতে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল, কোন মানসিকতা তাকে ঐ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তির চরিত্র যথাযথ কিনা এইসব তথ্যকে সমমর্মিতাবোধের দ্বারা

যথার্থভাবে বোঝা সম্ভব। অপর ব্যক্তি সম্পর্কে এই সকল জ্ঞান না থাকলে কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্থ করা সঠিক নয়। সমমর্মিতা নামক মনোভাবের কারণে আমরা সমগ্র পরিস্থিতির সাপেক্ষে উৎপন্ন ঐ ব্যক্তির অনুভূতিকে যাচাই করতে সক্ষম হবো। ফলে সমমর্মিতাবোধ আমাদের চরিত্রে উপস্থিত থাকলে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে স্মরণে রাখা দরকার যে, সমমর্মিতাকে আবেগ বলে মনে করলেও এটি কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, বিচারহীন নিছক কোন আবেগ নয়, যা ব্যক্তিকে তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করে। সমমর্মিতা কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হওয়া কোন মানসিক অনুভূতি নয়। এই বোধ যে ব্যক্তির চরিত্রে উপস্থিত থাকে সেই ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমমর্মিতাবোধের ব্যবহারে সক্ষম। সমমর্মিতার মধ্যে বিচারবোধের উপস্থিতি থাকে বলেই বিচক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে এই বোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমমর্মিতার অর্থ হলো অপরের প্রতি করুণা নয়, অপরের স্বার্থসিদ্ধি করা নয়; অপরের আবেগের সাথে নিজের আবেগ যুক্ত করে নিজের হৃদয়ে অপর ব্যক্তির চিত্তের প্রতিফলন ঘটানো।

বিচক্ষণতার স্বরূপ

সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদদের মতে, বিচক্ষণ ব্যক্তিই যথাযথ আবেগের অধিকারী এবং প্রয়োজন অনুসারে সেগুলির ব্যবহারে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। তবে এমন নয় যে, যথাযথ কর্ম সম্পাদন থেকে ব্যক্তিকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হবে। বিচক্ষণতা হল নৈতিক সদ্‌গুণ, যা ব্যক্তির চরিত্রে বর্তমান থাকলে ব্যক্তি মঙ্গলজনক কর্ম পালনে সক্ষম হন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এ্যারিস্টটল[১৭] প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতাকে বৌদ্ধিক সদ্‌গুণ বললেও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিক ফিলিপা ফুটের[১৮] মতে, বিচক্ষণতা হলো নৈতিক সদ্‌গুণ, যা ব্যক্তিকে অভ্যাসের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। তাঁর মতে, বিচক্ষণতা হলো ব্যক্তির জ্ঞান ও সেই জ্ঞান অনুসারে সৎ কর্ম পালন। ব্যক্তি সর্বদাই কোন একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্ম করে। কর্মের লক্ষ্য নির্ণয়ের জন্য লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। তবে এই লক্ষ্য বিশেষ কোন লক্ষ্য নয়। বিচক্ষণ ব্যক্তির লক্ষ্য হলো চরম মঙ্গল উৎপাদন। কোনটি মঙ্গল সেই সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা জরুরী। ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন করবে তাঁর অভিজ্ঞতার সাহায্যে। জীবনের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। কেননা ব্যক্তির জীবনে নৈতিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ করে। ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কোন পরিস্থিতিতে কোন বিষয়টির নৈতিকমূল্য বর্তমান তার নির্ধারক হতে পারে। সেই কারণেই আমরা বিচক্ষণ ব্যক্তি বলতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই বুঝে থাকি। যিনি জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে সফল। বিচক্ষণতার উৎসই

হলো জীবনের অভিজ্ঞতা। সুতরাং অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে আমরা নৈতিক কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারি না। কারণ আমরা নৈতিক কর্ম পালনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ উন্নত ব্যক্তিতে পরিণত হই, নৈতিক পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হই। জীবনের সাথে যুক্ত সাধারণ লক্ষ্য পূরণে সমর্থ ব্যক্তিই হলো বিচক্ষণ ব্যক্তি। জীবনের লক্ষ্যটি যদি সৎ হয় এবং ব্যক্তি যদি সফলভাবে ঐ সৎ উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে আমরা জ্ঞানী বলে স্বীকার করি। এ জাতীয় জ্ঞান যে কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। আবার বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞানলাভই পর্যাপ্ত নয়। সেই জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকে মূল্যবোধের ধারণা। ব্যক্তি কেবল সেই বিষয়গুলিই অর্জনে আগ্রহী হবেন যা নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতার জন্য মূল্যবান। কোন বিষয়গুলি তুচ্ছ ও নগণ্য এবং কোনটি মূল্যবান—সে পার্থক্যের বোধ না থাকলে ব্যক্তি যথার্থ মূল্যকে বুঝতে অক্ষম হবেন। এই কারণে ম্যাকিনটায়ারের মতে, সদ্‌গুণ ও পাপ (অসদ্‌গুণ) –এই পার্থক্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতীত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নয়। ফলে বিচক্ষণতা হলো সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য রচনা করার বিশেষ ক্ষমতা। সে কারণে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির মূল্যবোধ সব সমালোচনার উর্দ্ধে। বলা যেতে পারে, প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত থাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। তার উপলব্ধির ক্ষমতা তাকে মূল্যবান বিষয়কে চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। সুতরাং বিচক্ষণতার অভাব থাকলে ব্যক্তি মন্দ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়।

সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদদের মতে, বিচক্ষণতা নামক সদ্‌গুণ আমরা জন্মসূত্রে লাভ করি না। আবার এ জাতীয় জ্ঞান কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারাও পেতে পারি না। জুলিয়া আনার[১৯] মতে,নৈতিক বিষয় যান্ত্রিক বিষয় সদৃশ নয়। একজন কমপিউটারবিদ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা দ্রুত সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, ঐ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে। কোন জাগতিক ঘটনাবিষয়ক জ্ঞান দ্রুত কমপিউটারের মাধ্যমে নির্ণয় করতে সক্ষম হতে পারে। যে কোন ব্যক্তি ঐ বিশেষ ব্যক্তির সদৃশ হতে পারে, অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি কম্পিউটার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে দ্রুত কোন বিষয়কে জানতে সমর্থ হতে পারে। সেক্ষেত্রে সকল ব্যক্তিই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হবে। সকলকেই ঐ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে হয়। কিন্তু নৈতিকতা কম্পিউটার সদৃশ্য বিষয় নয়। ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার দ্বারাই নৈতিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে, তার জীবনবোধ তাকে সঠিক পথে চালিত করে। আবার নৈতিক সত্যতার জাগতিক বিষয়ের সত্যতার অনুরূপ নয়। জাগতিক বিষয়ের সত্যতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিশ্বাসের সঙ্গে জাগতিক বস্তুর সাদৃশ্য থাকলে ব্যক্তির বিশ্বাস সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির মনে কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব জগতের মিল থাকলে সেই বিশ্বাস সত্য বলে গণ্য হয়। যেমন, ‘গাছের পাতা সবুজ’- এই অবধারণটি সত্য কিনা তা বাস্তবে যাচাই করে অবধারণের

সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নৈতিক বিষয়ে জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে দেখার বিষয় না। নৈতিক বিষয়কে উপলব্ধি করতে হয়। আবার নৈতিক বিষয় গণিতের জ্ঞানের মত স্বতঃসিদ্ধ নয়। গণিত বা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত সর্বদা সুনিশ্চিত, কিন্তু নৈতিক বিষয় সেরূপ নয়। রোসালিণ্ড হার্স্টহাউস তাই বলেন, '…moral knowledge, unlike mathematical knowledge, cannot be acquired merely by attending lectures and is not characteristically to be found in people too young to have much experience of life.'[২০] নৈতিক বিষয় গণিত সদৃশ হলে যে কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ পাঠ্যবই পাঠ করে নৈতিক ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু নৈতিকতার তাত্ত্বিক জ্ঞানই ব্যক্তিকে নৈতিক মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারে না। বরং ব্যক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করতে হয়। নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে, জগতকে পর্যবেক্ষণ করতে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। উইলিয়াম, এফ, কুইলিয়ান-এর মতে, নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক উৎকর্ষতা সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি ব্যক্তির নিকট নৈতিক পরিস্থিতি হল 'unique feeling'.[২১] ব্যক্তির অনুভূতি বৃহত্তর নৈতিক মূল্যবোধের নিরিখে সদর্থক মূল্য হলে তাকে কর্মে উৎসাহিত করবে এবং নঞর্থক অনুভূতি তাকে সংশোধন করে মহত্তর নৈতিক উৎকর্ষতা লাভে সহায়তা দান করাবে। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নৈতিক জীবনের সমন্বয় আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণতা দান করে। সুতরাং ব্যবহারিক জীবন এবং আমাদের অনুভূতির মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, যা ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে পরিচিতি দেয়। যার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বিচক্ষণতার কারণে সঠিক বিষয়টি ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে। এই ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় জীবনের চলার পথে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

বিচক্ষণতার কারণে ব্যক্তি নিজের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একথা সত্য যে, সকল ব্যক্তি সমান সদ্‌গুণের অধিকারী হয় না। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির তুলনায় কম সাহসী, কম মিতাচারী, কম উদারতার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির অভিপ্রায় হবে নিজেকে সংশোধনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করা। ফলে একথা ভাবা সঠিক নয় যে, ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরমমঙ্গলময়তা অর্জনে অপারগ। তবে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন না। তিনি তাঁর অন্তরের অভিপ্রায় অনুসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবেন। বস্তুগত মূল্য বা পরমমঙ্গলময় লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা, অনুভূতি ভুল হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের উন্নতি সাধনে নিজের অনুভূতির পরিবর্তন ঘটাবেন। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তাকে উন্নতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই নৈতিকতায় ব্যক্তির মনোভাব

পরিবর্তনকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বল ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের ইচ্ছাকে মহৎ লক্ষ্যে উত্তরণের চেষ্টা করতে পারেন। যদি ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে সৎ কর্ম পালন করাকে কষ্টসাধ্য বলে মনে করে, তবে অবশ্যই তাঁর ইচ্ছায় সদ্‌গুণের অভাব রয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে সংযত করে সৎ কর্ম পালন করবে তাকে কম সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলা হবে। জুলিয়া আনা[২২] দু'ধরণের সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেসকল ব্যক্তি সদ্‌গুণের চর্চা করবেন সদ্‌গুণ লাভ করার লক্ষ্যে। এঁরা অপূর্ণ সদ্‌গুণের অধিকারী হলেও তাঁদের উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়কে সর্বদা উন্নত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবেন। কিন্তু পূর্ণসদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বা প্রজ্ঞার অধিকারী। প্রকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবলমাত্র সৎ কর্ম পালন করেন। অপূর্ণ সদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তি পূর্ণসদ্‌গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে পূর্ণসদ্‌গুণ সম্পন্ন হতে সচেষ্ট হবেন। একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিজেকে সদ্‌গুণের উপস্থিতিতে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি অন্য ব্যক্তিদের সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে। যেমন একজন কৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড় তার অভিনব কৌশল দ্বারা তার নিজের খেলার কৌশলের উন্নতি ঘটায়। আবার একইসাথে অন্যান্য খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে ঐ কৌশল প্রয়োগে তাদের খেলারও উন্নতি করতে। তেমনি যদি ব্যক্তি তার নিজস্ব দুর্বলতাকে উপলব্ধি করে এবং অপর কোন ব্যক্তিকে নিজের অপেক্ষা উন্নত বলে স্বীকৃতি দানের মহত্ব যদি তার থাকে তবে সে ঐ উন্নত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে নিজের চরিত্রের উন্নতি করতে আগ্রহী হয়।

এইভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তি নৈতিকজীবনের পরিকল্পনা গঠন করে। এরূপ ব্যক্তি জীবনকে কীভাবে অর্থবহ করতে হয়, কীভাবে নৈতিক কর্ম নির্বাচন করতে হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী। তার অভিজ্ঞতা তাকে জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন করতে সহায়তা দান করে। জীবনের চাহিদা, ইচ্ছা প্রভৃতির সঙ্গে কর্মের সমন্বয় সাধনের অনুভবকেই কোনলি 'narrative structure'[২৩] বলেছেন। তাঁর মতে, নৈতিক কর্ম ব্যক্তির হৃদয় থেকে নিঃসৃত হবে। কর্তব্যবোধে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা, সংস্কার, ইচ্ছাবোধকে দমন করে নৈতিক কর্ম পালন করতে বাধ্য থাকে। 'Duty not merely calls but kidnaps.'[২৪] সেক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির কর্ম দুটির মধ্যে বিভাজন করে দেওয়া হয়। নৈতিকতায় এরূপ চিন্তা কাম্য নয়। ব্যক্তির নৈতিক ইচ্ছার অগ্রগতিই নৈতিকতায় কাম্য হয় উচিত। কোনটি সঠিক বা ভাল তা নির্দেশ করা নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় হতে পারে না, বরং কোন বিষয়গুলি ভাল তার প্রতি ব্যক্তি নিজেই যত্নশীল হবেন। এরজন্য নৈতিক অনুভূতির জাগরণ গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে নৈতিকতার বিষয় 'unrealistic as it

is unflatterering'[২৫] বা অতৃপ্তিদায়ক বলেই অবাস্তব হবে। ফলে নৈতিকতায় ব্যক্তিসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তির আন্তর বিষয়ের অনুভূতি মূল্যবান। নৈতিক ব্যক্তির আন্তর শক্তিই ব্যক্তিকে মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত করে। নিজেকে উপলব্ধি করা, নৈতিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হলেই নৈতিকতায় ভাল-মন্দ বিষয় সম্পর্কে যত্নশীল হওয়া সম্ভব।

বিচক্ষণতাঃ কান্টের অভিমত

নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা দাবি করেন যে, নীতিগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণযোগ্য। তাই সকল ব্যক্তির কর্তব্য অন্যান্য বিষয়কে উপেক্ষা করে নীতি অনুসারে কর্ম পালন করা। নীতিনিষ্ঠ মতবাদের এমন দাবি নৈতিকতায় নির্দেশ্যবাদকে সমর্থন করে। এই মতবাদ অনুসারে নৈতিক নিয়ম এবং তা থেকে নিঃসৃত সিদ্ধান্তের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক বর্তমান। এই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম স্বীকৃত নয়। ফলে এর থেকে নিঃসৃত হয় যে, নৈতিক নিয়ম এবং তা থেকে নিঃসৃত নৈতিক সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারিত। কর্মকর্তার স্বাধীন ইচ্ছা কেবলমাত্র প্রয়োজন অনুসারে নৈতিক নিয়মকে প্রয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। নিয়মগুলি যাচাই করার বা তার প্রয়োগ যোগ্যতা আছে কিনা তা বিচার করার স্বাধীনতা থাকবে না। আবার ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়, যথা ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, আবেগ, পরিস্থিতিরও কোন মূল্য থাকবে না। সেই কারণে নীতিনিষ্ঠ মতবাদে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে নৈতিক বাধ্যতাবোধের ধারণা গুরুত্ব লাভ করেছে। ব্যক্তি নিয়মকে অনুসরণ করতে নৈতিকভাবে বাধ্য থাকবেন। সকল ব্যক্তি নৈতিকতায় নৈতিক বাধ্যতাবোধের ধারণা থেকে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করলে সর্বজনীন সত্য বা বস্তুগত সত্যতা প্রতিষ্ঠা পাবে। ব্যক্তির নিকট নিয়মগুলি নিঃশর্ত অনুজ্ঞা (Categorical Imperative) রূপেই গৃহীত হবে। কান্ট তাঁর *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, গ্রন্থে শর্তযুক্ত অনুজ্ঞা এবং শর্তহীন অনুজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, ' If the action would be good solely as a means *to something else*, the imperative is *hypothetical*; if the action is represented as good *in itself*, and therefore as necessary, in virtue of its principle, for a will which of itself accords with reason, then the imperative is *categorical.*"[২৬] কান্টের মতে, শর্তযুক্ত অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে কর্মের লক্ষ্যরূপে ব্যক্তির কোন না কোন ইচ্ছা বা চাহিদার বিষয় বর্তমান থাকে। কিন্তু শর্তহীন অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা, চাহিদা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধে কর্ম সম্পাদন করায় তা নিঃশর্ত হবে। কান্ট এ কারণে বিচক্ষণতার নীতিকেও শর্তযুক্ত নীতি বলেছেন। কেননা তাঁর মতে, সকল

ব্যক্তিই বাস্তবিক সুখ চায়। যখন ব্যক্তি যুক্তিবুদ্ধি অনুসারে লক্ষ্য বস্তুকে নির্বাচন করে কোন নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে তখন ব্যক্তি যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা নির্বাচিত কর্মের লক্ষ্যরূপে সুখকেই প্রাধান্য দেবে অর্থাৎ সুখকেই লক্ষ্যবস্তুরূপে নির্বাচন করে। ফলে বিচক্ষণতার নীতি অনুসারে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের সুখকেই লক্ষ্য বস্তুরূপে নির্বাচন করে থাকে। এদিক থেকে বিচক্ষণতার নীতি বিশ্লেষণমূলক। কারণ ব্যক্তির ইচ্ছা বা ক্ষমতা হল বিচার বিশ্লেষণ করে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত লক্ষ্যবস্তুকে অধিগত করা। ফলে বিচক্ষণতার আদেশ আমাদের নৈতিক কর্মের আদেশ হতে পারে না। এই নীতি বস্তুগত দিক থেকে সত্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়। সুতরাং তাঁর মতে, বিচক্ষণতার নীতিকে পর্যবসিত করা যায় অভিমত (Consilia) রূপে, কখনই তা বুদ্ধির আদেশ হতে পারে না। কেননা এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজ আনন্দের বিষয় নিশ্চিতরূপে বর্তমান থাকে। সুতরাং এই নীতিকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শর্তহীন অনুজ্ঞা অনুসারে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আগ্রহ লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত না হওয়ায় এবং কর্তব্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করাই লক্ষ্য হওয়ায় তা নিঃশর্ত হতে বাধ্য। নৈতিক কর্মে ব্যক্তির ইচ্ছা হবে সদিচ্ছাজাত, যে ইচ্ছা কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নীতিকে অনুসরণ করবে।

ইচ্ছার প্রকৃতি

নৈতিকতায় এরূপ মতবাদ স্বীকার করলে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নীতি অনুসরণ করলে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা কী অর্থে প্রযোজ্য হবে? ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা কি কেবলমাত্র নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করার মনোভাবরূপেই চিহ্নিত হবে, না কি ইচ্ছার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যুক্ত হবে বৃহত্তর কোন ধারণা যা ব্যক্তিগত বিষয়কে নৈতিক আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করবে? বাস্তব পরিস্থিতিতে আমরা দেখি ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বার্থ পূরণের সাথে সাথে অপরের মঙ্গলের জন্যও কর্ম করে। ফলে ব্যক্তি বাস্তবে যখন ঐচ্ছিক কর্ম সম্পাদন করে তখন তার সেই ইচ্ছা বলতে কি বোঝায় এবং ব্যক্তি কোন ইচ্ছাটি নৈতিক সে বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যক্তির ইচ্ছার বিষয় প্রধানত দুইপ্রকারের হতে পারে—ব্যক্তির স্বার্থকেন্দ্রিক ইচ্ছা এবং পরার্থকেন্দ্রিক ইচ্ছা। ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকেই গুরুত্ব দিয়ে কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাকে আত্মকেন্দ্রিক ইচ্ছা বলতে হয়। এই ইচ্ছা আবার তাৎক্ষণিক ইচ্ছা হতে পারে অথবা স্থায়ী বা অপরিবর্তনশীল বিষয় হতে পারে। কোন কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ঐ কর্মের কারণ হতে পারে। যেমন, আমি গরমের দাবদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হটাৎ আসা বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা প্রকাশ

করতে পারি। আমার তাৎক্ষণিক ভাললাগার কারণে ঐ ইচ্ছা অনুসারে আমি সেই কর্ম সম্পাদন করতে পারি। আবার এমনও হতে পারে যে, ব্যক্তির ইচ্ছা তাৎক্ষণিক ভালোলাগার কারণে নয়, বরং দীর্ঘ অভ্যাসের কারণে ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। একজন ব্যক্তি এমন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন যে, তিনি প্রত্যহ সকালে গরম কফি পান করবেন। আবার কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিষয় পূর্ব পরিকল্পনাজাত হতে পারে। কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন কোন কর্ম সম্পাদন করে থাকেন তখন এমন হতে পারে যে, যে মুহূর্তে তিনি কর্ম সম্পাদন করছেন সেই মুহূর্তে তার ঐ কর্মের ক্ষেত্রে কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ উপস্থিত নেই। এমনও হতে পারে যে, সেই ব্যক্তির ইচ্ছা ঐ বিশেষ মুহূর্তে তার পূর্বপরিকল্পনার বিপরীতে অবস্থান করছে। যেমন মধুমেয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুস্থ থাকার লক্ষ্যে প্রভাতী নিদ্রাকে ত্যাগ করে প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ করছেন। এমন হতে পারে ব্যক্তির সেই মুহূর্তে তার চাওয়ার বিষয় ছিল অন্যকিছু। অর্থাৎ তিনি সকালে না উঠে তার প্রভাতী নিদ্রাকে বেশি প্রাধান্য দিতে চাইছেন। তা সত্ত্বেও সেই মুহূর্তের চাহিদা বা ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে এরূপ ব্যক্তি শয্যা ত্যাগ করার কালে নিজের ইচ্ছার বিপরীতে অবস্থান করে শারীরিক সুস্থতার কথা বিবেচনা করে প্রাতঃভ্রমণকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। অর্থাৎ কোন কর্মসম্পাদন করার ক্ষেত্রে সেই মুহূর্তের চাহিদা সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় না। ফলে বলা যায় ব্যক্তি কেবলমাত্র তার তাৎক্ষণিক স্বার্থকেন্দ্রিক ইচ্ছা পূরণের জন্যই কর্ম পালন করে এমন নয়। তার দীর্ঘ অভ্যাসজাত ইচ্ছা বা দীর্ঘ পরিকল্পনাজাত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

অপরদিকে কোন ব্যক্তি সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। কোন ব্যক্তি তার পরিবারের বা দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। এরজন্য তিনি তাঁর নিজের সুখ, ইচ্ছা বা চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, অর্থাৎ স্বার্থকেন্দ্রিক বিষয়কে উপেক্ষা করে পরিবারের বা দেশের উন্নতির লক্ষ্যে কর্ম করতে পারেন। পরিবারের পিতা যখন নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়ে সন্তানের উন্নতির জন্য কৃচ্ছ্রতাসাধন করেন তখন তার ঐ কর্মের ক্ষেত্রে তার স্নেহ, দায়িত্ববোধ প্রকাশ পায়, স্বার্থ প্রকাশ পায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্ম কোন একটি উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কৃত হলেও তার সেই কর্মের ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণ ইচ্ছা বা আগ্রহ বা সুখ বর্তমান থাকে না। যেমন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু বিপ্লবী তাঁদের নিজস্ব সুখ, ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েই শুধুমাত্র বিদেশী শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্যই নিজেদের এবং পরিবারের জীবন বিপন্ন করে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই সকল ক্ষেত্রে দেশকে স্বাধীন করাই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য বলে নির্ধারিত হয়েছে। এরূপ কর্মে

ব্যক্তির সামাজিকতার বোধ, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, দেশপ্রেম ইত্যাদি আবেগ উপস্থিত থাকায় ব্যক্তিস্বার্থকে অতিক্রম করে পরার্থপরতার লক্ষ্যে কর্ম সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। কেননা পরার্থপরতাই কর্মের লক্ষ্য বা কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। বলা যেতে পারে পরার্থবোধে কর্ম করার ইচ্ছাই হল নৈতিক ইচ্ছা যা ব্যক্তির নিকট নৈতিকবিধানরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং নৈতিক ইচ্ছা নিজ স্বার্থ দ্বারা চালিত বিষয় নয়, পরার্থপরতার দ্বারা চালিত ইচ্ছাকে নৈতিক ইচ্ছা বলতে হয়।

দেখা গেল নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছাকে বর্জন নয়, এর প্রকৃতি বিচারের প্রয়োজন। কেউ মনে করতে পারেন যে, কান্টও সদিচ্ছাকেই নৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে তাঁর মতে, যে ইচ্ছা নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত নীতি অনুসরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাই সদিচ্ছা। কিন্তু এখানে ইচ্ছার প্রকৃতি বিচার করার কথা বলা হয়নি। এখানে ইচ্ছার উদ্দেশ্যটিকে পরীক্ষা করার অর্থ হলো উদ্দেশ্যটি স্বার্থহীন কিনা তা বিচার করা। কান্ট এবং সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকেরা উভয়ই যদিও ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে বিচার করার কথা বলেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রকৃতি এই দুটি ক্ষেত্রে ভিন্ন। কান্টের মতে, ব্যক্তির কর্মকে তখনই ন্যায় সঙ্গত বলা যাবে যখন ব্যক্তি শর্তহীনভাবে নীতি পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নীতিকে অনুসরণ করবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি নিজস্ব চাহিদাকে অস্বীকার করে, প্রয়োজনে দমন করে নীতি অনুসরণ করে তবে সে কান্টের মতে নৈতিক ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিকেরা, যাঁরা ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, মনে করেন, আমাদের জীবনের লক্ষ্য নীতি অনুসরণ নয়, ভালো জীবনযাপন করা। ভালো দ্বন্দ্বহীন মানসিক অবস্থা বজায় রাখলে তবেই জীবন সহজ এবং সুন্দর হতে পারে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে আবেগ এবং বুদ্ধির দ্বন্দ্ব নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্যটি হবে এমনই যার মধ্যে আমাদের মানসিকতার প্রতিফলন ঘটবে এবং উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম পালনের দ্বারা মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকবে। সামাজিক জীবরূপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভালমন্দের ধারণা বর্তমান। এই ভাল-মন্দের নৈতিক অনুভূতিই আমাদের নৈতিক ইচ্ছার জন্ম দেয়। কোনরূপ নৈতিক অনুভূতি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধে কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এই যে নৈতিক অনুভূতি তা হল পরার্থপরতার অনুভূতি। এই বোধ ছাড়া বুদ্ধিপ্রসূত নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। নৈতিক কর্ম সম্পাদন করার সময়ে অন্তত এই বোধ থাকা প্রয়োজন যে, আমার কৃত কর্ম সামাজিক ন্যায় উৎপাদন করাবে। থমাস পিঙ্কের[১৭] মতে, সমাজে মঙ্গলের বিষয় হল সামাজিক চাহিদাজাত। সমাজের মঙ্গলের বা শুভের লক্ষ্যে সামাজিক সদস্যগণ বিবেচনা করে কোন বিষয়গুলি সমাজের জন্য শুভ বা মঙ্গল উৎপাদন

করবে। সেই বিষয়গুলি সামাজিক সদস্যগণ সমাজের মঙ্গলের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে। নৈতিক মঙ্গলের বিষয়টি নির্ধারিত হয় সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির পরমশুভ বা পরমমঙ্গল সম্পর্কে ধারণার দ্বারা। প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক ইচ্ছা হল পরমমঙ্গলকে বাস্তবায়িত করা। যেহেতু লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের ধারণাটি প্রতিফলিত হয় তাই উদ্দেশ্য গঠনে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়। ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা কেবলমাত্র তার নিজস্ব ইচ্ছাকে সার্বিক ইচ্ছায় পরিণত করার মধ্যেই নিহিত থাকে না। তার ইচ্ছা কোনটি শুভ তা তার বিচক্ষণতা, নৈতিক অনুভূতির প্রয়োগে নির্ণয় করে। সুতরাং ব্যক্তির আবেগকে উপেক্ষা করে নয়, আবেগকে দমন করে নয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি বুদ্ধির সাথে আবেগের সামঞ্জস্য বিধান করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে।

নীতি অনুসরণই যথেষ্ট নয়

কান্ট মনে করেছিলেন, কোন নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা একটি বিশেষ প্রকার বাধ্যতাবোধ অনুভব করি, যা আমাদের নীতি নির্ধারিত কর্মটিকে আবশ্যিকভাবে পালনে বাধ্য করে। ফিলিপা ফুট একে 'binding force' বলেছেন। কিন্তু এর বিরোধিতা করে ফিলিপা ফুট বলেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক কর্ম সম্পাদন করি যেখানে কোন কর্ম উচিত বলে অনুভূত হলেও আমরা সেই কর্ম সম্পাদন না করতে পারি। সেই কর্ম সম্পাদন না করার পশ্চাতে পর্যাপ্ত যুক্তি বর্তমান থাকে। ব্যক্তির উচিতার্থক কর্ম না সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে ব্যক্তির মতামতকে স্বীকৃতি প্রদান করি। কোন সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে সাহায্য করা উচিত বলে মনে হলেও কোন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, যেমন কোন আতঙ্কবাদীকে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে সাহায্য করতে অস্বীকার করে তখন তার ঐ যুক্তির গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। ফলে নৈতিকতার বিষয় এমন নয় যে, উচিত মানেই তা সম্পাদন করতে বাধ্য থাকতে হবে, কেননা তা ন্যায় উৎপাদন করাবে। নৈতিকতায় ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের নির্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করা সম্ভব নয়। এমন অনেক কর্ম আছে যা উচিত কর্ম বলে অনুভূত হলেও তা মন্দ বিষয়কে প্রতিফলিত করে। আবার ভাল কর্ম বলে অনুভূত হলেও তা উচিত কর্ম নাও হতে পারে। নৈতিকতায় এমন কর্ম সম্পাদন করা অনুমোদনযোগ্য কর্ম বলে বিবেচিত হয় যা প্রশংসার যোগ্য বা ভাল বা মহৎ কর্ম বলা হয়। এমন কর্মকে জুলিয়া ড্রাইভার Supererogatory[২৮] কর্ম বলেছেন। কিন্তু সেই কর্ম সম্পাদন না করলেও ব্যক্তিকে মন্দ ব্যক্তি বা ব্যক্তির কর্মকে মন্দ কর্ম বলা সঙ্গত নয়। অর্থাৎ কর্মটি ভাল

হলেও কর্তব্য কর্ম নাও হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পের শেষ পর্বে মিনির বাবা রহমত কাবুলিওয়ালাকে মিনির বিবাহ খরচের কিছুটা টাকা রহমতকে প্রদান করেন তার দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। এক্ষেত্রে মিনির বাবার ঐরূপ অর্থ প্রদানরূপ কর্মকে অনুমোদনযোগ্য কর্ম বা প্রশংসাসূচক কর্ম বলা হয়। কিন্তু তিনি যদি রহমতকে সাহায্য না করেন তাহলে তাঁর কর্মকে অকর্তব্য কর্ম বলাও সঙ্গত হবে না। ফলে প্রশংসনীয় হলেও মিনির বাবার ঐরূপ কর্মকে কর্তব্য আখ্যা দেওয়া হয় না। আবার এমন কর্মও আছে যা নৈতিক দিক থেকে অনুমোদনযোগ্য কর্ম হলেও তা মন্দ বা খারাপ ফল উৎপাদন করে। অর্থাৎ উচিত কর্ম হলেও তা মন্দ ফল উৎপাদন করে। যেমন ধরা যাক, মৃত্যুপথযাত্রী কোন নিকট আত্মীয়ের বিশেষ গ্রুপের রক্ত তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে সেই গ্রুপের রক্ত জোগাড় করা বাস্তবিক সম্ভব হচ্ছে না কেননা সর্বত্র খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ঐ বিশেষ গ্রুপের রক্ত কোথাও সেই মুহূর্তে সংরক্ষিত নেই। কিন্তু আমার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে ঐ বিশেষ মৃত্যুপথযাত্রী আত্মীয়ের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু আমার শারীরিক সুস্থতা না থাকার কারণে আমার পক্ষে বিপদজনক এবং সেই কারণে অনুচিত। সেজন্য যদি আমি আমার রক্ত দিতে অস্বীকার করি তাহলে আমার এরূপ কর্মকে অনুমোদন করা হলেও বাস্তবিক মন্দ ফল উৎপাদন করবে। কারণ রক্ত না পাওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তির জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। এরূপ কর্মকে Suberogatory বলা হয়। আবার Countererogatory কর্ম হল এমন কর্ম যা উচিত কর্ম না হয়েও ভালো ফল উৎপাদন করে যা ভাল কর্ম বলে পরিগণিত হয়। যেমন একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের শারীরিক উন্নতির জন্য তার নেশাকারী বস্তুর বিষয়কে খানিকটা কমিয়ে দিলেন। এরূপ ব্যক্তির কর্মকে অনুমোদন করা না হলেও তার শারীরিক উন্নতির জন্য ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠাকে অবশ্যই ভাল কর্ম বলতে হবে। সুতরাং নৈতিক ক্ষেত্রে উচিত কর্ম মানেই তা ভাল এবং অনুচিত কর্ম মানেই তা মন্দ—এরূপ সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করা সমীচীন নয়। উচিত কর্মের পশ্চাতে ব্যক্তির পর্যাপ্ত যুক্তি, ব্যক্তির উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, পরিস্থিতিসাপেক্ষ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির সাপেক্ষে ব্যক্তির নৈতিক ঔচিতার্থক কর্ম নির্ধারিত হয়। নীতি অনুসরণ করে আবশ্যিকভাবে কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি প্রদত্ত যুক্তিগুলির যাথার্থতা বিচার করাও প্রয়োজন।

উপরোক্ত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করবেন নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা। কেননা তাঁদের মতে নৈতিকতায় ঔচিত্যবোধে কর্ম করার অর্থ নীতির প্রতি বাধ্যতাবোধে কর্ম করা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির পর্যাপ্ত যুক্তি কোন ক্ষেত্রে নীতির বৈধতাকে লঙ্ঘন করতে সক্ষম নয়। নিয়মগুলি বিচারবিবেচনার ঊর্ধ্বে, ব্যক্তি সেগুলির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন না, বরং নৈতিক নিয়মগুলিকে অনুসরণ করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন

করতে বাধ্য থাকবেন। কোনরূপ ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয় নীতির মহিমাকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। ফলে ব্যক্তি নিঃশর্তভাবে ঐ নিয়মকে অনুসরণ করে, যার জন্য নৈতিক নিয়মের এক বিশেষ মর্যাদা ও আবশ্যিকতা আছে বলে নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা দাবি করেন। ব্যবহারিক জীবনে, ন-নৈতিক ক্ষেত্রে এমন অনেক নীতি আছে যেগুলিকে মান্য করতে ব্যক্তি বাধ্য থাকেন। সেই নীতি লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পর্যাপ্ত যুক্তি থাকলেও সেই নীতির আবশ্যিকতাকে লঙ্ঘন করা যায় না। যেমন, ক্লাব পরিচালনার নীতি। ক্লাবের কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য ক্লাবের নিজস্ব কিছু নিয়ম থাকে, যে নিয়মগুলি ক্লাবের সকল সদস্য বিনা বিচারে মান্য করতে বাধ্য থাকেন। কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্লাবের সদস্য হলেই তাকে ক্লাবের নিয়ম মান্য করতে হয়। ক্লাবের কোন নিয়মের বিরুদ্ধে সদস্যদের অভিযোগ থাকতেই পারে, অর্থাৎ নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পর্যাপ্ত যুক্তি থাকতেই পারে। কিন্তু ক্লাবের নিয়ম সদস্যদের কাছে আবশ্যিকভাবে পালনীয় বলে ধার্য হয়। যেমন ২০১৪ সালে কলকাতার বিখ্যাত অভিজাত 'Calcutta Club'—এর বস্ত্র পরিধানের (Dress Code) নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কোন সদস্য বিরোধিতা করেন।[২৯] 'ক্যালকাটা ক্লাব' বহু প্রাচীন এবং সেখানে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রচলিত "Colonial Dress" পরিধানের রীতি আজও নিয়মরূপে বলবৎ রাখা হয়েছে। কিন্তু ২০০২ সালে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শুভাপ্রশন্ন মজুমদার এবং বিখ্যাত ফুটবলার চুনী গোস্বামীকে কুর্তা পাজামা পরে ক্লাবে ঢুকতে না দেওয়ায় এঁরা বর্তমান ভারত সরকারের নিকট লিখিত অভিযোগ জানান। এছাড়া চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন, বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক আনন্দশংকর, বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ক্লাব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পোশাক না থাকার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের ক্লাবে প্রবেশাধিকারকে অস্বীকার করেন। ক্লাবনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ব্রিটিশ সদৃশ পোশাক পরিধানই ক্লাবে প্রবেশের শর্তরূপে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে বাঙ্গালী পোশাক অস্বীকৃত হয়। অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ক্লাব নির্ধারিত পোশাক পরিধানের নিয়মের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল যুক্তি ক্লাবের নিয়মকে লঙ্ঘন করতে ব্যর্থ হয়। কেননা ক্লাবের নিয়ম ক্লাবের সকল সদস্যদের নিকট প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে ক্লাবের নিয়মকে শর্তহীন নিয়ম বলা উচিত হবে। এই শর্তহীন নিয়মের প্রতি বাধ্যতাবোধ প্রদর্শনে কর্ম করাকে শর্তহীন অনুজ্ঞাই বলতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কোন ব্যক্তি ক্লাবের নিয়মকে যদি মানতে অনিচ্ছুক হন তাহলে তিনি ঐ বিশেষ ক্লাবের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারেন। অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট বিকল্প পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু এমন অনেক ন-নৈতিক ক্ষেত্র আছে যেখানে ব্যক্তির সম্মুখে বিকল্প পথ থাকে না। ব্যক্তি ঐ বিষয় মান্য করতে বাধ্য থাকেন। যেমন- শিষ্টাচারের নিয়ম। ব্যবহারিক জীবনে সমাজের সদস্যগণ শিষ্টাচারের নিয়মকে অলঙ্ঘনীয়রূপে

গ্রহণ করে। আমরা একে অপরের সঙ্গে ভদ্রতাবোধের নিয়ম অনুযায়ী পরস্পরকে অভিবাদন করি। একজন অপরিচিত ব্যক্তির হাস্যময় ইঙ্গিতের প্রতিক্রিয়ায় আমরা প্রত্যুত্তরে হাসি বিনিময় করি। একে অপরকে না জানলেও পারস্পারিক সৌহার্দ্যের জন্য আমরা শিষ্টাচার প্রদর্শন করি। সমাজে বসবাসকারী প্রায় প্রত্যেকেই অপরের সঙ্গে ভদ্রতা প্রদর্শন করি। কিন্তু এমন হতেই পারে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করলেন না এবং তার ঐরূপ আচরণের সপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি প্রদর্শন করলেন। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির ঐরূপ আচরণকে বৈধ আচরণ বলা হয় না। কেননা শিষ্টাচারের নীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তির কোন ভূমিকা নেই। ব্যক্তি সমাজের অংশীদাররূপে শিষ্টাচারের নীতিকে প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবেন। একইভাবে নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি নৈতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। নৈতিক জগতের সদস্যরূপে নৈতিক নিয়মগুলিকে ব্যক্তি প্রশ্নাতীতভাবে মান্য করতে বাধ্য থাকেন। এখানে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো, সত্যিই কি নৈতিক নিয়মগুলির পশ্চাতে কোন পর্যাপ্ত যুক্তি নেই? নিয়মগুলি কি আকারসর্বস্ব? নৈতিক নিয়মগুলি কি নিঃশর্ত আদেশ—যা অনুসরণ করতে ব্যক্তি আবশ্যকতা বা বাধ্যতাবোধ অনুভব করেন?

সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিক ফিলিপা ফুটের[৩০] মতে, নৈতিক ক্ষেত্রে যে নৈতিক নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে আমরা আচরণ পালন করি, তার পশ্চাতে বর্তমান আমাদের প্রথাগত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থাকার জন্যই আমরা সকলে শিষ্টাচারের নীতি বা ভদ্রতার নিয়মকে বিনা বিচারে মান্য করি। সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা রূপায়ণের জন্য সমাজের প্রতিটি সদস্য নিজেরা মিলিতভাবে নৈতিক নিয়মকে প্রণয়ন করেছেন। প্রত্যেকে সদিচ্ছায় ঐ নিয়মগুলিকে তৈরি করেছি। সমজের মঙ্গলের জন্য, নৈতিক আচরণের উন্নয়নের জন্য। আমি নিজেও ঐ নিয়মের অংশীদার। ফলে যে নিয়মকে আমি নিজেই প্রণয়ন করেছি অকারণে সেই নিয়মকে ভঙ্গ করার কোন প্রশ্ন আসে না। আমার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাই আমাকে ঐ নিয়মকে মান্য করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে ঐ নিয়মগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচিত বলেই গণ্য করে তা সম্পাদন করি। সেক্ষেত্রে নিয়মগুলিকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকি। এখানে নিয়মের প্রতি বাধ্যতাবোধের অর্থ আমার স্বইচ্ছাপ্রসূত বাধ্যতাবোধ বা দায়বদ্ধতাবোধ। এই বাধ্যতাবোধ কখনই ব্যক্তির উপর বলপূর্বক ধার্য নয় বা নৈতিক নীতি বাধ্যতাবোধবশত সম্পাদন করার বিষয় নয়। আমার তৈরি নিয়মের প্রতি আমার ইচ্ছাপ্রসূত নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকেই তাকে অনুসরণ করি। এক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মগুলি Instrument অর্থে গ্রহণ করা হয়। কেননা আমাদের প্রয়োজন, চাহিদা, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নৈতিক নিয়মগুলিকে প্রণয়ন করি এবং সেগুলিকে অনুসরণ করি। ফলে নৈতিক নিয়মগুলির পশ্চাতে পর্যাপ্ত যুক্তি

বর্তমান। এই নিয়মগুলিকে প্রণয়ন করার পশ্চাতে যুক্তি হল সামাজিক বন্ধন। একই নৈতিক সমাজের সদস্যরূপে ভাল-মন্দ সম্পর্কে নৈতিকবোধ সকলের মধ্যেই বর্তমান থাকে। পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ফলে যে মানবিক বন্ধন হয় তাকে স্বীকার করেই নৈতিকতার বোধ গড়ে ওঠে। ফলে বলা যায়, নৈতিক ক্ষেত্রে যে অনুভূতি উদ্দেশ্যরূপে থাকে তা হল একে অপরের প্রতি যত্নশীল হওয়া। এই বোধ থেকেই আমাদের মধ্যে কর্তব্যবোধের জন্ম হয়, যার জন্য নৈতিকতার বিষয় সম্পাদন না করে সমাজে বসবাস করা যায় না। সেখানে নৈতিকতার বিষয় পালন করার জন্য কোন বাহ্যিক বাধ্যতাবোধ থাকে না, বরং নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরূপে আমাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করার মানসিকতা থেকেই আমরা নৈতিক কর্ম সম্পাদন করাকে আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করি। অন্যের দুঃখে সহানুভূতিশীল হওয়া এবং অপরকে সাহায্য করার মানসিকতাই আমাদের মধ্যে কর্তব্যবোধের ধারণাকে জাগ্রত করে। কিন্তু অপরকে দয়া দেখানোর জন্য বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য কর্তব্য কর্ম করা হয় না, বরং সকলের মঙ্গলের লক্ষ্যে কর্ম করা হয়। ফিলিপা ফুটের মতে, 'নৈতিক অনুভূতি' থেকেই আমরা নৈতিককর্ম সম্পাদন করি। কোনরূপ নৈতিকবোধ শূণ্যভাবে বাধ্যতাবোধ বা ঔচিত্যবোধের ধারণাকে প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিঃশর্ত আদেশ বশত কর্ম সম্পাদন করা নয়, নৈতিক আদেশের প্রতি বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতার অর্থ হল সমাজের মঙ্গলের প্রতি দায়বদ্ধতা।

ব্যক্তির এই নৈতিক অনুভূতির উৎস হলো সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণা। সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার উৎস দুটি। প্রথমত ঐতিহ্য, সংস্কার—যা পূর্বকাল থেকে প্রাপ্ত। সামাজিক ধ্যানধারণাগুলি আমরা লাভ করি আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে, সামাজিক ঐতিহ্য থেকে। এভাবেই আমরা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন মানবিক গুণগুলি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি। যেহেতু সমাজ থেকেই আমরা এই ভালোমন্দের ধারণাগুলি অর্জন করি সেহেতু বলা যায় আমাদের মানবিকতার বোধটি, চারিত্রিক গুণগুলি সমাজের ধ্যান ধারণার অনুরূপ। সমাজের এই প্রথা, রীতিনীতি, যেগুলি পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্ণীত এগুলিকেই এ্যানস্কোম্ব 'norms of a society'[৩১] বলেছেন। ব্যক্তি সমাজের অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় মানসিক অনুভূতি বা আবেগের যেমন, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। এই নৈতিকবোধ আমরা সমাজের 'norms 'বা প্রথা থেকেই পেয়ে থাকি, এবং এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেই নৈতিক জীবনে উৎকর্ষ সাধন করি। সুতরাং নৈতিক ক্ষেত্রে আনুগত্য প্রদর্শন বা দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। তাই কান্ট বর্ণিত বাধ্যতাবোধকে অস্বীকার করে তিনি বলেন, " One cannot be impressed by this idea if one reflects what the 'norms' of

a Society can be like."[৩২] সুতরাং নৈতিক কর্মে আমাদের দায়িত্ববোধ হল সমাজের থেকে জন্ম নেওয়া স্বীকৃতিবোধ। কেননা আমাদের পূর্বপুরুষরা সমাজের মঙ্গলের লক্ষ্যে ঐ সমস্ত রীতিনীতি বা প্রথাকে সম্মিলিতভাবে স্বীকৃতি দিয়ে গড়ে তুলেছেন। দ্বিতীয়ত প্রাচীন ঐতিহ্য বা আদর্শ সম্পূর্ণই যে বর্তমান যুগে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় হবে তা নয়। ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে ঐ নিয়ম, প্রথা, আদর্শগুলি যাচাই করে এবং বর্তমানের উপযোগী করে সেগুলিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষ যুক্তি দ্বারা ঐতিহ্যগুলি যাচাই করে নতুন ধ্যানধারণাকে যে গঠন করে তা সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্যবর্জিত নয়। বর্তমান সমাজের প্রয়োজন সাধনের জন্য সেগুলিকে পরিমার্জন করে। ফলে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, ইচ্ছা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে ঐ সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে। সুতরাং সামাজিক নীতিগুলি যেহেতু সমাজের প্রয়োজনপূরক এবং ব্যক্তির যুক্তি দ্বারা সমর্থিত, স্বীকৃত সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি ঐগুলিকে অনুসরণ করে। কেননা ঐ সামাজিক নীতিগুলি হল আমাদের নৈতিক বিশ্বাস। ফলে ব্যক্তি যেহেতু তার নিজের যুক্তির দ্বারা প্রথা, বিশ্বাসগুলি প্রতিষ্ঠা করে তাই তার স্বনির্ধারিত রীতি বা প্রথাগুলি অনুসরণ করার প্রতি সে একপ্রকার দায়বদ্ধতা অনুভব করে।

এই কারণেসদ্‌গুণ সম্পন্ন নীতিদার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি বা আত্মার উৎকর্ষময় জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সমস্ত দার্শনিক মতে ব্যক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়মের প্রতি বাধ্যতাবোধে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন না, বরং ব্যক্তি নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নয়, বরং ব্যক্তির সামগ্রিক ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েই ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে। যেহেতু ব্যক্তির আবেগ বিচারমূলক, সেহেতু ব্যক্তি আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হবে। ব্যক্তির জীবন থেকে আবেগকে বর্জন করলে নৈতিকতায় ব্যক্তির আংশিক সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হবে। একটি ফুলের থেকে সৌন্দর্য ও গন্ধকে বর্জন করলে যেরূপ ফুলের আকারকেই সুন্দর বলা যায় না, তেমনই নৈতিকতায় ব্যক্তির আবেগকে বর্জন করে কেবলমাত্র বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিলে নৈতিক কর্ম পালন করা যায়, নৈতিকতার মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। এ্যানস্কোম্ব এ কারণে বলেন 'Such a man may or may not be able to apprehend 'a moral beauty and nobility' in the action, that he is obliged to do and he may or may not be moved to act by this beauty.'[৩৩] সুতরাং বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের কোন বৈপরীত্য নেই। ব্যক্তির বুদ্ধি ও আবেগ উভয়ের অবস্থানেই ব্যক্তি

জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তোলে। আবেগ, অনুভূতি ব্যতীত কর্মকর্তার জীবন যন্ত্রের সদৃশ হবে। ব্যক্তির মূল্যবোধ ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে বলেই ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। ব্যক্তির চরিত্রের যে সব গুণগুলির জন্য বা আবেগের জন্য আমরা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হই সেইসব গুণের সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানই ব্যক্তির মূল্যবোধ গঠন করে। সাহসিকতা, সহমর্মিতা, পরোপকারিতা, উদারতা—এই সব আবেগগুলি ব্যক্তি সম্পর্ক গঠন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুণগুলি সদ্‌গুণ, এই গুণগুলিকে আমরা শ্রদ্ধা করি। এই গুণগুলিকে উপেক্ষা করলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ককে উপেক্ষা করতে হয়। ফলে সামাজিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করলে সমাজকেই উপেক্ষা করতে হয়। এই গুণগুলি নৈতিক ব্যক্তির মধ্যে প্রবণতারূপে থাকে বলেই ব্যক্তি নৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে কর্ম পালন করার তাগিদ অনুভব করে।

সুতরাং সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিদার্শনিকগণ নৈতিককর্ম সম্পাদনের কেবলমাত্র ক্ষেত্রে বুদ্ধিপ্রসূত নীতিকে অগ্রাহ্য করছেন। কেননা সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিককর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। যিনি সদ্‌গুণের অধিকারী তাঁর মানসিক অবস্থা স্থির ও দ্বন্দ্বহীন। তিনি বুদ্ধি ও আবেগের মধ্যে সুসামঞ্জস অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম। ফলে আবেগকে দমনের বা বর্জনের কোন প্রশ্ন নেই বরং ব্যক্তিগত অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়েই ব্যক্তি নৈতিককর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। কেননা আমার নৈতিকতার বোধ কেবলমাত্র আমার আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ নয়। এই বোধ বিচারমূলক। সে কারণেই ব্যক্তি কোনটি মঙ্গল বলে লক্ষ্য হবে এবং কোনটি অমঙ্গল বলে ত্যাজ্য হবে তা নির্ধারণে সক্ষম। সদ্‌গুণ ব্যক্তিগত গণ্ডীর সীমাকে অতিক্রম করে সর্বজনীনতাকে স্পর্শ করতে সাহায্য করে। সুতরাং নৈতিকতায় ব্যক্তিসাপেক্ষতা আছে, যেহেতু আবেগের পরিতৃপ্তির মাধ্যমেই ব্যক্তি তার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। ব্যক্তি তার লক্ষ্য নির্বাচন করবে পরিস্থিতির সাপেক্ষে। ফলে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিস্থিতিকে বিচার করবেন এবং কোন পরিস্থিতিতে কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি নিজেই নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যেহেতু নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন সেহেতু নৈতিকতায় বাধ্যবাধকতার ধারণা অপ্রাসঙ্গিক ও পরিত্যাজ্য।

তথ্যসূত্র

১। ম্যাকিনটায়ার, এ্যালেসডায়ার, ১৯৯৭

২। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৬৪, পৃ ৫৭

৩। প্যালি, উইলিয়ম, ১৮০২

৪। দাস, রাসবিহারী, ১৯৯৫, পৃ ১৭৪

৫। ঐ, পৃ ১৭৫

৬। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৭১, পৃ ১৭

৭। উইলিয়ামস, বার্ণাড, ১৯৯৭, পৃ ৫৪

৮। ডেভিড, বস্টক, ২০০০, পৃ ১১

৯। উইলিয়ামস, বার্ণাড, ১৯৯৭

১০। স্লুট, মাইকেল, ১৯৯৭

১১। সিং, কালীপ্রসন্ন, পৃ ৩০৭

১২। উইলিয়ামস, বার্ণাড, ২০০৬, পৃ ২০০

১৩। ঐ, পৃ ২০০

১৪। সলোমন, ডেভিড, ১৯৯৭, পৃ ১৭৪

১৫। ডেভিড, বস্টক, ২০০০, পৃ ৪০

১৬। হিউম, ডেভিড, ২০০০, পৃ ২০৬

১৭। ডেভিড, বস্টক, ২০০০, পৃ ২০০

১৮। ফুট, ফিলিপা, ১৯৯৭

১৯। আনা, জুলিয়া, ২০০৭

২০। হার্স্টহাউস, রোসালিণ্ড, ২০০৭, পৃ ৭০৬

২১। কুইলিয়ান, এফ. উইলিয়াম, ১৯৪৯, পৃ ৪৫

২২। হার্স্টহাউস, রোসালিণ্ড, ২০০৭, পৃ ৭০৬

২৩। কোনলে, সারা, ১৯৪৫, পৃ ২৮১

২৪। ঐ, পৃ ২৮২

২৫। ঐ, পৃ ২৮৬

২৬। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৭৮, পৃ ৭৮

২৭। পিঙ্ক, থমাস, ২০০৪

২৮। ড্রাইভার, জুলিয়া, ১৯৯২, পৃ ২৮৮

২৯। কলকাতা ক্লাব, ২০১৪

৩০। ফুট, ফিলিপা, ১৯৭২

৩১। এ্যানস্কোম্ব, জি. ই. এম, ১৯৫৮, পৃ ১৩

৩২। ঐ, পৃ ১৩

৩৩। ঐ, পৃ ১৭

সূত্রনির্দেশ

১। আনা, জুলিয়া (২০০৭), ‘ বিয়িং ভারচুয়াস এণ্ড ডুয়িং দি রাইট থিংস’, লানডাউ রুস সেফার সম্পাদিত, *এথিক্যাল থিওরী,* এন এ্যাম্থোলজি, ব্ল্যাকওয়েল পাবলিসিং, ইউ এস এ

২। উইলিয়ামস, বার্ণাড (১৯৯৭), ‘মরালিটি, দি পিকিউলিয়ার ইনস্টিটিউশান’, ক্রিস্প রজার এবং স্লট মাইকেল সম্পাদিত *ভারচু এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

৩। উইলিয়ামস, বার্ণাড, (২০০৬), *এথিক্স এণ্ড দি লিমিটস অফ ফিলোজফি,* রুটলেজ, লণ্ডন

৪। এ্যানস্কোম্ব, জি. ই. এম (জানুয়ারী, ১৯৫৮), ‘মডার্ন মরাল ফিলজফি’, *ফিলোজফি,* ভলিউম-৩৩, নং-১২৪, পৃ ১-১৯

৫। কলকাতা ক্লাব, *দি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পাবলিসড, জুলাই ১৮, ২০১৪, ১১।২২ সকাল

৬। কান্ট, ইমানুয়েল, (১৯৬৪), *গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দি মেটাফিজিক্স অফ মরালস,* (ট্রান্স) এইচ, জে পাটন, হারপার এণ্ড র পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক

৭। কান্ট, ইমানুয়েল, (১৯৭১), *দি মেটাফিজিক্স অফ মরালস,* গ্রেগর মেরী, (ট্রান্স) পেনসেলভানিয়া প্রেস, ফিলাডেলফিয়া

৮। কান্ট, ইমানুয়েল, (১৯৭৮), *গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দি মেটাফিজিক্স অফ মরালস,* প্যাটন, এইচ, জে অনূদিত বি, আই পাবলিকেশন, কলিকাতা

৯। কুইলিয়ান, এফ. উইলিয়াম, (অক্টোবর, ১৯৪৯), ‘দি প্রবলেম অফ মরাল অবলিগেশন’, *এথিক্স,* ভলিউম-৬০, নং-১, পৃ ৪০-৪৮

১০। কোনলে, সারা, (অক্টোবর, ১৯৪৫), ‘দি অবজেকটিভিটি অফ মরালস এণ্ড দি সাবজেকটিভিটি অফ এজেন্ট’, *আমেরিকান ফিলোজফিক্যাল কোয়াটার্লি,* ভলিউম-২২, নং-৪, পৃ ২৭৫-২৮৬

১১। ডেভিড, বস্টক, (২০০০), *এ্যারিস্টটল’স এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

১২। ড্রাইভার, জুলিয়া, (১৯৯২), ‘দি সাবেরোগেটরি’, *অস্টালাসিয়ান জার্নাল অফ ফিলোজফি,* ভলিউম-৭০, পৃ ২৮৬-২৯৫

১৩। দাস, রাসবিহারী, (১৯৯৫), *কান্টের দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা

১৪। প্যালি, উইলিয়ম, (১৮০২), *ন্যাচারাল ফিলোজফি,* পার্কার প্রেস, ফিলাদেলফিয়া

১৫। পিঙ্ক, থমাস, (২০০৪), *দি উইল এন্ড হিউম্যান একস্যান্স: ফ্রম এ্যান্টিকুইটি টু দি প্রেজেন্ট ডে,* রুটলেজ, নিউ ইয়র্ক

১৬। ফুট, ফিলিপা, (১৯৯৭), ‘ভারচুস এ্যাণ্ড ভাইসেস’, ক্রিস্প, রজার এবং স্লট, মাইকেল সম্পাদিত *ভারচু এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৭। ফুট, ফিলিপা, (জুলাই, ১৯৭২), ‘মরালিটি এজ এ হাইপোথিটিক্যাল ইমপারিটিভস’, *দি ফিলোজফিক্যাল রিভিউ*, ভলিউম-৮১, নং-৩, পৃ ৩০৫-৩১৬

১৮। ম্যাকিনটায়ার, এ্যালেসডায়ার, (১৯৯৭), ‘দি নেচার অফ দি ভারচুস’, রজার ক্রিস্প এবং স্লট, মাইকেল সম্পাদিত *ভারচু এথিক্স*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৯। সলোমন, ডেভিড, (১৯৯৭), ‘ইনটারনাল অবজেকশনস টু ভারচু এথিক্স’, স্ট্যাটম্যান, ডানিয়েল সম্পাদিত *ভারচু এথিক্স*, এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, এডিনবার্গ

২০। সিং, কালীপ্রসন্ন, (ট্রান্স), *মহাভারত*, শাখারত প্রকাশন, কলিকাতা, ভলিউম-৪

২১। স্লট, মাইকেল, (১৯৯৭), ‘ফ্রম মরালিটি টু ভারচু’, স্টাটম্যান, ডানিয়েল সম্পাদিত *ভারচু এথিক্স*, এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবার্গ

২২। হার্স্টহাউস, রোসালিণ্ড, (২০০৭) ‘নরমাটিভ ভারচু এথিক্স’, লানডাউ রুস শেফার সম্পাদিত *এথিক্যাল থিওরীঃ এ্যান এ্যানথোলজি*, ব্লাকওয়েল পাবলিশিং, ইউ কে

২৩। হিউম, ডেভিড, (২০০০), নরটন এন্ড নরটন সম্পাদিত *ট্রিটিজ অফ হিউম্যান নেচার*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

চতুর্থ অধ্যায়

আবেগ গ্রহণীয় না বর্জনীয়

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে লক্ষ্য করেছি, অনেক দার্শনিকই নৈতিকতায় কেবলমাত্র বুদ্ধিকেই গুরুত্ব দিয়ে আবেগ, ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদি ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার পক্ষপাতী। তাঁরা কেন আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্র থেকে বর্জন করতে চেয়েছেন সেকথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই এই অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন দার্শনিক প্রদত্ত সেই সকল যুক্তিগুলি উত্থাপন করবো যার ভিত্তিতে দার্শনিকেরা আবেগের ব্যবহারকে নৈতিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন। বিপরীতপক্ষে আমরা একথাও লক্ষ্য করেছি যে, সদ্‌গুণের প্রতি আস্থাশীল দার্শনিকেরা আবেগকে নৈতিক কর্ম পালনের জন্য সহায়ক বলে মনে করেন। সেই কারণে তাঁরা ব্যক্তির নৈতিক মনস্তত্ত্বের বিচার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে এবং নীতি সর্বস্বতার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অধ্যায়ে আমি এই দুটি ভিন্ন দার্শনিক মতেরই উল্লেখ করব। আমার উদ্দেশ্য হলো আবেগের স্বরূপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা গঠন, যার ফলে আবেগের ব্যবহার সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট চিত্র গঠন করা সম্ভব হবে। তাই এই অধ্যায়টিকে আমি দুটি পর্বে বিভক্ত করেছি। প্রথম ভাগে আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করার যুক্তিগুলি আলোচনা করবো এবং দ্বিতীয় ভাগে সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকদের আবেগের সমর্থনে উত্থাপিত মতামতগুলি উল্লেখ করব।

সাধারণ মতানুসারে আবেগ বলতে যুক্তিহীন নিছক অনুভূতিকে বোঝায়। ফলে আবেগ হল অজ্ঞানাত্মক। বাহ্যজগতের বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আবেগের প্রকাশ ঘটে থাকে। যেমন, সাপ সম্পর্কে ভীতিজনক অভিজ্ঞতার কারণে সাপ সদৃশ কোন বস্তু দেখলেই ভয়ের উদ্রেক ঘটে। ফলে দড়িকে সাপ বলে ভুল করার কারণে আমরা সেইরূপ আচরণ করি। সেক্ষেত্রে কোনরূপ যুক্তিবিচার ব্যতীতই ঐ বস্তুটি দেখে আমরা ভীত হই। আবেগের কারণেই আমরা তাৎক্ষণিক এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বিচারবিবেচনার কোন অবকাশ থাকে না। আবার আবেগ একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় বলে কোন নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ব্যক্তির আবেগ প্রকাশিত হয় বলে আবেগের ব্যবহার সর্বদাই পক্ষপাতমূলক। যে বস্তুটি সম্পর্কে ব্যক্তির অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকে সেই বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তির ভয় বা ক্রোধের প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি ঐ জাতীয় বস্তু থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছুক হয়। আবার কোন বস্তু সুখদায়ক অভিজ্ঞতার উৎপাদক হলে ব্যক্তি এই বিষয়টির প্রতি ধাবিত হয়। বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তিমনের পছন্দ-অপছন্দ

যুক্ত থাকায় আবেগ পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তকে নিঃসৃত করে। ফলে আবেগজাত বিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ইস্টবেঙ্গলপ্রেমী দর্শকগণ ইস্টবেঙ্গল গোল করলে উত্তেজিত ও আনন্দিত হন। বিরোধী দল জয়ী হলে তাদের মধ্যে বিপরীত আবেগ লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে খেলার উৎকর্ষতা, ক্রিয়াকৌশলের প্রখরতা, কৃতিত্বকে সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করে পছন্দ অনুসারে সমর্থন করার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। বিপরীত আবেগের প্রকাশ অনুসারে বিজয়ী ও পরাজিত দলের সমর্থকদের মনে হর্ষ ও বিষাদের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আবেগ একান্ত ব্যক্তিগত হওয়ায় ভয়, ভালোবাসা, আনন্দ ইত্যাদি আবেগের মাত্রাগত পার্থক্য নির্ধারক মানদণ্ড নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

এ সকল কারণের জন্যই বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা আবেগকে নৈতিকতার বিরোধী বলে মনে করেন। কারণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ ব্যক্তিস্বার্থপূরণে রত থাকায় নৈতিকতার মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। আবেগের এজাতীয় প্রকৃতির কারণেই দার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। সে কারণে তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তির ভিত্তিতে আবেগের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের সমস্যাগুলিকে স্পষ্ট করেছেন।

১) আবেগ বিচারবিযুক্ত

আবেগ আকস্মিকভাবে, অকারণে উৎপন্ন হয়। এটি ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। যুক্তি দ্বারা বিচার করে ব্যক্তির মনে আবেগের স্ফূরণ হয় না। আবেগ বিচারবিযুক্ত হওয়ায় এবং একান্তই ব্যক্তিগত হওয়ায় আবেগ বা আবেগজনিত প্রকাশ সর্বজনীন হয় না। ফলে কোন একটি সর্বজনীন নিয়মের দ্বারা আবেগকে ব্যক্ত করা যায় না। আবেগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের বোধ যুক্ত থাকায় বস্তু সম্পর্কে সঠিক সত্যতাকে জানা সম্ভব হয় না। ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের নির্ধারক যদি আবেগ হয় তবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নৈতিক মূল্য বিষয়ে ধারণাগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বিচারের মনোভাব না থাকায় একজন ব্যক্তির নিকট যা উচিত বলে গ্রাহ্য বিষয় অপর ব্যক্তির নিকট সেটিই অনুচিত বিষয় বলে গৃহীত হয়। ফলে আবেগজাত সিদ্ধান্ত সার্বিক সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ হয়। আবেগের উপস্থিতিতে দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা করে যেটি আমার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে তাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এই আবেগগুলি দ্বারা চালিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা পক্ষপাতমূলক হয়। আবেগের উপস্থিতিতে ব্যক্তি জগতকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যাখ্যা করে। রবার্ট সলোমন [১] মনে করেন, আবেগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন বা বিচার বর্তমান থাকে। বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তিমনে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় সেই সংবেদন অনুসারে বস্তুর ধারণা উৎপন্ন হয়। সেই

ধারণাকে বিচার করে ব্যক্তি নিজস্ব ভাবনা সহযোগে নতুন যে ধারণা গঠন করে সেটি অনুসারেই ব্যক্তি আচরণ করে। ফলে ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত নতুন ধারণার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব মনোভাব, আবেগ প্রতিফলিত হয়। বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে মূল্যায়নকালে ব্যক্তি লক্ষ্য করে ঐ বস্তু তার ক্ষেত্রে সুখদায়ক ফল উৎপাদন করে না দুঃখদায়ক। যদি সেটি সুখজনক হয় তবে বস্তুটি ব্যক্তির নিকট ভাল বলে বা আনন্দদায়ক বলে গৃহীত হয়। মন্দ ফল উৎপাদন করলে তা পরিত্যাজ্য হয়। ব্যক্তির নিজস্ব বিচার বিবেচনা থেকেই কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে মনোভাব গঠিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনে যে আবেগ উৎপন্ন হয় তা হল ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত বিষয়। যেমন, কোন বস্তু ব্যক্তি পরিত্যাগ করতে পারেন, কেননা ব্যক্তিমনে বস্তুটি ভয়ের উদ্রেক করে। অন্য ব্যক্তি ঐ একই বস্তুকে সুখকর বলে মনে করলে তার নিকট ঐ একই বস্তু কাঙ্ক্ষিত বলে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ধারণা হল বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, যার সঙ্গে ব্যক্তির বিশ্বাস, প্রত্যাশা জড়িত থাকে। ব্যক্তিমনের বিশ্বাস, প্রত্যাশা অনুযায়ী বস্তু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় তা হল আবেগসঞ্জাত সিদ্ধান্ত। আবার দেখা যায়, আবেগের বশবর্তী হয়ে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হওয়ায় কোন কর্মে একাধিক বিকল্প বিষয়গুলি ব্যক্তির সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। একজন ব্যক্তি নৈতিককর্মে যে বিকল্পকে গ্রহণ করছেন অপর ব্যক্তির সম্মুখে ওই একই প্রসঙ্গে অন্য বিকল্প পরিলক্ষিত হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নৈতিক কর্মের যথার্থ্যতা বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি যে বিকল্পটির প্রতি মনোযোগী হবেন তিনি তার সপক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ফলে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি হঠাৎ প্রচন্ড রেগে গেলেন এবং কোন বিষয়ে নঞর্থক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে অত্যধিক রাগান্বিত হওয়ার কারণে আমরা সেই ব্যক্তিটিকে রাগ প্রশমিত করার উপদেশ দিই এবং ঐরূপ রাগান্বিত হওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করি। একারণে বেনজেভ বলেন, আবেগ হল "Like storms and fire"।[২] হঠাৎ করে কোন পরিস্থিতিতে আবেগের উত্থান হয় এবং দ্রুত তা প্রশমিত হয়। ফলে রাগ, ভালবাসা – এই আবেগগুলি হল "ready made mechanism"।[৩] এর দ্বারা কোন পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা যায়। আবার আবেগের সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সাপ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা কোন পরিবেশে সাপ দেখা মাত্রই ভয়ের উদ্রেক করায়। কিন্তু পরিস্থিতিকে বিচার করলে হয়ত দেখা যাবে ওই পরিস্থিতিতে তার ভয় পাওয়ার সঙ্গত কারণ নেই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান আপতিক হওয়ায় নৈতিকতার ক্ষেত্রে আবেগকে গুরুত্ব দিলে আপতিক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হবে। প্রতিটি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা পৃথক হওয়ায় নৈতিক সিদ্ধান্তে তা প্রতিফলিত হবে। নৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আবার একই ব্যক্তি যে সিদ্ধান্তকে

কোন পরিস্থিতিতে গ্রহণ করবেন, সময়ের পরিবর্তনে সেই একই সিদ্ধান্তকে বর্জন করবেন। নৈতিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল হয়ে পড়বে। দেশকালভেদে নৈতিক সিদ্ধান্তে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। নৈতিক বিশ্বাস, প্রত্যাশা সবই ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়বে। ফলে নৈতিক সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক হবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিসঙ্গত গাণিতিক সত্যতা নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে আবেগকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত বলে বুদ্ধিনিষ্ঠ দার্শনিকগণ দাবি করেন।

২) আবেগ সংকীর্ণ সিদ্ধান্তকে প্রতিফলিত করে

আবেগ ব্যক্তিগত অনুভূতি হওয়ায় যুক্তিবিচার সেখানে বর্তমান থাকে না। ফলে ব্যক্তি যখন কোন পরিস্থিতিতে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন ব্যক্তির সম্মুখে একাধিক বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়ের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে বা যাকে ব্যক্তি পছন্দ করছেন তার সপক্ষে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। ফলে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত পক্ষপাতমূলক বা একপাক্ষিক হয়। ফ্রিজদা নৈতিক আলোচনায় ব্যক্তির আবেগজাত সত্তার উপস্থিতিকে "emotional law of concern"[৪] বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের উপস্থিতিতে ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই বিষয়ে তার সমর্থন থাকে। অর্থাৎ তার নির্বাচিত বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান থাকে। ফলে সেই অবস্থা বা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত একাধিক বিষয় তার পর্যবেক্ষণের বাইরে থাকার জন্যই ঐ বিষয়গুলি তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। যেমন ধরা যাক্ আমার খুব পরিচিত ব্যক্তি গাড়ী চুরি করেছেন। তিনি ধরা পড়ে যান এবং নিজের সততার সপক্ষে একাধিক যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন, যাতে নিজে দোষী সাব্যস্থ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পান। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা বা সখ্যতা থাকায় আমি তার উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়কে যুক্তিবিচার ব্যতিরেকেই তাকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। পরিস্থিতির যথাযথ পর্যালোচনা করলে দেখা যেত ঐ ব্যক্তি গাড়ী চুরির দোষে প্রকৃতপক্ষে দোষী। কিন্তু ব্যক্তি সম্পর্কে আমার আবেগের কারণে আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অসচেতনভাবেই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাবে। ফলে বলা যায়, যে ব্যক্তির প্রতি আমার ভালোবাসা থাকবে আমার সিদ্ধান্ত সেই ব্যক্তির সপক্ষে নিঃসৃত হবে। অন্যব্যক্তির ক্ষেত্রে একইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে বেনজেভের মতে, " Emotions direct and color our attention."[৫] যে বিষয়টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেই বিষয়টিকেই আমরা গুরুত্ব দিই। সুতরাং আবেগের দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্ত সসীম, আংশিক

বিষয়কে প্রকাশ করে। কান্টের মতে, আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন বিষয় নির্বাচনে আমাদের সেই বিষয়ের প্রতি ঝোঁক এত বেশি থাকে যে, সেক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধির কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বুদ্ধির কোনরূপ ক্রিয়া ব্যতীত দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হয়। কান্ট মনে করেন, নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি সর্বদা বুদ্ধির সর্বজনীন নীতি দ্বারা চালিত হবেন। আবেগের দ্বারা চালিত ইচ্ছা ব্যক্তির চিন্তাশক্তি প্রকাশ করতে বাধার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি ঐ বস্তুটি বা বিষয়কে লাভ করে ক্ষণিক সুখ উপলব্ধি করলেও পরক্ষণেই সেই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। কান্ট আবেগ সম্পর্কে বলেন, " Such as water that breaks through a dam or stroke of apoplexy."[৬] তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসায় এতটাই অন্ধ থাকে যে, একে অপরের দোষত্রুটি কিছুই দেখতে পায় না। সেক্ষেত্রে তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা তাদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের জন্য আবেগকেই দায়ী করে থাকেন। ফলে কান্টের মতে, ভালোবাসা, ভয় ইত্যাদি আবেগ চঞ্চল, অস্থায়ী হওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত আংশিক বিষয়কে প্রতিপন্ন করে। নৈতিকতা বস্তুগত সত্যতাকে দাবি করে, কিন্তু আবেগের উপস্থিতি ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে বিষয়ীগতভাবে প্রতিষ্ঠা করে। সে কারণে কোন বিষয়ে সকলের সিদ্ধান্ত সমরূপ হতে পারে না। একজনের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত বৈধ বলে স্বীকৃত হয়, অপর ব্যক্তি তাঁকে অবৈধ বলে গণ্য করে। এভাবে কোন বিষয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সক্ষম হই না। ব্যক্তি যদি তার সিদ্ধান্তের সপক্ষে যথাযথ কারণ প্রদর্শন করতে পারে তবে ঐ সিদ্ধান্ত সার্বিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। কান্ট সে কারণেই ব্যক্তির ইচ্ছাকে যুক্তির সর্বজনীনতায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। আবেগ যেহেতু সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিচার করে সেহেতু দার্শনিকেরা মনে করেন যে, আবেগের প্রয়োগে গঠিত সিদ্ধান্ত সঠিক, সার্বিক, সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। নৈতিকতার বিষয় সর্বজনীনতা দাবি করায় নৈতিকতার গণ্ডী থেকে আবেগকে সম্পূর্ণ বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা।

৩) আবেগ নৈতিক দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করে

আবেগসঞ্জাত সিদ্ধান্ত ব্যক্তির ক্ষণিক মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। তাই ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তার ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। এই সিদ্ধান্ত কারণ নির্ভর না হওয়ায়, আকস্মিক, ক্ষণিক ইচ্ছার ফল বলেই তার সমর্থনে ব্যক্তি কোন সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না। ব্যক্তি তার বিচারমূলক কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে, কোন কর্মের ফল কিরূপ হবে সেটি বিচার করে। অর্থাৎ ব্যক্তির কর্মের সিদ্ধান্ত তার বিশ্বাস, মনোভাব, পারিপার্শ্বিক

অবস্থা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গৃহীত হয়। যখন ব্যক্তি তার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তার সিদ্ধান্ত হয় স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক। ব্যক্তির বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে না, যেহেতু ব্যক্তির আবেগ তার বিচারবোধকে দমন করে রাখে। বলা যায়, আবেগ অনুসারে গৃহীত সিদ্ধান্তে ব্যক্তি তার দায়িত্ববোধকে উপেক্ষা করে। কর্মকর্তা যখন নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকদের দাবি অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত সার্বিকতাকে প্রতিষ্ঠা করবে। ব্যক্তির যুক্তিবোধ, বিচারবিবেচনা সেই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করবে। ব্যক্তি যেহেতু একাধিক বিকল্পগুলির মধ্যে একটিকে নির্বাচন করে তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যক্তি কর্ম পালনে সক্ষম বলে ব্যক্তির কর্মকে আমরা ঐচ্ছিক কর্ম বলতে পারি। নৈতিক কর্মের সিদ্ধান্ত ঐচ্ছিক কর্ম হওয়ায় ব্যক্তির সেই কর্মের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে। ব্যক্তির বিচারমূলক সিদ্ধান্ত হবে আবশ্যিক। কিন্তু আবেগজাত কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিচারবিবেচনা অনুপস্থিত থাকে। ব্যক্তির আবেগ তাঁকে নির্দিষ্ট দিকে চালিত করে। ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ কর্ম পালন করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সচেতনতা যথাযথভাবে ক্রিয়া না করায় তাঁর ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে—একথা বলা যায় না। ব্যক্তি আকস্মিকভাবে, অকারণে কর্ম পালন করে বলে তার দায়িত্বকেও স্বীকার করা যায় না।

নৈতিক ক্রিয়া ব্যক্তির ঐচ্ছিক ক্রিয়া। অর্থাৎ এই কর্ম পালনে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা বর্তমান থাকে। ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিক কর্মের পূর্বস্বীকৃতি। ব্যক্তির ইচ্ছা অপর কোনরূপ কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তার ইচ্ছাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলা যাবে না। স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ব্যক্তির দায়বদ্ধতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা যদি তার বিচারহীন আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ব্যক্তি যদি তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তার ঐ আবেগ চালিত ইচ্ছাকে আর স্বাধীন ইচ্ছা বলা যায় না। এর থেকেই নিঃসৃত হয় যে, ব্যক্তির আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতি তার দায়বদ্ধতা প্রত্যাশা করা যায় না। নৈতিক কর্মে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকার অর্থ ব্যক্তি ঐ কর্মের সিদ্ধান্তের প্রতি সচেতনতা বর্তমান। বিচারবুদ্ধিহীন সিদ্ধান্তে ব্যক্তির স্বাধীনতারও অভাব থাকে। আবেগসর্বস্ব সিদ্ধান্তে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকায় ব্যক্তির সেক্ষেত্রে বিচারবিবেচনার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রতি বা অপর ব্যক্তির প্রতি বা তার সিদ্ধান্তের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে তার আবেগের জন্য নয়। ব্যক্তি তার যুক্তিবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোন বিষয়ের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ আমি যদি কেবল বন্ধুর বিপদে বন্ধুর প্রতি ভালোবাসার কারণে তার প্রতি দায়িত্ব অনুভব করি তবে আমার ঐ বোধের উৎস হলো আমার আবেগ। তবে কোনও কোনও দার্শনিক আবেগের

ব্যবহারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা তাঁরা মনে করেন, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকসময় আবেগই আমাদের প্ররোচিত করে। সহমর্মিতা, লজ্জা, ভয় ইত্যাদি নৈতিক বোধের কারণে ব্যক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত গঠনে সক্ষম হন। লজ্জা, ভয় ইত্যাদির কারণে আমরা সঠিক কর্ম পালনে দায়বদ্ধতা অনুভব করি। এইভাবে কোন অনৈতিক কর্ম থেকে বিরত থাকতে আবেগ আমাদেরকে সাহায্য করে। কিন্তু নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকদের মতে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মের সঙ্গে দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ অত্যন্ত সহজ ও সরল চিত্রকে প্রকাশ করে। আধুনিক নীতিতত্ত্বগুলি, বিশেষত কর্তব্যবাদী দার্শনিক কান্ট সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। তাই তিনি এ জাতীয় আবেগজনিত দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করবেন না। কারণ আবেগ নিঃসৃত দায়বদ্ধতা সর্বজনীন নয় বলে তা যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য নয়। সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ঐরূপ দায়বদ্ধতার বোধকে যুক্তির ভিত্তিতে, নীতির অনুশাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কৃতকর্মের সঙ্গে এভাবেই দায়বদ্ধতার একটা কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান। নৈতিক কর্মের সিদ্ধান্তে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে, দৃঢ়চিন্তা বা বিচার বিবেচনার বিষয় বর্তমান থাকবে, ব্যক্তি যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে একাধিক বিকল্প বিষয়ের মধ্য থেকে সঠিক বিকল্পকে নির্বাচন করবে – এগুলি ব্যক্তির ঐ কর্মের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারণরূপে গণ্য হবে। এই কারণগুলি থেকে কার্য অনিবার্যরূপে নিঃসৃত হবে। ফলে তখন বলা যাবে ব্যক্তি ঐরূপ কর্মের প্রতি দায়বদ্ধ। সুতরাং দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠায় বিচারবোধের উপস্থিতি আবশ্যক। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি অসচেতনভাবে, অজ্ঞানতাবশত কোন ব্যক্তিকে বিষাক্ত সরবৎ পান করতে দিলেন এবং ঐ সরবত পান করে ব্যক্তিটি মারা গেলেন। সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সরবত পান করতে দিয়েছিলেন তাকে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা সঠিক নয়। যেহেতু তিনি অজ্ঞানতাবশত ঐ সরবত দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি সচেতনভাবে, পরিকল্পনা করে যদি ঐ ব্যক্তিকে বিষ সরবত দিতেন তাহলে ওই ব্যক্তি তাঁর ঐরূপ কর্মের জন্য দায়ী বলতে হতো। ব্যক্তি যখন নৈতিক কর্ম সম্পাদন করছেন তখন তার ঐ কর্মটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যেমন যুক্তি থাকবে আবার না করার পশ্চাতেও উপযুক্ত যুক্তি থাকবে। আবার ঐ কর্মটির ফলাফল সম্পর্কেও তার ধারণা থাকতে হবে। তবেই কোন ব্যক্তিকে এই কর্মের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন নৈতিক কর্ম সম্পাদনের পশ্চাতে ব্যক্তির যুক্তি বর্তমান থাকলেও, সেই কর্মের ফলাফল সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা থাকে না। যেমন, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করলেন তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য। সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পরোক্ষভাবে অন্য ব্যক্তিকে প্ররোচিত করলেন সেই ব্যক্তি হত্যারূপ কর্মের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না থাকলেও পরোক্ষভাবে দায়ী বলা হয়। এইভাবে

নৈতিক কর্মে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায়বদ্ধতার বিষয় যুক্ত থাকে। সুতরাং নৈতিক কর্মের প্রতি দায়িত্বশীলতার অর্থ ব্যক্তি ঐ কর্মকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করেছেন, তার ঐরূপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়ে কৃত কর্মে বিচক্ষণতা উপস্থিত না থাকায় ব্যক্তি সমগ্র পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে অসমর্থ হয়। সুতরাং আবেগজাত সিদ্ধান্তকে দোষদুষ্ট, মিথ্যা এবং পক্ষপাতমূলক বলে অভিহিত করেছেন বেনজেভা।[৭] এই কারণে কর্তব্যবাদী নীতি দার্শনিকগণ নৈতিক ক্ষেত্র থেকে আবেগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র গুরুত্ব প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

৪) আবেগ নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার বিরোধী

আবেগ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত গঠন করে। সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের আবেগ জাগ্রত হয় না। ব্যক্তির সঙ্গে অসম্পর্কিত ব্যক্তিগণ তার নৈতিক সিদ্ধান্তের গণ্ডীতে অন্তভুর্ক্ত হন না। ব্যক্তি তাদের প্রতি কোনরূপ দায়বদ্ধতা অনুভব করে না। ফলে আবেগজাত সিদ্ধান্ত পক্ষপাতমূলক হয়ে যায়। আমাদের পছন্দ- অপছন্দ অনুসারে আবেগ উৎপন্ন হওয়ায় এটি নির্ভরযোগ্য নয়। আবেগের কারণে যে বিষয়টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেই বিষয়টিকেই আমরা গুরুত্ব দিই। অন্য কর্তব্যগুলি আবেগের উপস্থিতির কারণে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। আমরা আমাদের আবেগের কারণে কোন একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকি। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে ভালোবাসে তাহলে দেখা যায় সেই ভালোবাসার ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকায় সিদ্ধান্ত সেই ভালবাসার ব্যক্তির সপক্ষে গৃহীত হয়। ফ্রয়েডের[৮] মতে, ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসা, বন্ধুত্বের ভালোবাসা – এগুলি আমাদের এমনভাবে চালিত করে থাকে, যার জন্য আমরা সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে থাকি। অর্থাৎ ভালোবাসা নামক আবেগ আমাদের লক্ষ্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য মনকে একদিকে চালিত করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি আমাদের লক্ষ্য বা মনোযোগ থাকে না। মনোযোগ যেহেতু ভালবাসার ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয় সেহেতু আমরা সচেতনভাবেই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গঠনের চেষ্টা করে থাকি। ফলে সিদ্ধান্ত একপাক্ষিক হয়ে যায়। কিন্তু নৈতিক সিদ্ধান্ত সর্বজনীন হওয়া উচিত।

নীতিনিষ্ঠ মতবাদের বিপক্ষে সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকদের যুক্তিঃ

উনবিংশ শতকের পরবর্তী সময়ে নৈতিক ভাবনায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা বুদ্ধিপ্রসূত নীতিনির্ভর নৈতিকতার পরিবর্তে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেন। কেননা তাঁদের মতে, নৈতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বুদ্ধি ও নীতির প্রাবল্যকে গুরুত্ব দিলে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিচার সম্ভব হয় না। বরং কর্তব্যভিত্তিক নৈতিকতা কর্মকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করার ফলে ব্যক্তির বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই সদ্‌গুণ অর্জনকে গুরুত্ব প্রদানকারী দার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে কর্মকর্তার কর্মকে নয়, তার মানসিকতাকে বিচার করার প্রয়োজন অনুভব করলেন—যে মানসিকতা ব্যক্তির আচরণের কারণ বলে গণ্য হয়। কর্মকর্তা যে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক সত্তাবিশিষ্ট নয়, আবেগও যে তার আচরণকে প্রভাবিত করে—এমন চিন্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির আচরণ যেহেতু তার চরিত্রের দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাই ব্যক্তির কর্ম নয়, তার চরিত্রের গুণাগুণ বিচারই মুখ্য হয়ে উঠল। তাঁদের মতে, নীতিসর্বস্বতা কখনো নৈতিকতার মাপকাঠি হতে পারে না। আলোচ্য অংশে আমি কর্তব্যভিত্তিক বা নীতিভিত্তিক মতবাদের দুর্বলতা প্রসঙ্গে আলোচনা করে নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকাটি স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব।

নৈতিক নিয়ম সর্বজনীন নয়

কর্তব্যবাদে বলা হয়, একজন কর্মকর্তা নীতি বা আদর্শ অনুযায়ী নৈতিক কর্ম সম্পাদন করাকে কর্তব্য বলে মনে করবেন। এই নৈতিক আদর্শ সর্বজনীন হওয়ায় স্থান, কাল পাত্রভেদে সকল ব্যক্তি নৈতিক আদর্শগুলিকে অনুসরণ করতে সমর্থ হবেন। কেননা ব্যক্তির নৈতিক উদ্দেশ্য হবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জয় করে বিশুদ্ধ বুদ্ধিপ্রণীত নৈতিক আদর্শের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করা। মানুষের মধ্যে যেমন উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে তেমনি অনুন্নত পশুপ্রবৃত্তিও বর্তমান। উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অনুন্নত পশুবৃত্তি জয় করাই হল মানবজীবনের আদর্শ। কর্তব্যবোধে নৈতিক কর্ম সম্পাদনই নৈতিকতার মূল লক্ষ্য। কোন কর্মের প্রতি কর্তব্যবোধ, বাধ্যবাধকতা বা উচিত্যবোধের অনুভব করা সম্ভব হবে যদি কর্মের পশ্চাতে কোন নীতি উপস্থিত থাকে। নীতিগুলি বুদ্ধিপ্রসূত হওয়ায় কোন ব্যক্তিই সেগুলি অস্বীকার করতে পারবে না। ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার নীতিকে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য বলে বিচার করলে এবং সেটি সর্বজনীন নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ নীতি পালনে বাধ্য থাকবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা লক্ষ্য করি, সার্বিক নিয়ম বলে কিছু নেই। বাস্তবে দেখা যায়

একই সমাজে কোনও কোনও নীতি অনুসরণযোগ্য বলে গণ্য হয়, আবার ঐ একই নীতি সমালোচিত হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি দ্বারা উপেক্ষিত হয়। আবার যে নীতিটি কোন একটি সমাজে অবশ্যপালনীয় বলে গ্রাহ্য হয় সেটিই অন্য সমাজে নিন্দনীয় বলে স্বীকৃত। যেমন ভারতে মুসলমান সমাজে একজন পুরুষের চারজন স্ত্রী থাকা অন্যায় নয়, যদিও ভারতীয় হিন্দু সমাজে একজন স্ত্রী জীবিত থাকাকালে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা নীতিবিরুদ্ধ। মৃত স্বামীর চিতাবহ্নিতে হিন্দু রমনীর আত্মাহুতি একদিন প্রশংসিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ঐ প্রথা অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দিত বলে পরিত্যাজ্য। দার্শনিক ব্রানডট[৯] মনে করেন, সেটিকেই আদর্শবিধি বলা যাবে যেটি সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং অনুসরণ করে। কারণ তাঁর মতে, আদর্শ বিধি সামাজিক উপযোগিতার উৎপাদক। যে বিধি সর্বাধিক উপযোগিতা উৎপাদনে সক্ষম সেই বিধিটিকেই তিনি আদর্শ বিধি বলে মনে করেছেন। এ থেকে বলা যায় যে, আদর্শ বিধি নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুসারে। এ থেকে স্পষ্ট, নীতি সমাজ নির্ধারিত। সামাজিক উপযোগিতা উৎপাদনে সমর্থ হলে তবেই সেটি সমাজস্থ ব্যক্তি দ্বারা আদর্শ বলে গৃহীত এবং অনুসৃত হয়। এখানে উপযোগিতা শব্দটিকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু বলা যায় যে, জাগতিক সুখ- সুবিধার কারণে অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিরিখে যেমন আদর্শ নির্ধারিত হয়, তেমনি আমাদের মানসিক তৃপ্তি সাধনেও আদর্শটি সমান উপযোগী হবে এমন দাবি করা যায়। সুতরাং আদর্শ কেবল বুদ্ধি দ্বারাই নির্ধারিত হয়—একথা বলা যায় না। আমাদের আবেগ যদি কোন আদর্শকে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে তবেই সেটি আদর্শ বলে গৃহীত হবে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ম্যাকিনটায়ারের মত আলোচনা প্রসঙ্গেও এটি উল্লেখ করেছি। আদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের প্রতিফলন থাকলেও যতক্ষণ না ব্যক্তি এটিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করছে ততক্ষণ সেটি তার নিকট আদর্শ বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে, নীতি দেশ কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। এইভাবে দেখা যায় নৈতিকতায় আদর্শ নীতি কি হবে তা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একই সামাজিক পরিমন্ডলের মধ্যে প্রচলিত নীতিগুলির বৈধতা বিচার সেই পরিমন্ডলের মধ্য থেকেই বিরুদ্ধ নিয়মের জন্ম দিচ্ছে। ফলে দেশ কাল নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ সর্বজনীনভাবে কোন নীতির বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

নৈতিক নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়

মধ্যযুগে নৈতিকতার ইতিহাসে দেখা যায় ঈশ্বর আদিষ্ট নীতিই ছিল সকলের জন্য প্রযোজ্য। ঈশ্বরের আদেশ পালনকে নৈতিক জীবনযাপনের শর্ত বলা হতো। ঈশ্বরই ছিল নৈতিক ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তাঁর আদেশকে প্রশ্নাতীতভাবে পালনীয় বলে মনে করা হতো। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাসই ছিল নৈতিকতার আবশ্যক অঙ্গ। সে সময়ে ঈশ্বরকে জগতের সর্বময়কর্তা এবং এই বিশ্বের নীতিনির্ধারকরূপে স্বীকার করা হতো। তাঁর করুণা লাভের দ্বারা চরম শান্তি অর্জনে মানুষ সচেষ্ট ছিল । ফলে ঈশ্বরপ্রদত্ত নীতি অনুসরণে ব্যক্তি বাধ্যতাবোধ অনুভব করত। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল আবশ্যকতার ধারণা। এই যুগে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা বা পছন্দের কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু রেনেসাঁ পরবর্তীকালে ঈশ্বরের করুণার স্থান গ্রহণ করে ব্যক্তির বুদ্ধি। অর্থাৎ নীতিগুলি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গৃহীত হচ্ছে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হচ্ছে। কোন অতিজাগতিক সত্তা বা ঈশ্বর এই নীতিগুলির প্রণেতা বা নির্ধারক নয় । ব্যক্তিবর্গের সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী বুদ্ধি থেকেই নৈতিক নিয়ম নিঃসৃত হয়। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নেই। বাস্তবে দেখা যায়, নৈতিক নিয়মগুলি যেহেতু আমাদের জীবনের সাথে, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উচিত-অনুচিতের সাথে জড়িত তাই সেখানে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। নৈতিক নিয়মের উৎস যদি হয় সামাজিক অবস্থা, তাহলে সামাজিক প্রত্যয়গুলি, অর্থাৎ উচিত অনুচিতবোধও ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই নৈতিক নিয়ম ব্যক্তি নিজ স্বার্থেই পালন করবে। বাধ্যবাধকতার ধারণা সেক্ষেত্রে শূণ্যগর্ভ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণে দার্শনিক টাইলার বাধ্যবাধকতার ধারনাকে 'শূণ্যপ্রত্যয়'[১০] (Empty concept) বলে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু ব্যক্তির বুদ্ধি থেকে নিয়মগুলি নিঃসৃত তাই সেই নীতিগুলি বলপূর্বক সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে—এমন মনে করা যথাযথ নয়। নীতিনির্ধারকরূপে রাজা, আদালত, কোন প্রশাসনিক কর্তা বা ঈশ্বর উপস্থিত থাকলে সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে সে জাতীয় কোন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি না থাকায় বাধ্যতাবোধের ধারণাটি এ্যানস্কোম্বের মতে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাঁর মতে, নীতিনিষ্ঠ মতবাদে যে নীতি পালনকে আবশ্যক বা বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করা হয়েছে সেই নীতিটি ব্যক্তির বুদ্ধি থেকেই নিঃসৃত, ব্যক্তি অতিরিক্ত কোন সত্তা দ্বারা নির্দেশিত নয়। তাই এখানে বাধ্যতার ধারণাটি অর্থহীন, যেহেতু আইন প্রদানকারীরূপে কর্মকর্তা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। যদি ধর্মনিরপেক্ষভাবে ঔচিত্যের ধারণাকে বুঝতে হয় তাহলে তাকে কোনভাবেই বাধ্যতাবোধের সাথে যুক্ত করা চলে না বলে এ্যানস্কোম্ব[১১] মত প্রকাশ করেন। ফিলিপা ফুটের[১২] মতেও, নৈতিক নীতিগুলি সহজসরলভাবে,

অবৌদ্ধিকভাবে সমাজে তৈরী হয়েছে। নৈতিক নীতি প্রণয়ণে কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নেই। কোন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই নিয়মগুলি পালন করতে বাধ্য করে না, যেমনভাবে কোন আইন আমাদের ক্ষেত্রে বলবৎ হয়। এই নীতিগুলি যেহেতু মানুষের দ্বারা গঠিত এবং সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যেই প্রযোজ্য হয় তাই প্রয়োজনে এগুলির পরিবর্তন সাধনও অসম্ভব নয়।

নৈতিক মানদণ্ডের বিভিন্নতা

নৈতিক আদর্শের প্রকৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। একদল নীতিদার্শনিকের মতে, নৈতিক কর্ম পালনের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক মঙ্গল উৎপাদন করা। যে সকল কর্ম সমাজের জন্য উপযোগী সেই সকল কর্মকেই এই নীতিগুলি ভালো বলে মনে করে। উপযোগবাদী মিলের[১৩] মতে, নৈতিক নিয়ম হলো তাই যা সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির সার্বিক মঙ্গল সাধনে সহায়তা করবে। অর্থাৎ সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বোচ্চ মঙ্গল সাধনই নৈতিকতার আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ কর্মের দ্বারা উৎপাদিত ফলাফলের বিচারে নৈতিক কর্ম সম্পাদনই নৈতিকতার মূল লক্ষ্য বলে মিল মনে করেছিলেন। এই মতবাদে ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত কর্ম পালনের উদ্দেশ্যরূপে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ উৎপন্ন করাকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তির সুখই এ মতবাদ অনুসারে চরম ভালো বলে গণ্য। আবার কান্টের মতে দেখা যায়, নৈতিকতায় আদর্শকে ফলাফলের সাথে কোনভাবেই যুক্ত করা হয় নি। তিনি সদিচ্ছা-জনিত কর্ম পালনকেই ব্যক্তির আদর্শ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধিপ্রসূত এমন নীতি অনুসারে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করা উচিত যে নীতিকে সার্বিকভাবে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে।[১৪] তাঁর মতে, নৈতিকতায় ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মের ফলাফল নয়, ব্যক্তির কর্তব্যবোধই ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে। সকল ব্যক্তি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে তখনই যখন ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে। এই কারণে কান্টের বৌদ্ধিক নীতি ফলাফল নিরপেক্ষ, তাই তা শর্তহীন এবং সর্বজনীন। এমন শর্তহীন নৈতিক নিয়ম অনুসরণে সকল ব্যক্তি নৈতিকতায় ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে বলে কান্ট দাবি করেন। কান্টপন্থী রলস[১৫] কান্টের মতো ন্যায়ের ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উপযোগবাদে বিশ্বাসী নন এবং তাঁর নিকট ন্যায্যতা হলো মৌলিক ধারণা যা সামাজিক কাঠামোয় উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক। তিনি ভালোত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন ন্যায়ের ধারণা দ্বারা। সমাজকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য রলস কতগুলি নীতি নির্ধারণের কথা বলেছেন। এই নীতির সাহায্যে

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ন্যায়ের নীতি অনুসারে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করবে এবং লাভ ও লোকসান বন্টন করবে। এই নীতিগুলি নির্দিষ্ট সমাজের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হবে। ব্যক্তিদের প্রয়োজন বিচার করে, সুযোগ সুবিধার কথা বিচার করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যায়ের নীতি গঠিত হবে। রলস উপযোগিতাবাদের সমালোচনা করে বলেন, উপযোগিতাবাদে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। বিপরীতপক্ষে রলস সমাজে যে ব্যক্তিরা অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের অধিকারের পক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। জন রলস অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা বা অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অধিক সুবিধা প্রদানের দ্বারা সকল ব্যক্তিদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। রলস এ জন্য বন্টনের নীতির[১৬] কথা বলেছেন। এই বন্টনের নীতি নির্ধারিত হবে সামাজিক প্রয়োজন এবং ব্যক্তির অবস্থান অনুসারে। তিনি উপযোগিতাবাদে যে সর্বাধিক মঙ্গলের নীতিটির উল্লেখ আছে সেই অনুসারে তাঁর বন্টনের নীতিটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। উদারনীতিবাদী রলস প্রতিটি ব্যক্তির সাম্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিচার করে বন্টনের পরিমাণ নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি প্রয়োজন অনুসারে বন্টনের কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় রয়েছে তাকে তিনি অধিক পরিমাণে সুযোগ সুবিধা দানের কথাও বলেছেন। সে কারণেই তিনি মনে করেছেন, বৈষম্যের দ্বারাই সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাহলে বলা যায়, রলস নীতিগুলিকে বুদ্ধিপ্রসূত ও সকলের অনুসরণযোগ্য বলে মনে করলেও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিরপেক্ষতার কথা তিনি বলেননি। তিনি purity of heart[১৭] - এর কথা বলেছেন। অর্থাৎ সমাজে ন্যায় বন্টনের প্রাথমিক শর্ত হলো সহযোগিতার মনোভাব। সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে ব্যক্তি একে অপরের প্রয়োজন পূরণকে বুঝতে সক্ষম হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ন্যায্যতা নীতির প্রতি সহমত পোষণ করবে। সেকারণে তিনি সহযোগিতা এবং সম্মতির কথা বলেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি ন্যায্যতা নীতির প্রতি সম্মতি প্রদান করবে। ফলে রলস কান্ট অনুসারী হয়েও ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতির কথা বলেন নি। তিনি যে ন্যায়ের নীতি গঠন করার কথা বলেছেন সেখানে প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থান, পরিস্থিতি ইত্যাদির বিচার করতে হবে, যা কান্টের মতবাদে অস্বীকৃত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নীতির উৎস সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কোনও কোনও নীতিদার্শনিক উপযোগিতার প্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ করেছেন, আবার কোনও কোনও নীতিদার্শনিক কর্তব্যের দ্বারা নীতি নির্ধারণের কথা বলছেন। আবার কোন দার্শনিক সেই নীতিকেই গ্রহণযোগ্য

বলে মনে করেছেন যা সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। ফলে নীতি নির্ধারণের মানদণ্ড বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে বলেই নীতির বৈধতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সেই কারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিক মতে, নীতিগুলির বিভিন্নতা আমাদের নির্দিষ্ট ও সঠিক নীতি সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা দিতে সমর্থ নয়, যাকে আমরা অবশ্য অনুসরণীয় বলে গণ্য করবো। যে নীতিটি নৈতিক জীবনের সহায়ক বলে স্বীকার করবো সেই নীতির উৎস সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। ব্যক্তি যখন সামাজিক উপযোগিতা বা সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্যে কোন নীতি নির্ধারণ করছে তখন তার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বুদ্ধিরই প্রয়োগ করা হচ্ছে তা বলা যায় না। বরং বলা যায় ব্যক্তির চরিত্রে যদি যথাযথ আবেগ অর্থাৎ নৈতিক আবেগের উপস্থিতি থাকে তাহলে নীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। নৈতিক আবেগের উপস্থিতির অর্থ হলো ব্যক্তির মনে একটি দ্বন্দ্বহীন অবস্থা বিরাজ করে এবং ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও আবেগের সহাবস্থানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। তার মানসিক অবস্থা, তার প্রবণতা, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার সিদ্ধান্তের নির্ধারক হয়। নীতির প্রয়োজনীয়তা সেক্ষেত্রে উপলব্ধ হয় না। সদ্‌গুণগুলি সেক্ষেত্রে নীতিরূপে কার্যকরী হয়। নীতি পালনের ক্ষেত্রে অনেকসময়ই সমস্যার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। কারণ নীতি পালনের জন্য উপযুক্ত মনোভাবের প্রয়োজন থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি সেই মুহূর্তে নীতি পালনে আগ্রহী হয়, তবেই সে নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত কর্তব্য পালন করে। কিন্তু যদি আমরা মনে করি ব্যক্তির কর্ম নয়, ব্যক্তিই নৈতিক বিচারের বা নৈতিক মূল্যায়নের বিষয় এবং চরিত্র গঠনই নৈতিকতার লক্ষ্য, তাহলে সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই সর্বদা নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে। নীতিপালনের ক্ষেত্রে যে অনির্দিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় সেটি সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে না। কারণ ব্যক্তি তার চরিত্রানুসারে কর্ম পালন করে বলেই তার কর্মের সিদ্ধান্তটি তার চরিত্র থেকে আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয়। সুতরাং সৎ ইচ্ছা, আবেগ, প্রবণতা উপস্থিত থাকলে আমাদের ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিকর্তৃক গৃহীত কর্মের সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয় না। কারণ সদ্‌গুণগুলি ব্যক্তিকে লম্বা দৌড়ের জন্য অর্থাৎ ভালোজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। বিচ্ছিন্ন কর্মের বিচার সেক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কর্মের বিচারের প্রয়োজন হয় না বলেই কর্মের নীতিগুলিও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

বুদ্ধিবাদী নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা বুদ্ধি নিঃসৃত নীতির দ্বারা নৈতিক আচরণকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু এরূপ মনোভাবের বৈধতা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। কান্ট যখন সর্বজনীন নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং নীতিগুলিকে আদেশরূপে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হন তখন অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে নীতিগুলিকে প্রয়োগ করা। তিনি যখনই সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করতে

চেয়েছেন তখন অবশ্যই তাঁর লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যখন সকলের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হয়ে কর্তব্য পালনের আদেশ দিয়েছেন তখন তিনি অবশ্যই পরোপকারিতার মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। আবার তিনি যখন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র উপাররূপে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করতে বলেছেন তখন তিনি সকল মানুষের মর্যাদাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবেই সকলের প্রতি সমমনোভাব পোষণ করার অর্থ হলো সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। অর্থাৎ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অপরের মঙ্গলে নিযুক্ত হওয়া—এমন উদ্দেশ্য আমাদের মনে তখনই উপস্থিত হতে পারে যদি আমরা অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হই। তাহলে কান্ট যদিও বুদ্ধির নির্দেশে নিয়মনিষ্ঠ পথে কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য মানবিকতাবোধ শূণ্য—এমন কথা প্রমাণ হয় না। আবার জন স্টুয়ার্ট মিল যখন উপযোগিতার নীতি অনুসরণ করে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক উপযোগিতা উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছেন, তখনও সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুদ্ধিপ্রসূত একথা আমরা বলতে পারি না। অপরের উপযোগিতা উৎপাদনে আমরা তখনই সচেষ্ট হই যখন আমরা অপরের মঙ্গল উৎপাদনকে মর্যাদা দান করি। অপরের মঙ্গল আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ হবে তখনই যখন আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন হই। সুতরাং বুদ্ধিপ্রসূত নীতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতার অন্তরালে উপস্থিত রয়েছে আমাদের মানবিকবোধ। এই মানবিকতাবোধ অনুপস্থিত থাকলে আমরা নীতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেটি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা কখনই অনুভব করতে পারতাম না। সুতরাং বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা নীতিনির্ধারণ এবং সেটি অনুসরণ তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা অন্তর থেকে সেটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই, ফলে ব্যক্তির আবেগকে নীতিগঠনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিরূপে স্বীকার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

নীতি অনুসৃত কর্মে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব

কর্তব্যবাদী মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে কর্তব্যবোধে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করতে হবে। সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিদার্শনিকেরা বলেন, নৈতিক নিয়মের প্রতি বাধ্যাতাবোধে যদি ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করে তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তি কোন আনন্দ অনুভব করে না বা ব্যক্তি আনন্দ সহকারেও কর্মটি পালন করে না। নীতি প্রয়োগ দমনমূলক প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়। কেননা সেক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে যান্ত্রিকভাবে নীতি অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক কর্ম সম্পাদন

করে। আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনাবাসনাকে যদি জীবন থেকে বর্জন করতে বাধ্য করা হয় তাহলে জীবনযাপনের সঙ্গে মৃত্যুর কোন পার্থক্য থাকবে না বলে শেঠি[১৮] দাবি করেন। কেননা আমাদের নৈতিক আচরণের সঙ্গে যুক্ত আছে আনন্দ। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নীতি প্রয়োগের দ্বারা নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নীতিগুলি আকারসর্বস্ব নীতিরূপে বিবেচিত হবে। নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আশা, আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন না করে, নিজের ইচ্ছায় কর্মটি নির্ধারণ করলে সে যেমন ঐ কর্মটি পালনে আনন্দ অনুভব করবে তেমনই তাকে তার কর্মটির জন্য প্রশংসা বা নিন্দা করা যাবে। তার মানসিক সমর্থনের উপস্থিতি থাকলে তবেই তার কর্মের নৈতিক তাৎপর্য্য আছে একথা বলা যাবে। ধরা যাক, কোন একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র নীতিকে অনুসরণ করে, কর্তব্যবোধের লক্ষ্যে বন্যাত্রাণে অর্থ সাহায্য করলেন। তিনি বন্যাদূর্গতদের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি না থাকা সত্ত্বেও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এই কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু অপর ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্যাত্রাণে অর্থ সাহায্য করলেন। তিনি সহানুভূতি, সমমর্মিতাবোধের দ্বারা আপ্লুত হয়ে এরূপ কর্ম পালন করলেন। তাহলে কোন ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবেন? নিশ্চয়ই যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের উপকারের জন্য অর্থ সাহায্য করলেন তাকেই মহৎ ব্যক্তি বলা হবে। নীতির বাধ্যতাবোধ কোন কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের জন্য তখনই প্রয়োজন হয় যখন কর্মকর্তার কোন মানবিক মূল্যের অভাব থাকে। যে ব্যক্তির নৈতিক কর্ম পালনে স্বতঃস্ফূর্তার অভাব থাকে এবং যিনি বাধ্যতাবোধে তাড়িত হয়ে কর্ম করেন তিনি কর্মটি আনন্দসহ পালন করে না। কিন্তু ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় তবে তার নিকট ভালো কর্ম সম্পাদন করা আনন্দদায়ক বলে সে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ঐটি সম্পাদন করে। তার ঐ পরিস্থিতিতে কোনটি কর্তব্য কর্ম, কোনটি সর্বজনীন নীতি অনুসারী, সেটি শর্তহীন আদেশরূপে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কিনা—এসব বিচার অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়।। পোজম্যানের মতে, যদি কর্মকর্তার নৈতিক কর্ম তার চরিত্রের অন্তর থেকে উৎসারিত হয়, তবেই সেই ব্যক্তিকে 'Superior person'[১৯] বলা হবে। এ কারণে সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিদার্শনিকেরা বলেন, ব্যক্তির যদি সৎ প্রবণতা থাকে তবে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। অপর ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্ব দিয়ে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদনে বাধ্যাতাবোধের দ্বারা চালিত হবেন না। কেননা সংযমী ব্যক্তির মনে অনুভূতি, আবেগের দ্বন্দ্ব থাকে বলেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে সেই ব্যক্তি কর্ম সম্পাদনে কোন আনন্দ লাভ করে না। কিন্তু সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির প্রবণতা সৎ হওয়ায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদন করেন এবং কৃতকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে থাকেন। এ্যারিস্টটলের মতে, "The

virtuous man will act as his emotion dictates; he will always pursue the right course of action, and will do so because that is what he wants to do. That is why he will enjoy so acting." [২০]

নীতির আধিক্য পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে

নীতি অনুসারে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবহেলিত হয়। সামাজিক সম্পর্কে উপস্থিত ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, সামাজিকতাবোধ আমাদের আনন্দ দান করে। যদি শুধুমাত্র বুদ্ধির নীতি অনুসরণ করে কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করা হয় তবে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত কর্ম পালনে সক্ষম হলেও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির মাধুর্য তার জীবন থেকে লুপ্ত হবে। কেননা একজন ব্যক্তি অপরের আনন্দে যেমন আনন্দ লাভ করেন, তেমনি অপরের দুঃখে দুঃখিত হন। কেননা একে অপরের সঙ্গে থাকে ভালবাসার বন্ধন। যদি সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন না থাকে তাহলে ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেও একাকিত্ব বোধ করবেন। আমরা আমাদের পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী, স্বজন সকলের সাথে ভালোবাসার বন্ধন অনুভব করি। একে অপরের প্রতি সহনশীল হই, শ্রদ্ধার সম্পর্কও সেখানে বর্তমান থাকে। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র সংকীর্ণ গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অপরিচিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও একটা ভালোবাসার বোধ, সহানুভূতির মনোভাব উপস্থিত থাকে। সে জন্যই আমরা কোন অপরিচিত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে উদগ্রীব হই। অন্য দেশের মানুষের বিপদে দুঃখ বোধ করি। তবে একথা সত্য যে, অভ্যন্তরীন সম্পর্কের প্রতি যেভাবে দায়িত্বশীল হই, সেভাবে অপরিচিতদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হই না। নীতিনিষ্ট মতবাদে সব সম্পর্কই বাহ্যিক। নীতি অনুসারী হয়ে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পর্ক উপেক্ষিত হয়। বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা – এইসব সম্পর্কগুলির কোন মূল্য থাকে না। এই সম্পর্কগুলির ভিত্তি হলো মানবিক বন্ধন। মানসিক বন্ধনের অভাবে ব্যক্তি একাকী জগতে বসবাস করে। সমাজে উপস্থিত থেকেও একাকিত্ববোধে আক্রান্ত হন। একেই স্টকার সিজোফ্রেনিয়া[২১] বলেছেন। এমন রোগীরা জগতে সকল মানুষের সঙ্গে বন্ধনহীনভাবে বসবাস করে। নিজেকে বান্ধবহীন দ্বীপবাসী বলে মনে করে। জগতের কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। নৈতিকতার ক্ষেত্রেও বন্ধুত্ব, ভালোবাসা—এই সম্পর্কগুলি ব্যতীত ব্যক্তি যেন একাকিত্বের জগতে বসবাস করবে বলে স্টকার এমন ব্যক্তিকে সিজোফ্রেনিয়া রোগীর সাথে তুলনা করেছেন। সম্পর্কহীন ব্যক্তি যন্ত্রমানবের সমান। একজন ব্যক্তি যদি সম্পর্ক ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কর্তব্য বোধে কর্ম

সম্পাদন করে তাকে প্রকৃত নৈতিক ব্যক্তি বলা যায় না। একজন ব্যক্তি তার অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতালে যদি শুধুমাত্র কর্তব্যবোধের তাগিদে দেখতে যায় তাহলে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলে কিছু থাকে না। ফলে সম্পর্ককে উপেক্ষা করে নয়, সম্পর্কগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, সম্পর্কগুলির প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করলে ব্যক্তি নৈতিক বলে বিবেচিত হবে। তাহলে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্দেশ্য, প্রেষণা এগুলিকে মূল্য দিতে হবে। আমরা অনুভূতিহীন ব্যক্তিকে পছন্দ করি না। বরং সেই ব্যক্তিকেই পছন্দ করি যার মধ্যে বিনয়, উদারতা,করুণা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা—এই আবেগগুলি বর্তমান থাকে। সুতরাং নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধি নয়, আবেগও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ের সহাবস্থানই ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ হিসাবে পরিগণিত করে। সৎ চরিত্রের ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে গুরুত্ব দিয়েই নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম।

নীতি: নৈতিক দ্বন্দ্ব অতিক্রমে অসমর্থ

কর্তব্যবাদী নীতিতত্ত্ব অনুসারে বুদ্ধিপ্রসূত নীতিগুলি শর্তহীন আদেশরূপে অবশ্য পালনীয় এবং সর্বজন প্রযোজ্য হয়। কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে ব্যক্তিকে নির্ধারণ করতে হয় ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন নীতিটি তার ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয়। এই মতের বিরুদ্ধে প্রথমত বলা যায়, পরিস্থিতি অনুসারে নীতি নির্বাচন একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। তাছাড়া এমন হতে পারে যে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে দুটি নীতি সমানভাবে কার্যকর, যদিও দুটিই প্রয়োগ করা বাস্তবে অসম্ভব। অর্থাৎ একটি নীতি প্রয়োগের অর্থ হলো অপর নীতিটিকে অগ্রাহ্য করা। সেক্ষেত্রে কর্মকর্তা একটি নৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হবে। নৈতিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে কোন একটি নীতি নির্বাচন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। যেমন পরীক্ষকরূপে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার কক্ষে উপস্থিত থাকা আমার কর্তব্য, আবার ঐ নির্দিষ্ট দিনে হঠাৎ কন্যা অসুস্থ হলে তার পরিচর্যার জন্য বাড়ীতে উপস্থিত থাকাও আমার কর্তব্য। আমার পক্ষে দুটি বিষয়কে একই সঙ্গে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এই দুই নিয়মের দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য উচ্চতর কোন নিয়ম থাকে না। আবার মিথ্যা ভাষণ ও হত্যা করা সব সমাজে নিষিদ্ধ হলেও ক্ষেত্রবিশেষে আবার তাদের সমর্থন করা হয়। দেশপ্রেমের জন্য শত্রুর নিকট মিথ্যা বলা সমর্থন করা হয়, তেমনি যুদ্ধে শত্রু নিধন বা খুনীর মৃত্যুদন্ডকে সমর্থন করা হয়। নীতিগুলি রক্ষণশীল হওয়ায় পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। এ কারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের মতে, সদ্‌গুণ একটি নৈতিক শক্তি যা ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে আলোকিত করে নৈতিক দ্বন্দ্ব বা নৈতিক সংশয়ের সমস্যাগুলি অতিক্রম করতে সহায়তা করে। সৎ চরিত্রের ব্যক্তির মানসিক অবস্থা দ্বন্দ্বহীন।

এমন ব্যক্তি প্রজ্ঞা দ্বারা, তার অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের আলোকে পরিস্থিতি বিচার করে তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন তার প্রবণতা ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য থাকায় ঐ ব্যক্তির কোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালবিলম্ব হয় না। তার প্রজ্ঞা তাকে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

তাছাড়া নীতিনিষ্ঠ মতবাদে নীতিগুলিকে নঞর্থকভাবে বর্ণনা করা হয়। যেমন- মিথ্যা বলা অন্যায়, চুরি করা অন্যায় – এই জাতীয় নিষেধমূলক নিয়মগুলিকে মানতে সমাজ আমাদের বাধ্য করতে পারলেও 'প্রতিবেশীকে সাহায্য করা', 'আর্তের সেবা করা' – এই জাতীয় ইতিবাচক নিয়মগুলিকে মানতে সমাজ আমাদের বাধ্য করতে পারে না। ম্যাকেঞ্জী[২২] বলেন, নীতিগুলি আমাদের আচার আচরণের জন্য অসদর্থক নিয়ন্ত্রণ নীতিরূপে ক্রিয়া করে। এই কারণেই নীতির অতিরিক্ত নীতিমূলক কাহিনী বা লোকগাথা প্রতিটি সমাজে প্রচলিত আছে যা শিশুকাল থেকে আমাদের মনে সদর্থক গুণের কর্ষণ করতে সাহায্য করে। আমরা বাস্তবে মহান ব্যক্তিদের জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই। যেমন – সক্রেটিশ, যীশু,গান্ধী, মাদার টেরিজার জীবনাদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে ঐ আদর্শ মানুষের অনুসরণ করতে। আমরা মহৎ ব্যক্তিদের গুণগুলি দেখে নৈতিক জীবনকে উৎকর্ষময় করার প্রয়াসে তাঁদের জীবনকে আমাদের জীবনাদর্শ হিসাবে নির্ধারণ করি। মনে করি যে, যদি অন্য ব্যক্তি তার প্রলোভনকে বিসর্জন করতে সক্ষম হন এবং মহৎ জীবনযাপন করতে পারেন, তাহলে আমিও তা করতে সক্ষম। এই বোধই আমাদের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যদি শুধুমাত্র নীতি অনুসরণ করেই মহৎ ব্যক্তি বলে বিবেচিত হওয়া যেত তাহলে আমরা ঐ মহৎ ব্যক্তিদেরকে আমাদের জীবনের আদর্শরূপে গণ্য করতাম না। নীতিকে অনুসরণ করেই যে কোন ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতে সক্ষম হতেন। এ থেকে বলা যায়, নীতিগুলি আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট নয়। আমাদের কী করা উচিত নয় – এ সম্বন্ধে নীতিগুলি আমাদের নির্দেশ দিলেও, আমাদের কী করা উচিত-- এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দিতে পারে না। নীতিগুলির অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয় যদি আমরা তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি পর্যালোচনা করি। জুলিয়া আনা[২৩] মনে করেন, নীতিনিষ্ঠ মতবাদের সঙ্গে কম্পিউটারের সাদৃশ্য রয়েছে। কম্পিউটার যেমন যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে তেমনি নীতিগুলি আমাদের কী করণীয় তা নির্দেশ করে। কম্পুউটার প্রদত্ত তথ্য যেমন কোন বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত না করে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করে, তেমনি নীতি পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে কোন কাজটি করা কর্তব্য তা নির্দেশ দিয়ে থাকে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সামর্থ্য, পরিস্থিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবনের ক্ষমতা নীতির থাকে না। যেমন, 'মিথ্যা কথা

বলা অন্যায়'- এই নীতিটি সকলেই সত্য বলে মানেন বলে যে কোন পরিস্থিতিতে ঐ নীতি প্রয়োগ করবেন এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাত্ত্বিক ক্ষেত্র এবং বাস্তব পরিস্থিতি দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। তাই শুধুমাত্র নীতি প্রয়োগ করলেই হয় না। বাস্তব পরিস্থিতি যথাযথভাবে অনুধাবন করাও গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব পরিস্থিতি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এত ভিন্ন যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

আবার বাস্তব পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নীতির ব্যবহার আমাদের নিকট কাঙ্ক্ষিত হয় না। কোন চতুর ব্যক্তি, যে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন সহজেই নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি নীতি প্রয়োগে সহজেই সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর করে কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এমন ব্যক্তিকে অনেক সময়ই আমরা পছন্দ করি না। আমরা অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পছন্দ করি যিনি জীবনের মঙ্গলময় লক্ষ্য অর্জনে সঠিক দিশা দেখাতে সমর্থ। একজন চতুর ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে কোন নীতি প্রয়োগ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে হবে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে পারেন। কিন্তু তিনি নীতি প্রয়োগে পারদর্শী হলেও সদ্‌গুণের অধিকারী যে হবেন এমন বলা যায় না। অথচ আমরা এমন লোককে পছন্দ করি যিনি সৎ, ধার্মিক, করুণাময়, পরোপকারী। নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র নীতিনিষ্ঠ মতবাদে অবহেলিত হওয়ায় অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির কর্মও নৈতিক বিচারে ন্যায়সঙ্গত বলে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন ব্যক্তিকে রোসালিন্ড হার্ষ্টহাউস 'loathsome advisor'[২৪] বলে আখ্যা দিয়েছেন। ফলে নীতিনিষ্ট মতবাদ ব্যক্তিকে চতুরতার শিক্ষা দিলেও চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে না। প্রত্যেকটি পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত নীতি পূর্বেই বর্তমান। কর্মকর্তার দায়িত্ব শুধুমাত্র নীতি অন্বেষণ এবং তার প্রয়োগ। সেক্ষেত্রে যদি নৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ঘটে তবে তার দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত অনুসৃত নীতিটি কাঙ্ক্ষিত ফলোৎপাদনে অক্ষম। কেননা কতকগুলি বাহ্য জগতের শর্ত নীতির কার্যকারিতাকে ব্যহত করছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনভাবেই দায়ী নয়। যে সকল দার্শনিক আবেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা যথাযথ ফল উৎপাদনে ব্যক্তি ব্যর্থ হলে তার কোন ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির মনে অনুতাপ, অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত বলে মনে করেন। কিন্তু নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকেরা আবেগের ভূমিকাকে উপেক্ষা করেন বলে এগুলি তাদের নিকট অর্থহীন। ফলে নীতি কর্ম পালনে অক্ষম হলে ব্যক্তির কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকে না। দ্বিতীয়ত যদি নীতি পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত নীতি চয়ন করেন তবে তার জন্য ব্যক্তির বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগলেও তার নৈতিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা অঙ্কের কোন নিয়মটি প্রয়োগ করে উত্তর নির্ধারণ করতে পারব তা না বুঝলে আমাদের বৌদ্ধিক সামর্থ্য বিষয়ে

প্রশ্ন জাগে। অনুরূপভাবে বলতে হয় নীতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হলে আমাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের সামর্থ্যের অভাব আছে—একথা বলা হলেও আমাদের নৈতিকবোধের অভাব আছে এমন কথা স্বীকার করা হবে না। তাহলে সিদ্ধান্তের প্রতি ব্যক্তির নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে—এ কথাও বলা যাবে না। কিন্তু তাহলে কি ব্যক্তিকে কর্মকর্তারূপে অভিহিত করা সম্ভব হবে?

নীতির আবশ্যকতা ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে

নীতিনিষ্ঠ মতবাদ ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আচরণকে অস্বীকার করে। নীতিকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার কারণে ব্যক্তির কর্মের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি আশ্রিত হয়। ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা নীতি নির্বাচন করে নীতির ব্যক্তিনিরপেক্ষ মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেটিকে অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে। ব্যক্তির মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে এক্ষেত্রে কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিন্তু নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ একথা সর্বজনসিদ্ধ। সে কারণেই আমরা কোন শিশুকে তার কর্মের জন্য দায়ী বলে মনে করি না। সাধারণের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোন বালককে নৈতিক বিচক্ষণতাসম্পন্ন বলা যায় না। তার কারণ হলো ব্যক্তি তার জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সৎ কর্ম পালনের অভ্যাস করে তার নৈতিকবোধকে পরিণত করে। নৈতিকবোধ ক্রমশ উন্নতি লাভ করে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিচক্ষণতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম। প্রাত্যাহিক আচরণের মধ্যে দিয়ে আমরা সদ্‌গুণগুলি চরিত্রে অর্জন করি। এগুলি অভ্যাসজাত হওয়ায় অভিজ্ঞতা অর্জন আমাদের চরিত্র গঠনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই অভ্যাসজাত সদ্‌গুণগুলি আমাদের নৈতিক বিষয় সম্পাদনের জন্য মানসিক প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে। প্রবণতা সৎ হলে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এ কারণে সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিকগণ নৈতিক ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলনজাত সদ্‌গুণের প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তি সৎ আচরণ পালন করার জন্য সদ্‌গুণের অভ্যাস করবে। অর্থাৎ নৈতিক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যিক সুখ অর্থাৎ যশ, খ্যাতি ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু সদ্‌গুণ অনুশীলনের দ্বারা অন্তরের উৎকর্ষতা অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান। একজন খেলোয়াড় যেমন অনুশীলনের মাধ্যমে খেলার ক্রিয়াকৌশলের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে পরিণত হয়ে ওঠে, তেমনই নৈতিক ব্যক্তি সদ্‌গুণ চর্চার মাধ্যমে মনের উৎকর্ষতাকে উন্নত করতে সক্ষম। প্রকৃত ক্রীড়াপ্রেমী যেমন খেলার নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করে নিজের ক্রীড়াদক্ষতা প্রয়োগে নিপুণ খেলোয়াড় হয়ে

ওঠে, তেমনই নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন। এরূপ ব্যক্তি আদর্শ মানুষ বা model হিসাবে পরিগণিত হয়। ঠিক যেমন দক্ষ খেলোয়াড়ের ক্রীড়াকৌশল আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষানবীশ খেলোয়াড়রা তাকে অনুসরণ করে, তেমনি সৎ চরিত্রের অধিকারী আদর্শ ব্যক্তির চারিত্রিক সদ্‌গুণ অন্য ব্যক্তিরা অনুসরণ করে। কেবলমাত্র বৌদ্ধিক সামর্থ্য নৈতিক উৎকর্ষতার শর্ত হলে অনুসরণের প্রশ্ন উঠত না। কারণ ঐ সামর্থ্য সৎ ব্যক্তির কর্মগুলিকে অনুসরণ করে অভ্যাসের মাধ্যমে সামান্য উন্নত করা সম্ভব হলেও উৎকর্ষতার চরমে পৌঁছান সম্ভব নয়। আমরা যখন আদর্শ ব্যক্তিকে অনুসরণ করি তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত বোধগুলিকে অর্জনে সচেষ্ট হই, তাঁর বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে নয়। আমরা যখন বয়োজ্যেষ্ঠ্য ব্যক্তিদের উপদেশ শ্রবণ করি তখন প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভের চেষ্টা করি। নিছক নীতি অনুসরণ করলে আমাদের জীবন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নীতি ব্যক্তির মনোভাব (attitude) এবং প্রবণতাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, ব্যক্তির বিচার ক্ষমতাকেও সীমিত করে। কারণ নীতিগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করায় সেগুলিকে শর্তহীন আদেশ বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত নীতিকে কান্ট বিচার করতে বলেছেন যা ব্যক্তিসাপেক্ষতা দ্বারা মলিন হতে পারে। কিন্তু তিনি সর্বজনীন নিয়মগুলি বুদ্ধিপ্রসূত বলেই সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার কথা বলেননি। তাহলে বলতে হয় ব্যক্তি ঐ নীতিগুলিকে দ্বিধাহীনভাবে অনুসরণ করবে, তার বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্নই এখানে অবান্তর হবে। ফলে বলা যায় নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন কর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তির নৈতিক মনের গভীরতা এবং সমৃদ্ধিকে অস্বীকার করা হয়। বরং চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই ব্যক্তি প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিতে উন্নত হতে সক্ষম। ব্যক্তি যদি যথাযথ প্রবণতা, আবেগ অনুসরণে সমর্থ হয় তবেই তাকে মহৎ ব্যক্তি বলা যায়। আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই মহৎ এবং পাপী হওয়ার সামর্থ্য আছে বলে ম্যাকিনটায়ার[১৫] মনে করেন। মহৎ কর্ম সম্পাদন করার প্রবণতা আমাদের প্রকৃতিগত হলেও সেই সামর্থ্যকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের শৈশব থেকে প্রশিক্ষণ এবং অভ্যাস করতে হয়। আবেগহীন ব্যক্তি বুদ্ধি অনুসারে কর্ম পালন করলে সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিষয়েও প্রশ্ন দেখা যায়। কারণ নীতি প্রয়োগের জন্য আমাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অর্থাৎ অপর ব্যক্তিদের অবস্থান বিষয়েও আমাদের সচেতন থাকতে হয়, যেহেতু ঐ নীতি অনুসারে কৃতকর্ম ঐ ব্যক্তিদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিদের প্রয়োজন, স্বার্থ, আবেগকে বুঝতে হলে কর্মকর্তার মধ্যে উদারতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা নামক আবেগগুলি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এই আবেগগুলি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তবে আমরা দেখি যে, ব্যক্তি

অনেকসময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল কর্ম সম্পাদন করে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেকে সংশোধনের জন্য প্রস্তুত থাকে। আত্মসংশোধন তখনই সম্ভব হয় যদি ব্যক্তির মধ্যে উদারতা, বিনয় ইত্যাদি গুণগুলি বর্তমান থাকে। ম্যাকিনটায়ারের মতে, আমাদের এরূপ মনোভাবই আমাদের উৎসাহ দান করে ভাল কোন বিষয়কে গ্রহণ করতে এবং মন্দকে বর্জন করতে। যে ব্যক্তির ইচ্ছা সৎ, সেই ব্যক্তি অবশ্যই নিজেকে সংশোধন, পরিমার্জন করতে প্রস্তুত থাকবেন। যে ব্যক্তি নিজেকে উন্নত করতে আগ্রহী তাঁর নৈতিক চরিত্রকে আমরা প্রশংসা করি।

আমাদের নৈতিক দায়িত্ব যদি কেবলমাত্র কর্তব্য পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত তবে নীতি পালনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব সর্বদা কর্ম পালনের সাথেই যুক্ত নয়। আমাদের নৈতিক মনোভাব প্রতিফলিত হয় আমাদের জীবনে, পারস্পরিক সম্পর্কে, সমস্ত কর্মে। আমাদের জীবনে অনেক কর্মই আমরা পালন করি যা আমাদের কর্তব্য বলে গণ্য না হলেও তা পালন করাকে আমরা উচিত বলে মনে করি। মৃত্যুর পর অঙ্গদান করা আমাদের কর্তব্য বলে চিহ্নিত না হলেও এরূপ আচরণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ঐরূপ কর্ম না পালন করলে তাকে নিন্দা করা হয় না। কিন্তু এজাতীয় কর্ম পালন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই কর্মটি কিন্তু কোন সর্বজনীন নিয়মের নির্দেশে ব্যক্তি পালন করে না। এখানে ব্যক্তির উন্নত মানসিকতাই তাকে এরূপ কর্মে প্ররোচিত করে। সুতরাং কর্মকে কেবলমাত্র কর্তব্য এবং অকর্তব্য–এভাবে বিভাজন করলে তা যথাযথ হবে না। আবার কর্তব্য কর্ম হলেই তা ভালো হবে—এমন কথাও বলা যায় না। 'অপরের প্রাণ রক্ষা করা' যদি কর্তব্য বলে গণ্য হয় তবে দেশদ্রোহীর প্রাণ রক্ষা করাও কর্তব্য এবং তাকে শাস্তি দানে সহায়তা করা অকর্তব্য বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, এরূপ কর্ম প্রশংসারই যোগ্য। সুতরাং নীতি অনুসারে কর্ম পালনই যথেষ্ট নয়। আমাদের মনে বিভিন্ন সৎ আবেগের কর্ষণ নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সৎ আবেগের উপস্থিতির কারণেই ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে নির্ণিত সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে পারেন এবং তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তকে পরিশুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতে পারেন। কারণ আমরা নৈতিকতায় শ্রেষ্ঠত্বকে অর্জন করতে চাই। সমাজে প্রচলিত প্রথা, রীতি নীতি অনুসারে আমার মনোভাব, প্রবণতা তৈরী হলেও ভাল কোন কিছুকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ কারণে, ডেভিড পিজারিও[২৬] বলেছেন, বিনয়, উদারতা এই সকল সৎ আবেগ আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এ কারণে আমরা অপরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে গ্রহণ করতে সমর্থ হই। এরূপ মনোভাব আমাদের পক্ষপাতমূলক বা সংকীর্ণ মনোভাবকে পরিশোধন করে বৃহত্তর উদার মনোভাবের অধিকারী করে। এই কারণে আমরা কেবলমাত্র আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মহৎ ব্যক্তিকেই প্রশংসা করি, বিশ্বের মহান

ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করি এবং নিজেদের অপূর্ণতাকে সংশোধন করে তাদের মনোভাবে ভাবিত হওয়ার প্রচেষ্টা করি। আমরা আমাদের জীবনে সদ্‌গুণবান মানুষকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে তাঁকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। সেখানে দেশ, কাল, জাতির বেড়াজাল থাকে না। আমরা একথা কেউই অস্বীকার করতে পারি না যে, আমরা জীবনে ক্রমশ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টা করি। প্রকৃত নৈতিকবোধই ব্যক্তিকে মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত করে, যেখানে কর্তব্যবোধের শৃঙ্খল থাকে না।

নৈতিক ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি যিনি শুভ বা মঙ্গলময় জীবন অতিবাহিত করতে চাইবেন তিনি অবশ্যই তাঁর প্রেষণা এবং বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবেন। ব্যক্তি তার প্রেষণা বা উদ্দেশ্যকে বর্জন করলে জীবনের সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলবে, যন্ত্রে পরিণত হবে। ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করবে যে, অনৈতিক কর্ম মন্দ, ক্ষতিকারক ফল উৎপাদন করবে এবং নৈতিক কর্ম ভাল, মঙ্গলময় বা শুভ ফল উৎপন্ন করবে তখন ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই তার কর্ম সম্পাদন করবে। তার দায়িত্ববোধই তাকে সমাজের জন্য মঙ্গলকারী কর্ম পালনে সাহায্য করবে। তার এই নৈতিক দায়িত্ববোধের কারণেই সে নৈতিক কর্ম সম্পাদন না করার জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা বোধ করবে। নীতিনিষ্ঠ মতবাদে কর্মকর্তার নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ উপস্থিত থাকে। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কর্মের লক্ষ্যের সাথে কোনরূপ মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ হন না বলে কর্মকর্তার মধ্যে অনুতাপ, অনুশোচনা উপস্থিত থাকে না। নৈতিক দায়িত্ববোধ কেবলমাত্র তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা থেকে নিঃসৃত হয় না, তার মানবিকতাবোধের মধ্যে নিহিত থাকে। এরূপ ব্যক্তিকেই বিচক্ষণ ব্যক্তি বলা হয় যিনি তাঁর বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থান বজায় রাখতে সমর্থ। ব্যক্তি বিচক্ষণ বলেই নিজের জীবনের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কোনগুলি চরম লক্ষ্যের সহায়ক হবে তার জ্ঞান দ্বারা নিজের কর্ম নির্বাচন করে। শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা ব্যক্তি এই মঙ্গলময় জীবনকে নির্ধারণ করতে সমর্থ হবে না। সমাজ সুন্দরভাবে গঠনের জন্য কেবলমাত্র সর্বজনীন নীতি অনুসরণই যথেষ্ট নয়। কোন ব্যক্তি কেন ঐ নীতিটি লঙ্ঘন করেছে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি যদি তার কর্মের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় তবেই আমরা তার কর্মটিকে বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি বলতে পারি। সুতরাং অন্ধভাবে নীতি অনুসরণ নয়, কেন নীতিটি অনুসৃত হলো অথবা হলোনা তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। এই বিচক্ষণতার মধ্যেই উপস্থিত রয়েছে ব্যক্তির বুদ্ধি, তার আবেগ, প্রবণতা, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদি।

বুদ্ধির আধিপত্য ব্যক্তির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে

সার্বিকতার ধারণা লক্ষ্য করা যায় ফ্রান্সে Enlightenment যুগে নীতিসংক্রান্ত আলোচনায়। ফ্রান্সের নীতিদার্শনিকেরা আপেক্ষিকতাবাদী ও সংশয়বাদীদের বিরোধিতা করে সর্বজনীন নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করেছেন। আপেক্ষিকতাবাদীরা মনে করেন, প্রকৃতি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যেই সুপ্ত আছে নৈতিকতা, প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে যার কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতির রাজ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। নৈতিকতার রাজ্যেও 'একক' মানদন্ডের দ্বারা ব্যক্তির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে ফ্রান্সের নীতিদার্শনিকেরা বলেন, মানব প্রকৃতির মধ্যে একতাকে অস্বীকার করা যায় না। নৈতিক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের কোন মূল্য নেই। এই যুগে নৈতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক সত্তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি নৈতিক পদ্ধতিরূপে বিবেচিত হয়। বুদ্ধিই এই যুগে জ্ঞান আহরণের একমাত্র মানদন্ড বলে গণ্য হয়। ফলস্বরূপ ঈশ্বরের আদেশরূপে প্রচলিত প্রথা, এমনকি সমাজে অবৌদ্ধিক বা যুক্তিহীন আচার আচরণের জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়। ফ্রান্সের এই সকল নীতিদার্শনিকদের বিরোধিতা করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব প্রদানকারী দার্শনিক বোডিন, মন্টেস্কু প্রমুখেরা বলেন যে, এই যুগে মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে মানুষকে একটি সামান্য ধারণারূপে গ্রহণ করা হচ্ছে। মানবিকসত্তাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে একটা প্রজাতি (species), যেমন প্রাণী, গাছপালা এইভাবে। প্রকৃতিগত দিক দিয়ে সমান বিচার করে ব্যক্তির প্রবণতা, আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সৃজনশীলতা ইত্যাদিকে মূল্যহীন বলে মনে করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যকে অস্বীকার করে সকলের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করার কথা বলা হলো। আর এখান থেকেই নৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক নীতি অনুসরণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো-- যে নীতি কোনভাবেই ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা, তার চাহিদা, সুখ দুঃখের সাথে সম্পর্কিত নয়। এখানে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, তার মানবিক গুণ – সবগুলিই উপেক্ষা করা হচ্ছে। বিষয়টি এমন যে, নিউটনের পদার্থবিদ্যায় যেমন বস্তুর বাহ্যরূপ পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রকৃতি বিষয়ে একটি সাধারণ নীতি গঠন করা হয় তেমনি নীতিবিদ্যায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে নীতির দ্বারা ভালো-মন্দের ধারণা গঠন করা হয়। কিন্তু এঁদের মতে, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার আদর্শ বা মানদন্ড স্থান, কাল, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় যেটি সত্য বলে প্রতীয়মান হবে সেটিই তার নিকট সত্য। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তি যেটিকে যথোচিত মনে করবে সেটিই যথোচিত হবে। ব্যক্তির নিকট যেটি সুখ বা আনন্দদায়ক বলে প্রতীয়মান হবে সেটিই তার নিকট যথোচিত। ফলে ব্যক্তির

বিভিন্নতাকে গুরুত্ব দিতে হয়। মানুষের মধ্যে রয়েছে চিন্তা করার, নির্বাচন করার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার শুধু মানুষেরই রয়েছে। তা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। বোডিন, মন্টেস্কু প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেন, আগুন সর্বত্র দহন করে – একথা ঠিক। কিন্তু জড়ের এরূপ প্রকৃতি অনুসারে নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হল একটি ধারালো ছুরি প্রয়োগ করে বৃক্ষের সমস্ত ডালপালাকে ছেদন করা। এঁদের মতে, প্রকৃতির বিভিন্নতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভৌগলিক বিভিন্নতা অনুসারে মানুষের সামাজিক বিশ্বাস ও আচরণ ভিন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসগুলিকে সাধারণ নীতির অন্তর্ভুক্ত করে সার্বিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা সঠিক নয়। নৈতিক ক্ষেত্রে পূর্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে কিছু নেই, এটি বাস্তব বিষয়। পূর্বতসিদ্ধ সত্য এবং বাস্তব সত্যের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক নিরূপণ করার চেষ্টা বৃথা বলে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম [২৭] মনে করেন।

ফ্রান্সের Enlightment যুগের দার্শনিকেরা, যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেননি, তাঁরা মনে করেন, অভিন্নতা স্বীকার করার কারণ হলো যে, মানুষের জৈবিক, শারীরিক বা মানসিক ভিন্নতা থাকলেও ব্যক্তিদের মধ্যে পরম লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের সমমনস্কতা। শাশ্বত নীতিকে অনুসরণ করেই উৎকৃষ্ট মানুষ পরিণত হতে পারে। এই যুগে নৈতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক নীতিগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত সত্যকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে বৌদ্ধিক নীতির একক মাত্রার দ্বারা। কিন্তু হাম্যান[২৮] বলেন, বুদ্ধি নয়, ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৈতিক সত্যতার জ্ঞান লাভ করতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে বস্তুর প্রতি আস্থা বা faith হল সেই সত্যতার ভিত্তি। যেমন, কোন ব্যক্তি খাদ্য বিষয়ে তখনই নিশ্চিত সত্য জ্ঞান লাভ করে যখন সেই ব্যক্তি বস্তুটির (খাদ্য) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ব্যক্তি ঐ বস্তুটির প্রতি আস্থা লাভ করলেই সে ঐ খাদ্য বিষয়ে সত্য জ্ঞান লাভ করে। ফলে সত্য জ্ঞান হল সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত উপাদানের ভিত্তিতে লাভ করা বিষয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সত্যতা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। নৈতিক ক্ষেত্রেও বৌদ্ধিক নীতিকে একমাত্র অনুসরণ করার অর্থ হল প্রকৃতি সম্পর্কে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে মেনে নেওয়া। শুধুমাত্র নীতি অনুসরণ ব্যক্তিকে প্রকৃতি নিরপেক্ষ করে তুলবে, প্রকৃতির সাথে সম্পর্কহীন অবস্থা তৈরী হবে। ফলে অনুভূতির সাহায্যে ব্যক্তি যে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যাকে সামাজিক বন্ধন বলা হয়, সেই সামাজিক সম্পর্কে ব্যক্তিসত্তা উপেক্ষিত হবে। হাম্যান-এর মতে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বৌদ্ধিক নীতি অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজ হবে। কেননা ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াসমূহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখতে পারবে। সেক্ষেত্রে প্রকৃতির

বৈচিত্র্যতার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করবে না। শুধুমাত্র ঐ পরিস্থিতিতে বৌদ্ধিক নীতি প্রয়োগ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হবে। অপর ব্যক্তির চিন্তা, ভাবনা, আগ্রহ, ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে নীতি প্রয়োগ করাই একমাত্র লক্ষ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ দুঃখকে ভুলতে চায়, আনন্দকে পেতে চায়। ভালোবাসা, ঘৃণা, সহযোগিতা, অপরের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া – এগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যক্তি সমাজের মধ্যে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলে। হার্ডার-ও[২৯] বিশ্বাস করেন, ব্যক্তি নিজস্ব প্রচেষ্টার দ্বারা নৈতিক মূল্যকে গঠন করে। ব্যক্তিগত চরিত্র, ব্যক্তির সৌন্দর্যের অনুভূতি, নিজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক বোধ –এগুলি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব। ফলে ব্যক্তির আচরণকে বুঝতে হলে ব্যক্তির মানবিক ও বাহ্যিক শর্তাবলিকে বুঝতে হবে। শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নীতি প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তির নৈতিক ধারণাকে জানা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাহলে মানবিক গুণের অবনতি ঘটবে। পারস্পরিক আনন্দদায়ক অনুভূতির সেক্ষেত্রে অভাব হবে। প্রকৃত মানসিক গুণসম্পন্ন মানুষ, যার আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা, ভালবাসা, নীতিবোধ আছে সেইরূপ মানুষ অন্তর্হিত হবে। তাই বলা যায়, বুদ্ধিনিষ্ঠ নীতি ব্যক্তিকে যন্ত্রমানবে পরিণত করবে। হাম্যান বলেন, প্রকৃতি হল wild dance।[৩০] একে বুদ্ধির একক নীতি দ্বারা বন্দী করার ভাবনা হল 'শিশুসুলভ' আচরণ।

নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগকে অস্বীকার করে বুদ্ধিনিষ্ঠ নীতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষকে একই কাঠামোয় চিত্রিত করার প্রচেষ্টা করা হয় বলে ব্যক্তিমানুষ পরিণত হয় সার্বিক আকারসর্বস্ব মানুষে। কিয়ের্কেগার্ড[৩১] এ প্রসঙ্গে বলেন, সাধারণ জনতার মধ্যে সমতা *আনয়ণ* করার পদ্ধতি ব্যক্তির স্বকীয়তাকে বিনষ্ট করে। গোষ্ঠীচেতনার পীড়নে অবহেলিত হয় ব্যক্তিচেতনা। 'জনতা' (Public)নামক একটি অবাস্তব কাল্পনিক বস্তু লাভ করাকেই অত্যাবশ্যক বলে ধরা হয়। 'মানুষ' শুধুমাত্র একটি সমষ্টিগত ধারণা নয়। ব্যক্তি হিসাবে আবেগ এবং দায়বদ্ধতা— এই দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক। Enlightment যুগের নীতি দার্শনিক মানুষের আবেগতাড়িত দায়বদ্ধতার বিষয়কে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তার পরিবর্তে তাঁরা ধীশক্তি (understanding) এবং মানুষের মননের (reflection) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে মানুষ বৌদ্ধিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে ('how to live a good life') সেকথা তারা বিস্মৃত হয়েছেন। ব্যক্তিনিরপেক্ষ মননশীলতা ব্যক্তির অস্তিত্বকে নিতান্তই আকস্মিক ঘটনায় পর্যবসিত করেছে। ব্যক্তিসাপেক্ষতা ব্যতীত এই 'ব্যক্তি'র অস্তিত্ব উপলব্ধি সম্ভব নয়। কিয়ের্কেগার্ডের মতে, ব্যক্তিগত মানসিক বিশেষত্বকে অস্বীকার করে বা তার উর্দ্ধে উঠে বিমূর্তকরণের দ্বারা সার্বিক সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব

নয়। নৈতিক ক্ষেত্রে বিষয়গত সত্যতা প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিকে মূল্যহীন করে তোলে। যদি আমরা কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রয়োগ করি তবে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলির কোন মর্যাদা থাকে না। কিন্তু যখন অবস্থাকে বিচার করে নীতি প্রয়োগ করা হয় তখন ঐ বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিকতা, তার প্রবণতা, আবেগ, ইচ্ছা ইত্যাদিকে জানা এবং সেগুলির যথার্থতা বিচার করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। ফলে দেখা যায় নৈতিক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বুদ্ধির চেয়ে অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন কিয়ের্কেগার্ড। মানবিক ইচ্ছা, কামনা বাসনা, অনুভূতি সম্পর্কিত জীবনেই আমাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নিহিত। যুক্তি বা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিনিরপেক্ষ তত্ত্ব তাঁর মতে আমাদের মনের কৃত্রিম সৃষ্টি।

উপরোক্ত পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষের অনুভূতিগত জীবন, এবং যুক্তিশাসিত জীবন এই দুটি জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে এদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মধ্যেই মানুষের আদর্শ জীবনযাপন সম্ভব হবে। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি এবং বিচারবুদ্ধি এদেরকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যথাযথ নয়। এই দুটি সমন্বিত করে মানুষের চরিত্রের বিকাশ ঘটে। পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ হল পরিপূর্ণ আনন্দ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত নৈতিক আদর্শ নিহিত। অসংযত ইন্দ্রিয় সুখের অন্বেষণ দুঃখের কারণ। কিন্তু মানুষের দৈহিক আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, আবেগ এগুলিকে অস্বীকার করাও যায় না। প্রবৃত্তি পাপ নয়, তবে তার মাত্রা অতিক্রম করা অন্যায়। সে কারণে এ্যারিস্টটলের মতে, মিতাচার, সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ হলো যথাযথ আবেগ। সুতরাং কামনা বাসনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে বিচার এবং যুক্তিকে সম্পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করা এবং ইন্দ্রিয় আবেগকেও স্বীকার করা প্রয়োজন। যখন তার বুদ্ধির বিরোধিতা করে না, ব্যক্তির অনুভূতি তখনই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে মানুষের আবেগ ও যুক্তির জীবনকে স্বীকার করার মধ্যেই প্রকৃত আদর্শ নিহিত। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিদার্শনিকেরা নৈতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও আবেগের সহাবস্থানকে গুরুত্ব দেননি, ভারতীয় বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায়ও নৈতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের সমান গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বে বলা হয়েছে একজন নৈতিক ব্যক্তি দুটি গুণ সম্পন্ন হবেন। পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ব্যক্তি করুণা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন। অর্থাৎ একজন নৈতিক ব্যক্তির হৃদয়ে থাকবে আবেগ এবং তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হবেন। বৌদ্ধিক সত্তা এবং হৃদয়ের আবেগ উভয়ের সমান অবস্থানে ব্যক্তি নৈতিক ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবেন। যদি ব্যক্তি কেবলমাত্র বৌদ্ধিক সত্তা অর্থাৎ প্রজ্ঞার অধিকারী হন, এবং আবেগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন

করেন তাহলে সেই ব্যক্তি 'hard-headed intellect'[৩২] বলে বিবেচিত হবেন। অপর ব্যক্তির প্রতি তার কোন অনুভূতি থাকবে না। আবার যদি ব্যক্তি কেবলমাত্র আবেগকে গুরুত্ব দেন এবং প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করেন তাহলে ব্যক্তি হবেন 'good- hearted fool'।[৩৩] সুতরাং একজন সম্পূর্ণ নৈতিক ব্যক্তি প্রজ্ঞা এবং আবেগ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেবেন। বুদ্ধদেবের মতে, প্রজ্ঞা এবং আবেগের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান।

তথ্যসূত্র

১) সলোমান, রবার্ট, ১৯৭৭

২) বেনজেভ, এ্যারন, ২০১০, পৃ ৪৫

৩) বেনজেভ, এ্যারন, ১৯৯৭, পৃ ১

৪) ফ্রিজদা, নিকো. এইচ, ১৯৮৮, পৃ ৩৫২

৫) বেনজেভ, এ্যারন, ১৯৯৭, পৃ ১

৬) বর্জেস, মারিয়া, ২০০৪, পৃ ২৫২

৭) বেনজেভ, এ্যারন, ১৯৯৭, পৃ ৪

৮) ভেলেম্যান, ডেভিড, জে, ১৯৯৯, পৃ ৩৪৯

৯) ব্রাণ্ডট, আর, বি, ১৯৫৯,

১০) স্টাটম্যান, ডানিয়েল, ১৯৯৭, পৃ ৪

১১) এ্যানস্কোম্ব, জি. ই. এম, ১৯৫৮

১২) ফুট, ফিলিপা, ১৯৭৮, পৃ ১৬৯

১৩) মিল, জে, এস, ১৯৬৪

১৪) কান্ট, ইমানুয়েল, ১৭৮৫

১৫) রলস, জন, ১৯৯৯, পৃ ৩

১৬) ঐ, পৃ ১০

১৭) ঐ, পৃ ১৭

১৮) ভাণ্ডারী, ডি. এইচ. সেঠী, ১৯৭৪

১৯) পোজম্যান, পি, লুইস, ১৯৯০, পৃ ১১৯

২০) বস্টক, ডেভিড, ২০০০, পৃ ৪৬

২১) স্টকার, মাইকেল, ১৯৭৬, পৃ ৪৫৪

২২) ম্যাকেঞ্জি, জে, এস, ১৯২৯

২৩) আনা, জুলিয়া, ২০০৭, পৃ ৭৩৭

২৪) ঐ, পৃ ৭৩৭

২৫) ম্যাকিনটায়ার, এ, ১৯৯৭, পৃ ১৩৮

২৬) পিজারো, ডেভিড, ২০০২, পৃ ৩৭১

২৭) *দি কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট,* পৃ ১২

২৮) ঐ, পৃ ১২

২৯) ঐ, পৃ ১৪

৩০) ঐ, পৃ-১৮

৩১) কিয়ার্কেগার্ড, সোরেন, ২০০৯

৩২) কেওন, ডামিয়েন, ২০০১, পৃ ১০

৩৩) ঐ, পৃ ১০

সূত্রনির্দেশ

১। আনা, জুলিয়া, (২০০৭), 'বিয়িং ভারচুয়াস এণ্ড ডুয়িং দি রাইট থিং', শেফার রুস লানডেউ সম্পাদিত, এথিক্যাল থিওরী, *এন এ্যান্থোলজি,* ব্ল্যাকওয়েল পাবলিসিং, ইউ, এস, এ

২। এ্যানস্কোম্ব, জি. ই. এম, (জানুয়ারী, ১৯৫৮), 'মডার্ণ মরাল ফিলোজফি', *ফিলোজফি,* ভলিউম ৩৩, নং-১২৪, পৃ ১-১৯

৩। কান্ট, ইমানুয়েল, (১৭৮৫), *গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দি মেটাফিজিক অফ মরালস,* প্যাটন, এইচ, জে অনূদিত, দি মরাল ল, হাচিসন, লণ্ডন

৪। কেওন, ডামিয়েন, (২০০১), *দি নেচার অফ বুদ্ধিষ্ট এথিক্স,* পালগ্রেভ, নিউইয়র্ক

৫। কিয়ার্কেগার্ড, সোরেন, (২০০৯), *কনক্লুডিং আনসাইন্টিফিক পোস্টস্ক্রিপ্ট টু দি ফিলোজফিক্যাল ক্রুম্বস,* হান্যী, এ্যালাসটেয়ার সম্পাদিত, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ইউ, কে

৬। *দি কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট,* ওয়েবমাস্টার@প্রেস.প্রিন্সিটন.এডু

৭। পিজারো, ডেভিড, (ডিসেম্বর, ২০০২), 'নাথিং মোর দ্যান ফিলিং? দি রোল অফ ইমোশানস ইন মরাল জাজমেন্ট,' *জার্নাল ফর দি থিওরী অফ সোস্যাল বিহেভিয়ার,* ভলিউম ৩, নং-৩, পৃ ৩৫৫-৩৭৫

৮। পোজম্যান, পি, লুইস, (১৯৯০), *এথিক্স, ডিসকভারিং রাইট এন্ড রং,* ওয়াডসওয়ার্থ পাবলিসিং কোম্পানী, বেলমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া

৯। ফুট, ফিলিপা, (১৯৭৮), *ভারচু এণ্ড ভাইস,* ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

১০। ফ্রিজদা, নিকো. এইচ, (১৯৮৮), *দি লজস অফ ইমোশান,* ইউনিভার্সিটি অফ আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস

১১। বস্টক, ডেভিড, (২০০০), *এ্যারিস্টটল'স এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক

১২। বর্জেস, মারিয়া, (মার্চ, ২০০৪), 'হোয়াট ক্যান কান্ট টিচ আস এ্যাবাউট ইমোশান?', *দি জার্নাল অফ ফিলোজফি,* ভলিউম-১০১, নং-৩, পৃ ১৪০-১৫৮

১৩। বেনজেভ, এ্যারন, (২০১০), 'দি থিংস কলড ইমোশান,' গোলডি পিটার অনূদিত, *ফিলোজফি অফ ইমোশান,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৪। বেনজেভ, এ্যারন, (১৯৯৭), 'অন ইমোশান, ইমোশান এণ্ড মরালিটি', *দি জার্নাল অফ ভ্যালু ইনকোয়ারী,* ভলিউম, ১, নং-১৮, পৃ ১-২৬

১৫। ব্রাণ্ডট, আর, বি, (১৯৫৯), *এথিক্যাল থিয়োরী,* এঙ্গেলউড ক্লিফস, প্রেন্টিস হল

১৬। ভাণ্ডারী, ডি. এইচ. সেঠী, (১৯৭৪), *স্টাডিস ইন প্লেটো এণ্ড এ্যারিস্টটল* , স্কনড্রা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী

১৭। ভেলেম্যান, ডেভিড, জে, (জানুয়ারী, ১৯৯৯), 'লাভ এজ এ মরাল ইমোশান', *এথিক্স,* ভলিউম, ১০৯, নং-২, পৃ ৩৩৮-৩৭৪

১৮। মিল, জে, এস, (১৯৬৪), *ইউটিলিটারিয়ান,* নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন

১৯। ম্যাকেঞ্জি, জে, এস, (১৯২৯), *এ ম্যানুয়াল অফ এথিক্স,* ইউনিভার্সিটি টিউটোরিয়াল প্রেস, অক্সফোর্ড

২০। ম্যাকিনটায়ার, এ, (১৯৯৭), 'দি নেচার অফ দি ভারচুস,' ক্রিস্প, রজার এণ্ড স্লট, মাইকেল অনূদিত *ভারচু এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক

২১। রলস, জন, (১৯৯৯), *এ থিয়োরী অব জাস্টিস,*' অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, নিউইয়র্ক

২২। সলোমান, রবার্ট, (১৯৭৭), *দি প্যাসান,* নিউ ইয়র্ক, ডাবলডে

২৩। স্টকার, মাইকেল, (আগষ্ট, ১২, ১৯৭৬), 'দি স্কিজোফ্রেনিয়া অফ মডার্ণ এথিক্যাল থিওরীস, *দি জার্নাল অফ ফিলোজফি,* ভলিউম ৭৩, নং-১৪, পৃ ৪৫৩-৪৬৬

২৪। স্টাটম্যান, ডানিয়েল, (১৯৯৭), *ভারচু এথিক্স,* এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি, এডিনবার্গ

পঞ্চম অধ্যায়

আবেগের নৈতিক মূল্য

আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিনিষ্ট দার্শনিকেরা বুদ্ধিনির্ভর নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হলেও ব্যক্তির প্রকৃতিতে আবেগের উপস্থিতিকে তাঁরা অস্বীকার করেননি। তবে আবেগকে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায়রূপে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কান্ট বুদ্ধিনির্ভর মতবাদ প্রকাশ করলেও সুখকে বা ব্যক্তির সুখী জীবনযাপনকে কর্তব্য বলেই মনে করেছেন। এমনকি কর্তব্য কর্ম পালনের ফলে অনুভূত আনন্দকেও অস্বীকার করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, সুখী না হলে অপর ব্যক্তিকে সুখী করা যায় না। সেই কারণে আমাদের জীবন আনন্দপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আনন্দ বা সুখানুভূতি নৈতিক কর্ম পালনের ফলরূপে কাঙ্ক্ষিত হলেও ঐ সুখলাভ যেমন আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিগত অনুভূতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় হতেও পারে না। কারণ কান্ট মনে করেন, কর্তব্য পালনের মনোভাবই একমাত্র মনোভাব যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হওয়া উচিত। ফলে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আবেগ অস্বীকৃত। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কান্ট আবেগকে নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তিনি আবেগের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের সর্বজনীনতা বিঘ্নিত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। নৈতিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান মনোভাব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন বলে সকল ব্যক্তিকেই তিনি লক্ষ্যরূপে গণ্য করার কথা বলেছিলেন। কোন ব্যক্তিকেই তিনি কেবলমাত্র উপায় বলে মনে করেননি। এরূপ সাম্যের মনোভাবের কারণেই তিনি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেগের ব্যবহারকে অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা এ বিষয়ে কান্টের বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি তার চরিত্রের নৈতিক আবেগ, সৎ প্রবণতা ইত্যাদিকে নৈতিক সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কারণ সিদ্ধান্ত ব্যক্তির চরিত্র থেকে নিঃসৃত হয় বলে চরিত্রে উপস্থিত প্রবণতাগুলির প্রভাবকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অস্বীকার করতে পারি না। এই সকল দার্শনিকেরা কান্টের বিরোধিতা করেন, কারণ তাঁরা ব্যক্তির কর্মকে নয়, ব্যক্তির চরিত্রকেই মৌলিক নৈতিক অবধারণের বিষয় বলে মনে করেন। চরিত্রের মূল্যায়নের জন্য চরিত্রে উপস্থিত গুণাবলি, প্রবৃত্তি, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবণতা ইত্যাদির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আবেগগুলি বিচারের দ্বারাই সেগুলির নৈতিক মর্যাদা নির্ণয় করা

হয়। এভাবেই আবেগের ব্যক্তিসাপেক্ষতা অস্বীকৃত হয়। যে সকল দার্শনিক সদ্‌গুণকে নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করতে ইচ্ছুক তাঁরা নৈতিক আবেগকে সদ্‌গুণ বলে মনে করেন বলেই আবেগকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায়রূপে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যাকে স্বীকার করেন না। বরং সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্তির নিজস্বতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে করেন। কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কীরূপ আচরণ করবে তার নির্ধারক ব্যক্তি ও তার ইচ্ছা, আবেগ, চরিত্র ইত্যাদি। ব্যক্তির নিজস্ববোধের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বীকার করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল নৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ববোধকে প্রতিষ্ঠা করা। বাস্তব জীবনে আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতিতে দুজন ব্যক্তি ভিন্নরূপ আচরণ করেন, কারণ তাঁদের আচরণের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়।

সিদ্ধান্ত যদি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবেই ব্যক্তিকে তার সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী বলা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকার অর্থ হল ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার নিজস্ব মতামত বা বিবেচনা অনুসারে কোন কর্মটি সঠিক—তা নির্ধারণ করে। বার্নাড উইলিয়মস[১] মনে করেন, একই সমাজে দুজন ব্যক্তির মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও উভয়ই সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে। ফলে একই পরিস্থিতিতে দুজন ব্যক্তি নিজস্ব যুক্তি দ্বারা নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যুক্তিগুলি যথার্থ হলে কোন মতকেই ভ্রান্ত বলা সঙ্গত নয়। যেহেতু নৈতিক অবধারণ কোন একটি বাস্তব সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে না, বা এটি কোন বর্ণনাত্মক অবধারণ নয়, মূল্যাবধারক অবধারণ, সে কারণেই অবধারণের সত্যতা যাচাই করার জন্য বাস্তব বিষয়ের সাথে সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। বানার্ড উইলিয়ামস মনে করেন, যুক্তির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে যদি সেটি ব্যক্তির উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তার ইচ্ছা, নীতিবোধ, মনোভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা মিথ্যা বাক্যকে অন্যায় বলে মনে করলেও মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে সান্ত্বনাদানের জন্য মিথ্যা বলাকেই ন্যায্য বলে বিবেচনা করি। অর্থাৎ যখন কোন কর্ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন আমরা পরিস্থিতির বিচার করে কর্মের ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে কর্মের উদ্দেশ্যটি নির্ণয় করি। আমার কৃতকর্ম অন্য ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে—এই ধারণাই আমাকে প্ররোচিত করে পরিস্থিতি বিচার করতে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মানবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বলেই, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অনুভব করে বলেই কর্ম পালনের পূর্বে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে। বলা যায়, অপর ব্যক্তির সুখ-দুঃখ; মঙ্গল-অমঙ্গল ব্যক্তিকে উদ্বেলিত করে বলেই ব্যক্তি পরিস্থিতি বিচার করে। ব্যক্তি যখন যুক্তি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তখন তার আবেগও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমানকালের অনেক দার্শনিকই কেবলমাত্র সর্বজনীন নীতি প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে স্বীকার করতে স্বীকৃত নন। ব্যক্তি যে আদর্শমূলক যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হবে এমন তাঁরা মনে করেন না। এই সকল দার্শনিকেরা যেমন বার্ণাড উইলিয়মস[২] মনে করেন ব্যক্তি প্রদত্ত যুক্তিগুলি অবশ্যই তার জীবনের লক্ষ্য, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তির অন্তরের যুক্তিই কর্মটিকে আদর্শ বলে প্রতিষ্ঠা করবে। যুক্তিগুলি ব্যক্তির অন্তরের, নিজস্ব জীবনবোধ প্রসূত হলেও, যেহেতু সেটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিচক্ষণতার দ্বারা নির্ণিত হবে তাই ঐ সকল যুক্তিগুলি কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করবে না। ব্যক্তির মানসিকতা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় তা স্পষ্ট হয় যদি আমরা একই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির বর্ণনা লক্ষ্য করি। একই পরিস্থিতি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে। ঘটনার বর্ণনার মধ্যেই ব্যক্তির মনোভাব প্রতিফলিত হয়। ফলে বিবরণটি নিছক বিবরণ না হয়ে তার অতিরিক্ত কিছু হয়ে ওঠে। এটিকেই অতি সামগ্রিকতাবাদ বা Holism[৩] বলা হয়। যুক্তি বলতে Reason-Internalistরা তাই ব্যঞ্জনাকে (sense) না বুঝে, জ্ঞাতব্য বিষয়কে (Reference) বুঝেছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৌশিক মুনি পরিস্থিতি বিচার না করে কেবলমাত্র 'সত্য কথা বলা উচিত'—এই নীতির দ্বারা চালিত হওয়ার জন্য তার নরকবাস হয়। কেননা নৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিস্থিতিতে সত্য বলা হচ্ছে এবং কাকে সত্য বলা হচ্ছে সে বিষয়ও বিচার করা প্রয়োজন। এখানে কৌশিক মুনি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। প্রতিজ্ঞা পালনকে তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কোন পরিস্থিতিতে কার উদ্দেশ্যে সত্য ভাষণ করছি, এবং সত্য ভাষণের ফল কি হতে পারে—-সেগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে না বুঝে সত্যভাষণ করেছিলেন বলে তার নরকবাস হয়। শুধু শব্দের অর্থ নয়, বা শুধু নীতির অর্থ নয়, সেটি প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে তার ফলাফল কী হবে, সেটি কীভাবে অপরের জীবনকে প্রভাবিত করবে সেগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনেকেই বলতে পারেন যে, সাধারণত আমরা দেখি একই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি সমরূপ আচরণ করে। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তির আবেগ বা নৈতিকবোধ নয়, পরিস্থিতিই ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গঠনের সহায়ক। জার্মান নাৎসী বাহিনীর সৈন্যদের প্রত্যেকেই অত্যাচারী ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ পরিস্থিতিই তাদের ঐরূপ আচরণের কারণ। ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা আবেগ তাদের আচরণের কারণ হলে এরূপ একরূপতা প্রত্যক্ষ করা যেত না। কিন্তু এ যুক্তিটি সঠিক নয়। প্রতিটি ব্যক্তি একইরূপ আচরণ করলেও তারা কী কারণে ঐরূপ আচরণ করছে সেটি অনুধাবন

করলেই বা অনুসন্ধান করলেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে। কোন ব্যক্তি হয়ত হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণেই ঐরূপ অত্যাচারী আচরণ সানন্দে পালন করছে, আবার কোন ব্যক্তি হয়ত প্রাণ ভয়ে বাধ্য হয়ে তার চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে বা কর্তৃপক্ষের পীড়নের ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন আচরণ করছে। তার মনে প্রবল দ্বন্দ্ব থাকায় ঐরূপ কর্ম সম্পাদনে সে মনে কোন আনন্দ অনুভব করছে না। আবার এমনও হতে পারে, কোন ব্যক্তি সেনাধ্যক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকেই কর্তব্য বলে মনে করে বলে সেনাধ্যক্ষের প্রতি বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ঐরূপ আচরণ করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে প্রতিটি ব্যক্তিই সমরূপ আচরণ করলেও তাদের আচরণের উৎস যে আবেগ তা ভিন্ন প্রকার। কোন ক্ষেত্রে হিংসাত্মক বৃত্তি চরিত্রে উপস্থিত থাকায় সাগ্রহে, আনন্দের আতিশয্যে ব্যক্তি ওই কর্ম পালন করেছে, কোথাও বা আত্ম-প্রেম বা ভীতি তাকে ঐরূপ কর্ম পালনে বাধ্য করেছে। আবার কোথাও কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকেই সে কর্তব্য বলে মনে করায় ঐরূপ আচরণ পালন করছে। অর্থাৎ আচরণ একরূপ হলেও তার উৎসটি ভিন্ন ভিন্ন। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলায় ভারত জয়লাভ করলে যখন ভারতবাসী বলে আমরা গর্ব অনুভব করি এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি তখন আমাদের সমরূপ আচরণের উৎস হলো আমাদের সকলের নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। ভালোবাসা না থাকলে আমরা ভারতের ক্রিকেট দলকে সরবে সমর্থন করতাম না। কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা চালিত হলে খেলাটি যে দল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধা করেছে তাকেই আমরা সমর্থন করতাম। ফলে প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে আবেগগুলি প্রতিফলিত হয়।

নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ বলতে হলে আবেগ সম্পর্কে ধারণাটিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। নৈতিক কর্মের সহায়ক হতে গেলে আবেগকে নিছক একটি ক্ষণিক মানসিক অবস্থা বলে বর্ণনা করলে হবে না। অর্থাৎ আবেগ, যা নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক তাকে কেবলমাত্র অনুভূতি বলা যায় না---যা মনকে বিচলিত করে। বরং আবেগকে মনের একটি উদ্দেশ্যমূলক অবস্থা বলা যায়---যে অবস্থাটি কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। সে কারণে আবেগকে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থা বলা যায়। কারণ কোন বিষয় সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির মনে যে বিশ্বাস গঠিত হয় তার দ্বারাই বিষয়টির প্রতি অনুভূত আবেগের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। সুতরাং আবেগ বিষয়হীন নয়, এটির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে। বলা যায় যে, আবেগ কোন বিষয় সম্পর্কিত চিন্তাকে কেন্দ্র করেই উৎপন্ন হয়। আবেগকে চিন্তাপ্রসূত বলে স্বীকার করলেই আবেগকে অস্থায়ী, অকারণ বলে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দূর হয় এবং নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগের ব্যবহারকে অস্বীকার করার আর কোন কারণ থাকে না।

উইলিয়াম জেমস[৪] আবেগকে শারীরিক পরিবর্তনের ফল বলে মনে করলেও আবেগকে কোন কর্মের কারণ বলে স্বীকার করেননি। কিন্তু প্রাচীন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের ধারণা অনুসারে আবেগ আমাদের কর্ম পালনে প্রণোদিত করে। আবেগ কোন বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তির চিন্তা বা ধারণা থেকে উৎপন্ন হয় এবং তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিকে কর্ম পালনে প্ররোচিত করে। ডেভিড হিউম[৫] আবেগগুলিকে আমাদের অন্তরের অনুভূতি বলেছেন যেগুলির নিজস্ব শক্তি আছে--যা আমাদের কর্মের প্রেষণারূপে ক্রিয়া করে। হিউমও আবেগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে গুরুত্ব না দিয়ে কর্ম পালনের সামর্থ্য অর্থাৎ প্রেষণা শক্তিরূপেই আবেগকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করি হিউমও কর্মের চালিকাশক্তিরূপেই আবেগকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আবেগ সম্পর্কে বলেছে, 'Passions are more known by their effects than by the immediate feeling or sensation.'[৬] অর্থাৎ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আবেগগুলির পরিচয় আমরা তাদের প্রকাশের মধ্যেই লক্ষ্য করি। তাহলে আবেগগুলি অনুভব না করলেও কর্মে এগুলির প্রভাব প্রতিফলিত হয়। হিউমের এই কথাটি স্বীকার করলে, তাঁর অচঞ্চল আবেগের তত্ত্বটি সত্য হলে আবেগকে শুধুমাত্র অনুভূতি বলা যায় না। কারণ অনুভূতি অনুভূত হবে না---এমন কথা স্ববিরোধী। সুতরাং আবেগকে অনুভূতির অতিরিক্ত বলতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা থেকে হিউমের ব্যাখ্যা পৃথক। কারণ পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা মনকে চেতনক্ষেত্র বলে মনে করেছিলেন--যে মন চিন্তা ও ধারণার আধার। কিন্তু হিউমের ব্যাখ্যা অনুসারে এমন কিছু আবেগ থাকা সম্ভব যা আমাদের মনের অবস্থা হলেও আমরা সেগুলি অনুভব করি না। অর্থাৎ সেগুলি চেতন মনের বাইরে অবস্থিত। অর্থাৎ কিছু আবেগ অসচেতন হতে পারে। অসচেতন মনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করবেন হিউম। তাহলে আবেগ যেমন কেবলমাত্র অনুভূতি নয়, তার অতিরিক্ত বিষয়, তেমনি আবেগকে অসচেতনও বলা যায়। পরবর্তীকালে আমরা ফ্রয়েডের চিন্তাতে অসচেতন আবেগের উপস্থিতি লক্ষ্য করি যা আমাদের কর্মকে প্রভাবিত করে। ফ্রয়েড[৭] তাঁর তত্ত্বে বলেন যে, আমাদের কিছু আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা সমাজে প্রকাশযোগ্য নয় বলে মনে হওয়ায় আমরা সেগুলিকে অসচেতন মনে দমন করে রাখি। আমাদের মন সেগুলিকে বলপূর্বক অচেতন স্তরে সুপ্ত রাখে এবং সেগুলিকে সচেতন স্তরে আসতে বাধা দান করে। এই জাতীয় আবেগগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন না হলেও সেগুলি আমাদের আচরণের মধ্যে, স্বপ্নে প্রকাশিত হয়। তাহলে ফ্রয়েডও মনে করলেন যে, আবেগগুলিকে প্রতিহত করা যায় বলে তাদেরকে অসচেতন বলা যায়। তাহলে তিনিও আবেগকে অনুভূতি বলবেন না। যেহেতু 'অচেতন অনুভূতি' একটি স্ববিরোধী ধারণা। আবেগ অসচেতন হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি কখনো অসচেতন হতে পারে না। তিনি মনে করেন, আমাদের

স্বীকার করতে হবে, আবেগগুলি অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় অথবা তাদের প্রকাশিত হওয়ার সামর্থ্য আছে। তবে এই সামর্থ্যটি কোন কারণে মনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাটি যেমন আবেগকে অনুভূতি থেকে পৃথক করে, তেমনি কর্ম পালনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তির আচরণে আবেগের ব্যবহারকে স্বীকৃতি দান করে। তাহলে ফ্রয়েডের আবেগ সম্পর্কিত মতটি জেমসের তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ তিনি জেমসের ন্যায় আবেগকে কেবল শারীরিক পরিবর্তনের ফল বলেননি, তাকে মনের অবস্থা বলেছেন। আবার জেমসের বিরোধিতা করে তিনি আবেগকে কর্মের কারণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

সুতরাং আবেগ ব্যক্তির কেবলমাত্র অনুভূতি নয়। আবেগ হলো জটিল মানসিক অবস্থা। আবেগের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আবেগের তিনটি দিক রয়েছে। গঠনগত দিক, বস্তুর প্রতি সচেতনতার দিক এবং অনুভূতি –এই তিনটি অবস্থার একত্র রূপকে আবেগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। জগতে কোন বস্তুকে দেখা মাত্রই সেই বস্তুটিকে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা মাত্রই বস্তুটি গুণ সমন্বিতরূপে ব্যক্তির সম্মুখে বা মানসপটে বস্তুটির চিত্র গঠন করে। বস্তুর পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মানসপটে চিত্রিত হয়। যথাযথভাবে বস্তুটি আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে। ফলে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা বা জানার অর্থ বস্তুকে দেখা নয়। যখন কোন বস্তুকে জানি তখন বস্তুটি শুধুমাত্র বস্তুরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না। তার একটি নির্দিষ্ট অর্থ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। একেই সিয়াস[৮] আবেগের গঠনগত দিক বলেছেন। অর্থাৎ বস্তুটিকে পর্যবেক্ষণ করা মাত্রই বস্তুটি সম্পর্কে আমরা যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হই। যেমন, একটি ফুল দেখা মাত্রই ফুলটি কি ফুল, অপর সকল ফুলের সঙ্গে তার কি কি বিষয়ে সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য সেগুলি অনুধাবন করেই ফুলটির স্পষ্ট একটি ধারণা গঠন করি। এইভাবে বস্তু সম্পর্কে আমাদের অর্থবোধ হয়। বস্তুটি সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রতিরূপ গঠিত হয়। একেই আবেগের ধারণাগত স্পষ্টীকরণ (construal) বলা হয়। আবার বস্তুটির ধারণাই কেবলমাত্র আমার হয় না, সেই বস্তুটি সম্পর্কে আমার একটা সচেতনতা থাকে। অর্থাৎ বস্তুটিকে আমি পছন্দ করবো অথবা অপছন্দ করবো। একটি গানের কলি শোনামাত্রই গানটি সম্পর্কে ব্যক্তির ভালোলাগার বিষয় যুক্ত হয়েই গানটি ব্যক্তির নিকট অর্থবোধ হয়। অর্থাৎ গানটির ধারণাগত দিকই গানটি সম্পর্কে আমার সচেতনতার উদ্রেক ঘটায়। পূর্ববর্তী বিষয় পরবর্তী বিষয়কে প্রভাবিত করে। ফলে গানটি সম্পর্কে আমার পছন্দ বা অপছন্দের ধারণা কোন শিকড়হীন বিষয় নয়। নিছক ক্ষণিক অনুভূতি নয়, তার একটি বিষয়বস্তু বর্তমান। গানের শব্দগুলি যদি আমার পছন্দ না হয়, তাল, সুর যদি ভালো না লাগে তাহলে সেটি আমার পছন্দের তালিকায় স্থান লাভ করে না। গানটিকে ভালো বা মন্দ বলার সচেতনতা আমার আছে,

তার মানদণ্ড আমার আছে। সেই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার ভালোলাগার বিষয়কে পছন্দ করি। ফলে আবেগ বিষয়হীন নয়। আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ বস্তুটিকে আমাদের নিকট অর্থবহ করে তোলে। অর্থাৎ বস্তুর গঠনগত দিকের সঙ্গে যুক্ত হয় আমাদের ধারণাগত বিশ্বাস। ফলে ব্যক্তি ঐ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি হয় আকৃষ্ট হয় অথবা তাকে বর্জন করে। ফলে সচেতনতাবোধ ব্যক্তির নিজের। এই সচেতনতার জন্যই কোন বিষয় ব্যক্তির নিকট আনন্দবর্ধক হয়, বিপরীত বিষয় হলে ব্যক্তি বিরক্তিবোধ করেন। এই আনন্দ বা বিরক্তির অনুভূতি উৎপন্ন হয় ঐ বস্তুটির ধারণা থেকে উৎপন্ন ব্যক্তির মনের আবেগ থেকে। ফলে আবেগের ব্যবহার বলতে শুধুমাত্র গঠনগত দিক অথবা বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা নয়, আবার কেবলমাত্র অনুভূতি নয়। বরং আবেগের ব্যবহারের দ্বারা এই তিনটির মধ্যে সম্বন্ধ সাধন হয়। যেমন, ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বস্তুকে দেখা মাত্রই ভয়ের উদ্রেক হয়---এমন নয়। প্রথমে কোন বস্তু সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গঠন হয়, তারপর ঐ বস্তুটি সম্পর্কে আমার চেতনায় সেটি ক্ষতিকারক বলে বোধ জাগায়, তখনই ঐ বস্তু থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করার জন্য আমার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের আবেগ জাগে, তখনই আমি ঐ ভয়ের কারণে বস্তুটিকে ত্যাগ করি। একইভাবে নৈতিক ক্ষেত্রে রাগ, দুঃখ, লজ্জা প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে একটা জটিল মানসিক অবস্থার প্রকাশ ঘটে। তাই কোন পরিস্থিতিতে যখন আমরা আবেগের দ্বারা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন প্রথমে আমাদের আবেগ কোন বিষয়কে প্রথমে বর্ণনা করে বা সেই বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গঠন করতে সহায়তা করে, তারপর সেই বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করায় অথবা বিষয়টিকে বর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সচেতন হয়। এখানে একটি অবধারণ গঠন করা হয়। ফলে আবেগ যুক্তিহীন নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে যে সচেতনতা তা ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থবোধক সচেতনতা নয়। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদদের মতে, আবেগের দ্বারা চালিত নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে সচেতনতা তা হলো মঙ্গল বা ভাল সম্পর্কে সচেতনতা। এখানে ভালো বা মঙ্গল হলো পরমমঙ্গল। একজন ব্যক্তি নৈতিক সদ্‌গুণের অধিকারী হয় তাঁর পরমমঙ্গল সম্পর্কে সচেতনতার জন্যই। এরূপ ব্যক্তি সেই বিষয়কেই ভালোবাসবেন, পছন্দ করবেন, যেটি মঙ্গলময় বিষয়কে প্রতিফলিত করবে। সিয়াসের মতে, "I think there are many goods, some of which are in a sufficiently strong sense *objective*. A person is morally virtuous to the extent that she is concerned about these things, i.e to the extent that she has aligned her concerns with the good. She loves, likes, and admires

what is good; she thinks highly of the good; she encourages it, protects it, stands for it, and so forth."[৯] ফলে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কোন বিষয়ের সচেতনতা সামাজিক মঙ্গলের বিরোধী হতে পারে না। ব্যক্তি চরমমঙ্গল বিষয়ে সচেতন হয়েই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন এবং সর্বদা মঙ্গলময় বিষয়কেই প্রতিফলিত করবেন। সেকারণে বলা হয়, "Moral virtue requires a kind of *excellence* in one's concern for the good."[১০] সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্রে আবেগ প্রবণতা আকারে বর্তমান থাকার জন্যই তাঁর নিকট কোন বিষয় বা বস্তু নিজস্ব পছন্দের মূল্যে বিশ্বাসযোগ্য হবে না, তা সংকীর্ণতাবর্জিত হবে। এই আবেগ হলো যাচাইযোগ্য আবেগ---যা ব্যক্তির মনে প্রবণতারূপে বর্তমান থাকে। ব্যক্তি যখন নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে তখন যাচাইযোগ্য আবেগ বা নৈতিক আবেগ থেকে কর্ম সম্পাদন করে।

আবেগ সম্পর্কে এরূপ একটি ব্যাখ্যা স্বীকার করলে আমাদের তাকে গ্রহণ করা এবং নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সহজ হয়। কারণ দার্শনিকেরা আবেগকে উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করলেন। এমন মনে করা হলো যে, বিচারমূলক অবধারণ গঠনের ক্ষেত্রে আবেগকে আবশ্যক উপাদান বলা যায়। আবেগ চিন্তাশূণ্য নয়। আবেগ উদ্দেশ্যমূলক, কারণ সেটি বিষয়ের মূল্যনির্ধারণ করে, সেটি সম্পর্কে অবধারণ গঠন করে। আমরা যখন ভালোবেসে আনন্দ লাভ করি তখন যে বস্তুটি আমাদের নিকট আনন্দদায়ক বলে গণ্য হয় সেটির প্রকৃত বিচার করেই আমরা সেটিকে সুখজনক বলে মনে করি এবং সেই কারণেই বস্তুটিকে ভালোবেসে আনন্দ অনুভব করি। এর থেকেই বলা যায়, আবেগের প্রকাশক অনুভূতিগুলি নিছক কোন সংবেদন থেকে ভিন্ন। কারণ সংবেদনগুলি আমাদের শারীরিক কোন সুবিধা বা অসুবিধা থেকে অকস্মাৎ উৎপন্ন হতে পারে। হঠাৎ করে গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে আমরা চিৎকার করে উঠি। এখানে আমাদের শারীরিক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত করি। কিন্তু আবেগ সর্বদাই কোন বিচারমূলক সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ উৎপন্ন মানসিক অবস্থা। সুতরাং প্রতিটি আবেগই আবশ্যিকভাবে কোন বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে। প্রথমে আবেগের বিষয়টি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হলেও আবেগ যুক্তিবিচারের দ্বারা বিষয়টি নির্দিষ্ট করে। সুতরাং মূল্যাবধারণের সামর্থ্য আবেগের আবশ্যিক অঙ্গরূপে বিদ্যমান। তাহলে আবেগকে ব্যবহারের অর্থ হলো মনের একটি জ্ঞানাত্মক স্তরকে ব্যবহার করা---যা যুক্তিপূর্ণ, বিচারমূলক, উদ্দেশ্যমূলক। আবেগ জ্ঞানাত্মক স্তররূপে বৌদ্ধিক চিন্তনেরই সমান। এ্যারিস্টটলের ভাবনাতেও আমরা লক্ষ্য করেছি এমনই ব্যাখ্যা। তিনি 'ভালো' ব্যক্তি বা *eudaimon*[১১] এর চরিত্র চিত্রণের সময় বুদ্ধি ও আবেগের সমান্তরাল অবস্থান এবং যুগ্ম কার্যকারিতার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন।

আবেগগুলি আমাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা আলোচনার জন্য আমি এই অধ্যায়কে তিনভাগে বিভক্ত করেছি। কোনও কোনও আবেগ বিষয়বস্তুরূপে ক্রিয়া করে। অর্থাৎ কোনও কোনও আবেগ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনোভাব গঠনের জন্য, জীবনের নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য আবেগ প্রয়োজন। আবার কোনও কোনও আবেগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবেগগুলি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের নৈতিক কর্ম পালনে সহায়তা করে। কেবলমাত্র আবেগ সিদ্ধান্ত গঠনেই সাহায্য করে না, কোনও কোনও আবেগ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিরূপে আমাদের চরিত্রে উপস্থিত থেকে নৈতিকবোধের সহায়ক হয়। আবেগগুলি আমাদের সিদ্ধান্তের পরবর্তী অবস্থায় মনে উৎপন্ন হয়ে ব্যক্তির চারিত্রিক শুদ্ধতার পরিচয় জ্ঞাপন করে।

আবেগঃ নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ ব্যক্তির কর্মকে বিচার করার পরিবর্তে চরিত্রের স্থায়ী প্রবণতারূপে কতগুলি নৈতিক আবেগ বা সদ্‌গুণ অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এঁদের মতে, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য পালন আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য হতে পারে না। স্নেহ, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি আবেগকেও আমাদের কর্তব্য নির্ধারণে উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থাৎ আমাদের আবেগের ভূমিকাকেও কর্মের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। আবেগকে উপেক্ষা করে যথাযথ কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। এ কারণে ব্যক্তির চরিত্রে যথাযথ আবেগের উপস্থিতি প্রয়োজন। এই আবেগগুলিকে মূল্যবান সদ্‌গুণ বলে গণ্য করা হয়, যেহেতু সেগুলি আমাদের জীবনকে উন্নত করে। এগুলি আমাদের ভালো জীবনযাপনের শর্তরূপে কাঙ্ক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তি উদারতা নামক গুণটিকে যখন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে তখনই সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত উদার মানসিকতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। এভাবে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সমমর্মিতাবোধ—এই আবেগগুলি ব্যক্তিমনে প্রবণতারূপে বর্তমান থাকলেই ব্যক্তি ভালো ব্যক্তি বা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়। এই আবেগগুলি সংকীর্ণ স্বার্থবোধক আবেগ নয়। এগুলি যথাযথ আবেগ, যার উপস্থিতিতে ব্যক্তি চরিত্রবান বলে স্বীকৃত হয়। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের মতে, ব্যক্তি মনের প্রকৃত উন্নতি সাধন না করতে পারলে নৈতিক আচরণ পালন সম্ভব নয়। সমাজের সদস্যরা যদি নিজেরা নীতি পালনে আগ্রহী না হয়, অর্থাৎ তাদের যদি মানবিকতাবোধ, দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা, সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত না হয় তবে কখনও সে অপরের

প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হবে না। অপরের প্রতি যথাযথ মনোভাব উপস্থিত না থাকলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক না থাকলে সেই সমাজ নৈতিক সমাজরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। ব্যক্তির মনে যদি সমমর্মিতা, ভালোবাসা না জন্মায় তাহলে সে অপরের মনোভাবগুলিকে অনুধাবন করতে, অপরের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হবে।

সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিক, যাঁরা আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানের পক্ষপাতী, তাঁরা মনে করেন, নৈতিক আবেগ ব্যক্তির চরিত্র গঠনের সহায়ক। তাঁরা কর্মের বিচারকে গৌণ বলে মনে করেন বলেই নৈতিক চরিত্র গঠনকেই মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চরিত্র গঠনের জন্য কতকগুলি সৎ আবেগ, প্রবণতা তার চরিত্রের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যরূপেই উপস্থিত থাকা কাম্য বলে তাঁরা মনে করেন। এই সকল আবেগ ব্যক্তির চরিত্রকে প্রস্তুত করে। কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণেই তা সীমাবদ্ধ থাকে না, নৈতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করে। ফলে নৈতিক আবেগ আমাদের নৈতিক শিক্ষাও দান করে। জেসী প্রিন্জ[১২] মনে করেন, নৈতিক ক্ষেত্রে যে নৈতিক অনুভূতিগুলি আমরা প্রয়োগ করি সেগুলি ব্যক্তির মনে প্রোথিত করার জন্যেও আবেগের প্রয়োজন হয়। আবেগ নৈতিক শিক্ষাদানের সহায়ক মাধ্যম বলে ব্যবহৃত হয়। অন্যায় করলে বা সমাজে প্রচলিত নৈতিক নিয়মগুলিকে ভঙ্গ করলে শাস্তি দানের মাধ্যমে শিশুর মনে ভীতি জাগ্রত করে তাকে অন্যায় থেকে বিরত থাকার এবং সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিগুলি অনুসরণের বাধ্যতাবোধ জাগ্রত করা হয়। রীতি পালন না করলে সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হওয়ার যে আশঙ্কা তা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে নৈতিক পথ অনুসরণ করতে। আবার আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে শিশুকে কোন বিষয়গুলি অন্যায় সেগুলি সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন – অন্যায়কারী ব্যক্তির প্রতি শিশুর মনে ঘৃণাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে শিশুকে অন্যায়ের প্রতি অনীহার বোধ গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার ভালোবাসার দ্বারাও নৈতিক শিক্ষা দান করা হয়। অন্যায্য আচরণ করলে যখন শিশুর গুরুজনেরা তার সাথে বাক্যালাপ না করার সম্ভাবনার কথা বলেন তখন শিশু ভালোবাসাহীনতা এবং নিরাপত্তাহীনতা বোধ অনুভব করে বলেই অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকে। পরোক্ষভাবে সে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বলেই অপরকে ভালবাসতে শেখে, জীবনে ভালবাসার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এভাবেই নিজ কর্মের ফলস্বরূপ অপরের দুঃখ যেমন মানসিক অশান্তির কারণ হয়, তেমনি অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কৃতকর্ম মানসিক শান্তির কারণ হয়। ফলে আবেগ নৈতিকমূল্য উৎপাদনের হাতিয়ার (instrumental moral value)[১৩] রূপে বিবেচিত হয়।

নৈতিকতায় আবেগের উপস্থিতিকে সমর্থনকারী দার্শনিকেরা মনে করেন, আমরা ভালো ব্যক্তির প্রবণতা, উদ্দেশ্য মানসিকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি এবং আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে অপর ব্যক্তিকে অনুসরণে ব্রতী হই। যেমন, ভালো ব্যক্তির কৃতকর্ম ও তার মানসিকতাকে আমরা অর্জন করতে সচেষ্ট হই। ছোট বেলায় আমরা মনীষিদের কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ করি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম, মাদার টেরিজার ত্যাগ, সহমর্মিতা, বিদ্যাসাগরের উদারতাকে অর্জন করতে চাই। আমি যখন কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করি, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অর্জন করতে সচেষ্ট হই তখন আমরা অবশ্যই ঐ ব্যক্তির মহত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। একই সাথে আমার মনে সাহস ও বিনয়ের উপস্থিতি আছে বলেই আমরা স্বীকার করি যে, আমরা ঐ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারিনি। আমাদের চরিত্রে ত্রুটি রয়েছে। ফলে আবেগগুলি আমার চরিত্র সংশোধনের সহায়ক। কোন ব্যক্তি অন্যায় কর্ম সম্পাদন করলে সেই ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য আমরা কখনও কখনও তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করি। সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিবিদদের মতে, ক্ষমা হল সদ্‌গুণ। এই সদ্‌গুণ ব্যক্তির মধ্যে প্রবণতারূপে থাকার জন্যই ব্যক্তি অপর অন্যায়কারী ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। কেননা কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন কর্মে অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তির ভ্রান্তি ঘটে। ঐ ব্যক্তি যদি নিজের ভুল বুঝতে সক্ষম হন তাহলে তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা সঙ্গত বলে আমরা অনুভব করি। কেননা অন্যায়কারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করলে তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে। অর্থাৎ ক্ষমা প্রদর্শন অপর ব্যক্তির অন্যায় কর্ম করার মানসিকতা সংশোধন করার উপায়। অন্যায়কারীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ না করে, তার চরিত্র, উদ্দেশ্য---এগুলির পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হওয়া। আবার এমনও হতে পারে যে, নিজের ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনাবোধে পীড়িত হয়ে আমি নিজের চরিত্র সংশোধনের দ্বারা নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করতে সচেষ্ট হই। এভাবেই আত্মগ্লানির মাধ্যমে সম্পর্কের পুনর্গঠন সম্ভব হয়। এই মনোভাব ব্যক্তিদের সহজাত নয়। এরূপ মনোভাব ব্যক্তি তার অভ্যাসমূলক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে গঠন করে। ভালোবাসা, সহমর্মিতা---এই সকল আবেগ আমাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। তাই বলা যায়, আবেগ সমাজকে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলি বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে মানবচরিত্রে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন আবেগটি গ্রহণীয় এবং কোনটি বর্জনীয় তার নির্ধারক মানদণ্ড কোনটি হবে? নুসবামের[১৪] মতে, কোন আবেগটি গ্রহণীয়, সমাজজীবনের জন্য উপযুক্ত এবং কোনটি উপযুক্ত নয়—তা নির্ধারিত হয় সেই সমাজে প্রচলিত নির্দিষ্ট সামাজিক রীতি দ্বারা। যে আবেগগুলি সমাজজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যে আবেগগুলি আমাদের মনে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেছেন, সেগুলি হলো—

আনন্দ, দুঃখ, ভয়, রাগ, ঘৃণা, করুণা, শত্রুতা, হিংসা, আশা, অপরাধবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ, লজ্জা, বিতৃষ্ণা এবং ভালোবাসা। এই আবেগগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠনের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই আবেগগুলি অন্ধ আবেগ নয়, বরং বলা যায় এগুলি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ। কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভয়, আনন্দ, ক্ষোভ, রাগ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশিত হয় ঐ বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনোভাব অনুসারে। এই মনোভাব আমরা অর্জন করি জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা ভীতিবোধ করি, কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় এর হানিকারক দিকটি সম্পর্কে আমরা পূর্বে জ্ঞাত হয়েছি বলে। সর্প প্রত্যক্ষ করে আমরা ভীত হই, কারণ সর্পদংশনকে আমরা মৃত্যুর কারণ বলে জানি। ব্যক্তির মনে যখন কোন ঘটনায় ভীতির সঞ্চার হয় তখন তার কারণ হলো ঐ ঘটনার কারণস্বরূপ কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা। যখন আমার মনে করুণার উদয় হয় তখন তার কারণ হলো অপর ব্যক্তির দুঃখ কষ্টের আশঙ্কা। যখন কোন ঘটনা সমাজের পক্ষে হানিকারক হয়, তখন আমাদের মনে বিতৃষ্ণার উদয় হয়। একইরূপে প্রিয় কোন ব্যক্তির পরীক্ষার ফল ভালো হলে আমরা আনন্দ লাভ করি। কারণ আমরা জানি যে, এই ফল তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ সুগম করবে। এভাবে প্রতিটি আবেগ আমাদের কোন না কোন ধারণার দ্বারাই সমর্থিত। কোন আবেগটি যথার্থ এবং কোনটি যথার্থ নয় তার মূল্যায়ন করাও সম্ভব হয় ঐ আবেগের ভিত্তিরূপে উপস্থিত বিশ্বাসের যথার্থতা যাচাই করার মাধ্যমে। যদি বিশ্বাসটি সত্য হয়, যুক্তিযুক্ত হয় এবং একইসাথে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে আবেগটিকে যথার্থ বলা যায়। এভাবেই মন্দ, অনৈতিক বিশ্বাসের সাথে যুক্ত মন্দ আবেগকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এই কারণে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তার আবেগের যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা সঠিক আচরণ করতে সক্ষম।

সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ এ কারণে চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জন করার কথা বলেছেন। সদ্‌গুণের উদ্দেশ্য হলো সকল মন্দ মনোভাবগুলিকে, মন্দ আবেগগুলিকে প্রতিহত করা। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন ভালো কর্ম করেন, তেমনই মন্দ কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে আগ্রহী হন। আমাদের মধ্যে সাহসিকতা নামক গুণটি যদি উপস্থিত থাকে তবেই আমরা ভীরুতাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হই। আমরা সংযমী হলে তবেই উৎশৃঙ্খলাতাকে বর্জন করতে সক্ষম হই। ব্যক্তি অনেক সময় আবেগ তাড়িত হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার ব্যতীত সুখ লাভে প্রবৃত্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বলতে হয় ব্যক্তি তার বুদ্ধি, বিচারবোধ, বিচক্ষণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হননি। কিন্তু ব্যক্তি যদি বিচক্ষণতা সহকারে কোন বিষয় পর্যালোচনা করেন তবে তিনি যথাযথ আবেগ প্রদর্শনে সক্ষম হন। এর জন্য ব্যক্তিকে সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। এরূপ ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের কর্মগুলিকে পরিশীলিত করতে পারেন তা নয়, সামাজিক ব্যক্তিবর্গের নিকট আদর্শ ব্যক্তি বলে

পরিগণিত হন। এইভাবে আদর্শব্যক্তি সামাজিকশিক্ষা দান করতে পারেন। ব্যক্তি সমাজের সকলের নিকট অনুসরণীয় হন। অপরব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে অনুসরণ করে নিজের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনে সমর্থ হন। এখানে 'অনুসরণ' বলতে অনেকেই এমন বলতে পারেন যে, ঐ আদর্শ ব্যক্তির কর্মকে কি অনুসরণ করা হবে? অর্থাৎ যিনি অপূর্ণ ব্যক্তি বা সদ্‌গুণ অর্জনে ইচ্ছুক ব্যক্তি তিনি কি আদর্শ ব্যক্তির কর্মকে অনুসরণ করবেন? সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা বলেন, সদ্‌গুণ অর্জনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কখনই আদর্শ ব্যক্তির কর্মকে অনুসরণ করবেন না। তিনি ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক গুণ, যথা, উদারতা, বিনয়, সাহসিকতা, ভালোবাসা, মহানুভবতা—এই গুণগুলিকে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করবেন। এবং এইভাবে অপূর্ণ ব্যক্তি নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হতে পারেন। সদ্‌গুণ চরিত্রে উপস্থিত থাকলে ব্যক্তির আবেগ বুদ্ধির বিরোধিতা না করে একটি দ্বন্দ্বহীন মানসিক অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সেই আবেগ যেহেতু বুদ্ধির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, সুতরাং তা কখনই মন্দ আবেগ হতে পারে না। একারণে ব্যক্তি মন্দ আবেগকে পরিহার করার জন্য সর্বদা নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই সেই চরম উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব হয়। সে কারণে দেখা যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বিচারমূলক পদ্ধতির দ্বারা যথাযথ আবেগ ব্যবহার করে থাকেন। ব্যবহারের পূর্বে ব্যক্তি সেই আবেগটির শুদ্ধতা পরীক্ষা করেন। তার নৈতিক ইচ্ছার সাথে, মঙ্গলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করেন। সুতরাং চরিত্রবান ব্যক্তির বিচার ক্ষমতা সৎ ও অসৎ আবেগগুলি চিহ্নিত করে এবং সৎ আবেগগুলির চর্চার দ্বারা সদ্‌গুণসম্পন্ন কর্ম সম্পাদন করে। আবার সদ্‌গুণগুলি চরিত্রে অর্জিত হলে তার অসৎ প্রবণতাগুলিও দূর হয়। এভাবেই বুদ্ধি ও আবেগের সহাবস্থান সম্ভব হয়, কেননা সৎ আবেগ ব্যক্তির বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত। আবার ব্যক্তির মনে উপস্থিত নৈতিক আবেগ ব্যক্তিকে বিচক্ষণ ব্যক্তিতে পরিণত করে। বিচক্ষণ ব্যক্তি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিতত্ত্বে ভালোবাসা, সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, দয়া, করুণা—ইত্যাদি আবেগকে সদ্‌গুণ বলে আমাদের চরিত্রে অর্জনের কথা বলা হয়েছে এবং এগুলির ব্যবহারকে অভ্যাসে পরিণত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, যে ব্যক্তি নৈতিক আবেগের অধিকারী সে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্‌গুণসম্পন্ন আচরণ করেন। কারণ এরূপ আচরণকে সেই ব্যক্তি অভ্যাসে পরিণত করেন। আমরা সকল ব্যক্তির সমান অধিকারের জন্য তখনই সচেষ্ট হবো, যদি আমরা অন্য ব্যক্তির প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হই, সকলের সাথে একটি দৃঢ় মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের চারিত্রিক কিছু গুণাবলিই অপর ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষায় আমাদের উৎসাহী করে। এই ভাবেই আবেগ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একটি সম্পর্ক রচনা করে। আমাদের মধ্যে সামাজিকতাবোধের জন্ম দেয়। সামাজিক জীবরূপে সমাজ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের নিকট থেকে বিশেষ

বিশেষ আবেগের প্রকাশ আশা করে। আমাদের কোন কর্মের ফল আশানুরূপ না হলে, ঐ ফলের দ্বারা অপর ব্যক্তির অকল্যাণ হলে, সেই ফলাফলের জন্য ব্যক্তি দায়ী না হলেও তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত বলে আমরা মনে করি। অপর ব্যক্তির আনন্দে নিজের দুঃখকে উপেক্ষা করেও আমাদের খুশী হওয়া কর্তব্য বলে মনে করা হয়।

ব্যক্তির চরিত্রে আবেগের যথাযথ উপস্থিতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই এ্যারিস্টটল[১৫] তাঁর দর্শনে mean বা মধ্যবর্তী পরিমাণের উল্লেখ করেছিলেন। আবেগ তখনই নৈতিক আবেগ বা সদ্‌গুণরূপে পরিগণিত হয় যখন এটি যথাযথ পরিমাণে আমাদের মনে উপস্থিত থাকে। প্রজ্ঞার দ্বারা ব্যক্তি আবেগকে বিচার করবে। ব্যক্তি নিজের অবস্থা অনুসারে, পরিস্থিতি বিচার করে কোন পরিমাণ আবেগের ব্যবহার সেক্ষেত্রে যথাযথ হবে—তা নির্ধারণ করবে। তিনি অত্যধিক আবেগ এবং অত্যল্প আবেগ উভয়ের কোনটিকেই নৈতিক বলে স্বীকার করেননি। আবেগটির ন্যায্যতা বিচক্ষণতার দ্বারা পরীক্ষিত হলে তবেই সেটি নৈতিক বলে গৃহীত হয়। সাহসের অভাব যেমন ব্যক্তির ভীরুতার পরিচায়ক, তেমনি অত্যধিক সাহস হঠকারিতায় পরিণত হয়। কোন আবেগটি কোন পরিস্থিতিতে কতটা পরিমাণে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন, কোন পরিমাণ আবেগ সদ্‌গুণ বলে গণ্য হবে—তা বিচক্ষণতা পরিস্থিতি অনুসারে বিচার করবে। আবেগটি সদ্‌গুণরূপে জ্ঞাত হয়, যদি আবেগটি উচিত পরিমাণে উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ অত্যধিক আবেগ যেমন ক্ষতিকর, একইভাবে আবেগের অভাবও বর্জনীয়। এভাবে সাহস তখনই সদ্‌গুণরূপে গণ্য হবে, যদি ব্যক্তির মনে সঠিক পরিমাণে ভীতি উপস্থিত থাকে। নৈতিক আবেগ কেবলমাত্র কতকগুলি ইচ্ছা বা আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নয়। আর আবেগকে যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সীমিত পছন্দ, ভালোবাসা বা ভালোলাগা থেকে মুক্ত করতে পারি, যদি আমরা আবেগকে কেবল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির হাতিয়ার বলে না দেখি, তাহলে আমাদের আবেগকে নৈতিক পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না, যেহেতু এ আবেগ বিচার বুদ্ধি বিযুক্ত আবেগ নয়। সেকারণে সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ এ্যারিস্টটলের মতই ব্যক্তির চরিত্রে যথাযথ আবেগের উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

দার্শনিক হিউমও ব্যক্তির চরিত্রে সমাজের সহায়ক আবেগগুলির উপস্থিতিকে কাম্য বলে মনে করেছেন। এই আবেগগুলির উপস্থিতির দ্বারা ব্যক্তি নিজে যেমন উপকৃত হয়, তেমনি সমাজে অন্য ব্যক্তিদের পক্ষেও সদর্থক ফল উৎপাদন করে। হিউম[১৬] তাঁর আলোচনায় এই সকল আবেগগুলির ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রফুল্লতা, মহানুভবতা, সাহস, স্থিরতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি মানসিক অবস্থা ব্যক্তি যদি

অর্জন করতে সক্ষম হয় তবে সেগুলি তার নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়ক হয়। আবার একইভাবে বিনয়, শোভনতা ইত্যাদি মনোভাব সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিরূপে গুরুত্বপূর্ণ বলে এগুলিকে হিউম কাঙ্ক্ষিত সদ্‌গুণ বলেছেন। হিউম বিচক্ষণতাকেও সৎ চরিত্রের ব্যক্তির অবশ্যম্ভব বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন। যেহেতু বিচক্ষণ ব্যক্তিই সামাজিক মঙ্গলের আদর্শ অনুসরণ করে তার আচরণকে পরিমার্জিত করতে পারে। কারণ এরূপ ব্যক্তি পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী হওয়ার কারণে উৎশৃঙ্খলতা থেকে বিরত থাকে। তার স্বচ্ছ, নিষ্পাপ, নিষ্কুলষ দৃঢ় মন ভালো বা মঙ্গলময় অনুভূতিতে পূর্ণ হওয়ায় পরোপকারিতায় ব্রতী হয়; ন্যায্যতাকে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করে এবং বিশ্বস্ততা তার কর্মে প্রতিফলিত হয়। তাঁর মতে, কাঙ্ক্ষিত ও ব্যবহারযোগ্য সদ্‌গুণের অধিকারী হলেই তারা নৈতিক জগতের সদস্যরূপে বিবেচিত হবেন। এমন ব্যক্তিবর্গ যেমন পরস্পরের সাথে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, তেমনই সমাজের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত কর্ম করবেন। একে অপরকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। বলা যায়, সদ্‌গুণ যেমন ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষতা লাভের সহায়ক হয়, তেমনি সামাজিক মঙ্গল উৎপাদনের সহায়ক হয়। হিউমের[১৭] মতে, সমমর্মিতা এমনই একটি আবেগ যা ব্যক্তির চরিত্রে উপস্থিত থেকে সামাজিক সম্পর্কগুলি গঠনে সাহায্য করে। তবে তাঁর মতে, সমমর্মিতা কোন সদ্‌গুণ নয়, বরং সকল নৈতিক বোধের উৎস। এই বোধের উদ্ভব দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হল বুদ্ধি, যা অপর ব্যক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত ধারণা গঠনে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয়ত আমাদের মনের আবেগ, যা অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হয়। হিউম বলেন, "The minds of men are mirror to one another."[১৮] অপরের আবেগ আমার মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই প্রতিচ্ছবি হলো অপরের মনের প্রতিচ্ছবি, আমরা তখন সেই প্রতিচ্ছবিকে আমার প্রতিচ্ছবিতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হই। কেননা সমাজে আমরা চালিত হই একই মূল্যবোধের দ্বারা। ব্যক্তির আত্মা হলো পারস্পরিক অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা, কল্পনা ইত্যাদি একাধিক বিষয়ের যোগফল। ফলে অপরের আবেগের প্রকৃতি আমার আবেগের অনুরূপ হলে তাকে যথার্থ বলে মনে করি। এই সমান অনুভূতিবোধকে হিউম সমমর্মিতা বলেছেন। অপরকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের চরিত্রে এই গুণ উপস্থিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে হিউম মনে করেন।

এই আলোচনা থেকে বলা যায়, সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের চরিত্রে কিছু আবেগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই আবেগগুলি উপস্থিত না থাকলে ব্যক্তি হয় স্বার্থবোধে চালিত হবে, যা তাকে অপরের স্বার্থকে উপেক্ষা করতে বাধ্য করবে অথবা ব্যক্তি কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে, নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ

থেকে কর্ম পালন করবে। এক্ষেত্রে কর্মের সাথে ব্যক্তির মানসিক যোগ না থাকায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক গঠন করা সম্ভব হবে না। ফলে সমাজের মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে। মা যদি কেবল কর্তব্যবোধে শিশুর প্রতি যত্নশীল হন, শিক্ষক যদি তার কর্তব্যের কারণেই কেবল শিক্ষাদান করেন, বন্ধু যদি অপর বন্ধুকে কর্তব্যবোধে সহায়তা করে, স্নেহ, ভালোবাসা, বিশ্বাস ইত্যাদির উপস্থিতি যদি ব্যক্তির নিকট অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয় তবে সেই সম্পর্কের ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়। সুতরাং আমাদের মনে যদি অপর ব্যক্তিদের প্রতি কোনরূপ অনুভূতি না থাকে, যদি আমরা আবেগহীন কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করি, তবে জীবনযাপন সুখকর হয় না। কারণ কর্তব্য পালন করতে গেলেও অপরব্যক্তির মনের ভাবনা, তার অনুভূতি অনুধাবন করার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি অপরের অনুভূতিগুলি জানতে এবং সেই অনুসারে প্রতিক্রিয়া করতে তখনই সক্ষম হয় যদি তার মনে ঐ ব্যক্তির প্রতি যথাযথ আবেগ উপস্থিত থাকে। ব্যক্তি যে কেবলমাত্র তার স্বার্থের কারণে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে এমন নয়, তার মানবিকতাবোধের কারণে সে অপরের সুখে সুখ এবং অপরের দুঃখে দুঃখবোধ করে। ব্যক্তি সুখ দুঃখের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন বলেই সে অপরের সুখ দুঃখের প্রকৃতিকে বুঝতে সক্ষম। ব্যক্তিদের মধ্যে সুখ-দুঃখের বোধ থাকলে তবেই সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদের মনে উপস্থিত সুখ দুঃখগুলিকে চিহ্নিত করতে এবং সেগুলিকে জানতে সক্ষম হয়। সুখ দুঃখকে উপলব্ধি করার সামর্থ্যই যে কেবল ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমান তাই নয়, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মনে এমন প্রত্যাশাও থাকে যে, অপর ব্যক্তিও তার সুখে সুখী, তার দুঃখে দুঃখিত হবে। অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে ব্যক্তি সুখ লাভ করছে অপর ব্যক্তির মনেও যেন ঐ পরিস্থিতি সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তি মনে করে, কোন একটি পরিস্থিতিতে তার মনে যেরূপ আবেগ উৎপন্ন হয়, ঐ পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তিও অনুরূপ আবেগ প্রকাশ করবে। এই আশার অপর কারণ হলো সমাজে একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপস্থিতি। একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকে বলেই আমাদের মনোভাব যথাযথ কিনা তা আমরা যাচাই করতে চাই। যদি আমরা দেখি আমাদের অনুরূপ মনোভাব অপর ব্যক্তির মধ্যেও উপস্থিত অথবা আমাদের মনোভাব অন্যদের নিকট প্রশংসিত হয় তবে আমরা নিশ্চিত হই আমাদের আবেগগুলি ন্যায়সঙ্গত। এইভাবে আমার আবেগের সঙ্গে অপর ব্যক্তির আবেগের প্রকৃতির সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করলে আমরা ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করি বা সমর্থন করি। কিন্তু যদি আমার আবেগের থেকে ভিন্নরূপ আবেগের উপস্থিতি অন্য ব্যক্তির মনে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সেই ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দিই না, নৈতিক ব্যক্তি বলেই তাকে গণ্য করি না। অপরের আবেগের প্রকাশ অনুসারেই তার সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি সম্পর্কিত অবধারণগুলি আমরা অনেক সময় গঠন করি ব্যক্তির মনে উপস্থিত আবেগগুলির যাথার্থ্যতা বিচার দ্বারা। আবার ঐ যাথার্থ্যতা নির্ধারিত হয় আমাদের মনে উপস্থিত

আবেগের দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের মানসিকতাকে মানদণ্ডরূপে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অবধারণ গঠন করি। এভাবেই আমাদের প্রবণতাই হলো আবেগের মেলবন্ধনের সাহায্যে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

প্রেষণাশক্তিরূপে আবেগ

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আবেগের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা যে অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার অভিযোগ। যেহেতু আবেগ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তাই অনেকেই মনে করেন আবেগের ব্যবহারের ফলে নৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার উপায়ে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ নৈতিক সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিসাপেক্ষতায় পর্যবসিত করে। ফলে নৈতিকতার পবিত্রতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। যেমন ভালোবাসা নামক আবেগ আমাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিসম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করায় তার ফলে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সর্বদা পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করে। কেননা ভালোবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা পছন্দের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কর্তব্যবাদী নীতিদার্শনিকেরাও নৈতিক ক্ষেত্রে ভালোবাসা নামক আবেগকে বর্জন করেছেন, কারণ তাঁরা মনে করেন, আবেগের উপস্থিতি ব্যক্তিকে সংকীর্ণ স্বার্থবোধ দ্বারা চালিত করে এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করে। বুদ্ধিবাদী কর্তব্যনিষ্ঠ দার্শনিক মত অনুসারে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করাই নৈতিকতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং নৈতিক সিদ্ধান্তে ব্যক্তির আবেগ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হবে। কর্তব্যবাদী নীতিদার্শনিকদের সমর্থন করে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড[১৯]ও বলেন যে, ভালোবাসা নামক প্রত্যয় দ্বারা ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। একজন ব্যক্তি ভালবাসার কারণে পছন্দের ব্যক্তিকে বিচারহীনভাবে অত্যধিক মূল্য দান করে এবং অকারণে অপরকে বঞ্চিত করে। ফলে ভালোবাসা বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ হয়। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক হওয়ায় আমাদের মনোযোগ অন্য বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত হয়। আত্মতৃপ্তি লাভই ভালোবাসার একমাত্র লক্ষ্য। এই চাহিদার বস্তুটি আমার স্থায়ী পরিতৃপ্তি উৎপাদনে সক্ষম নয়। অর্থাৎ ভালোবাসার বস্তুটির প্রতি আমার মনোভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যার জন্য ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কিছুকাল পর সেই ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে। বা যে বস্তুটি বর্তমানে আমার পরিতৃপ্তি সাধন করে সেটি পরবর্তীকালে পরিত্যাজ্য হতে পারে। ফলে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা অনুসারে ভালোবাসা নামক আবেগ বিচার ক্ষমতার পরিস্ফূরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এটি এমন প্রবণতা যা আমাদের বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে বাধা দান

করে। কেননা তাঁর মতে, আবেগ হলো ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের অবদমিত ইচ্ছার বা চিন্তার প্রকাশ। ব্যক্তির গোপন ইচ্ছা, অভিলাষ নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে থাকে। অসামাজিক ইচ্ছা বলে এগুলি চেতন মনে সদৃশ সংবেদন বা অনুভূতিরূপে প্রকাশিত হতে পারে না। ব্যক্তির গোপন ইচ্ছা বিকৃত রূপ ধারণ করে চেতন মনে আবির্ভূত হয়। ফলে বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের আবেগ ভিন্ন রূপ ধারণ করে প্রকাশিত হয়। ফলে ভালোবাসা নামক আবেগ ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের অবদমিত প্রকাশ, যা ব্যক্তি বা বস্তুর প্রকৃত রূপ প্রকাশ না করে বিকৃতরূপের প্রকাশ ঘটায়। ব্যক্তির সংকীর্ণ আবেগের কারণে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি তার নিকট ঈশ্বরের সদৃশ বলে প্রতিভাত হয় এবং তাকে সর্বগুণসম্পন্ন, মহিমান্বিতরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়। সুতরাং ফ্রয়েডের মতে, ভালোবাসার সম্পর্ক নিছক সংকীর্ণ ব্যক্তিসম্পর্ককে প্রকাশ করে। ফ্রয়েডের ন্যায় অনেকেই মনে করেন, ভালোবাসার জন্য একটি সামান্য বিষয় অত্যধিক মূল্য লাভ করে। অত্যধিক মূল্য দেওয়ার জন্য আমরা ঐ বস্তুটিকে সর্বগুণসমণ্বিত করে তুলি এবং সেই বস্তু বা বিষয় লাভকে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করি । হেনরী সিজউইক মনে করেন, ভালোবাসা কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের প্রতিই ধাবিত হয়--তা নয়। আমরা সর্বজনের প্রতি ভালোবাসার বন্ধন অনুভব করতে পারি, যদিও সেই ভালোবাসার মধ্যেও স্বার্থবোধ নিহিত থাকে। তাঁর মতে, "Love is not merely a desire to do good to the object beloved, although it always involves such a desire."[২০] অর্থাৎ তাঁর মতে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক চাহিদা বা প্রত্যাশা জড়িত থাকবে, যা ব্যক্তিকে আনন্দ বা মানসিক পরিতৃপ্তি দেবে। তাঁর মতে, ভালোবাসা নামক আবেগ যে কেবলমাত্র দুজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, সকল ব্যক্তিদের সাথে এই আবেগের সম্পর্ক রচিত হতে পারে। ভালোবাসার মাধ্যমে পরোপকারিতার ইচ্ছা প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু ভালবাসা নামক আবেগের ক্ষেত্রে ফলাফলরূপে কোন প্রত্যাশা বা তৃপ্তিদায়ক ইচ্ছা বা চাহিদার বিষয় বর্তমান থাকবে। যে ব্যক্তির উপস্থিতি মনে প্রীতিজনক অনুভূতি সৃষ্টির সহায়ক তাকেই আমরা ভালোবাসি। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের মনে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টির কারণ হয় তবে তার বিষয়ে আমরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করি। অর্থাৎ ভালোবাসার আবেগের সঙ্গে যুক্ত আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থবোধ। কান্টও তাঁর কর্তব্যবাদে ফললাভের আকাঙ্ক্ষাতে কর্তব্য সম্পাদন করার কথা বলেননি। তিনি মনে করেছিলেন,কোন কর্ম যদি কাঙ্ক্ষিত ফল উৎপাদনে ব্যর্থও হয়, তা সত্ত্বেও কর্মের উদ্দেশ্যটি যদি ভালো হয় তবে কর্মটিকে ভালো বলেই গণ্য করা হবে। অর্থাৎ আবেগের উপস্থিতিতে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা বর্তমান থাকায় নৈতিক ক্ষেত্র থেকে আবেগকে বর্জন করা প্রয়োজন।

কিন্তু এর উত্তরে একথা অন্তত বলা যায় যে, নৈতিকতায় ফলের দ্বারা কর্মের বিচার না করলেও আমরা অন্তত পক্ষে কর্ম সম্পাদনের ফলে কোন মঙ্গল উৎপন্ন হবে – এ আশা করে থাকি । কর্তব্যবাদীও একথা অস্বীকার করবেন না যে, কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের ফলে মঙ্গলজনক ফলই উৎপন্ন হওয়া উচিত। এই মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হবে যদি ব্যক্তি অপরের সাথে একটি মানবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। কারণ অপর ব্যক্তির মঙ্গল কি, কোন বিষয়ের মধ্যে সেই মঙ্গল নিহিত রয়েছে তা বুঝতে হলে ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সাথে দৃঢ় মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। নিছক বুদ্ধিপ্রসূত সর্বজনীন নীতির দ্বারা অপর ব্যক্তির সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। যদি এমন হয় যে, আমাদের সম্মুখে কতগুলি নৈতিক নিয়ম বা নীতি বর্তমান আছে যেগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে সকলের মঙ্গললাভ করা সম্ভব তবে নৈতিক বিচার অনেক সহজতর হতো। কেননা আবেগহীন ব্যক্তি কম্প্যুটার তুল্য কোন যন্ত্রের ন্যায় পারদর্শিতার সাথে তার কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হতো। আমরা যেমন কম্প্যুটারে কতগুলি তথ্য টাইপ করলে কম্প্যুটার তার হার্ড ডিস্কে উপস্থিত প্রোগ্রামিংয়ের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে তেমনি নীতি বা আইন আমাদের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে কোন একটি নির্দিষ্ট কর্মের সিদ্ধান্ত দান করে। অপর ব্যক্তি ঐ একই নীতি অনুসরণ করে সমরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে, ঠিক যেমন অন্য কম্প্যুটার ঐ একই প্রোগ্রাম অনুসারে একই সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও পরিস্থিতির গুরুত্বকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র নীতি অনুসরণ করলে নৈতিক ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হওয়া যায় না । কারণ সামাজিক জীবরূপে আমাদের অপর ব্যক্তির প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে--যা আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে সম্পাদন করি। এই দায়িত্ববোধ হলো সামাজিক মঙ্গল রক্ষার প্রাথমিক শর্ত। এই দায়িত্ববোধ থাকলে ব্যক্তি তার কৃত কর্মটি অপর ব্যক্তিকে কিভাবে প্রভাবিত করবে তা বিচার করে তবেই কর্ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে নীতি নয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক, সহযোগিতা, সমমর্মিতাবোধ, ভালবাসা অর্থাৎ ব্যক্তির মনের আবেগ এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম উৎস বলে গণ্য হয়। এই আবেগগুলি অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি যদি নিছক নীতি অনুসরণের দ্বারা কর্তব্য পালনকে আবশ্যক বলে মনে করে তবে ব্যক্তির ঐরূপ কর্ম বাধ্যবাধকতায় পরিণত হবে। এরূপ কর্ম সামাজিক ও মানবিক মূল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এহেন ব্যবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততারও অভাব দেখা যায়। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আমরা কাঙ্ক্ষিত বলতে পারি না। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সম্বন্ধে দায়িত্বশীল, সহনশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন সেই ব্যক্তি ভালো নৈতিক ব্যক্তি বলে পরিচিত হন। বিপরীতপক্ষে যুক্তিবাদী ব্যক্তি যদি আবেগ বর্জিত হন তবে তাকে আমরা অনৈতিক না বললেও তাকে পছন্দ করি না। কারণ যে গুণগুলি ব্যক্তির চরিত্রে উপস্থিত থাকলে ব্যক্তি আমাদের নিকট কাঙ্ক্ষিত হন সেই গুণগুলি না থাকায় আমরা ব্যক্তিকে নিয়মনিষ্ঠ বলে গণ্য করলেও

পছন্দের ব্যক্তি বলতে পারি না। এ্যারিস্টটল[১১] মনে করেন, ভালো ব্যক্তি তিনিই যিনি ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন, অর্থাৎ ভালো চরিত্রের অধিকারী হবেন। ভালো চরিত্র অনুযায়ী জীবনযাপন মানুষের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলে একজন ব্যক্তিকে আমরা কখন ভালো ব্যক্তি বলে গণ্য করব? ভালো ব্যক্তি তাকেই বলা যাবে যাকে আমরা ভালো ব্যক্তি বলে পছন্দ করব। একজন ব্যক্তি 'ব্যক্তি'রূপে অপরের নিকট কাঙ্ক্ষিত হবে। আমরা যখন গাড়ী চালানোর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করি তখন অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করব যে ব্যক্তির এ বিষয়ে দক্ষতা আছে। আবার আমরা ভালো গায়ক তাকেই বলব, যে সুর, তাল, লয়, ছন্দ অনুসারে সুরেলা কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনের কাজটি দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম। সেরূপ একজন ভালো ব্যক্তি হলেন তিনিই যিনি ভালো জীবনযাপনে সমর্থ। নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনে সমর্থ ব্যক্তিই ভালো জীবনযাপনে সমর্থ। কারণ তিনি সমস্ত দ্বন্দ্বকে জয় করে বুদ্ধি ও আবেগের সামঞ্জস্য বিধান করে জীবনযাপনে সক্ষম। এরূপ ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির কারণে আমাদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ভালো ব্যক্তির সঙ্গে অপর সকলের মানবিক যোগ থাকে। তবে এই মানবিক সম্পর্ক থাকার অর্থ ব্যক্তি সংকীর্ণ সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করবে – তা নয়। ভালো ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই সমস্ত সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে সকলের প্রতি সমান আচরণ পালন করবেন। তিনি এক সর্বজনীন আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম পালন করবেন।

সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ সেকারণে ব্যক্তির কর্মকে বিচার করার পরিবর্তে ব্যক্তির চরিত্রে কতকগুলি নৈতিক আবেগ বা সদ্‌গুণ অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাঁদের মতে, নৈতিক আবেগ আমাদের দুভাবে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। কোনও কোনও আবেগ আমাদের কর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে এবং কোনও কোনও আবেগ আমাদের অনৈতিক কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। এই প্রেক্ষিতে আমি যেগুলি আমাদের কর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে সেগুলিকে সর্দথক আবেগরূপে অভিহিত করেছি এবং অনৈতিক কর্ম সম্পাদন করা থেকে যা বিরত রাখতে সাহায্য করে সেগুলিকে নঞর্থক আবেগরূপে ধরে নিয়েছি। প্রথমে নঞর্থক আবেগগুলি কিভাবে আমাদের অনৈতিক কর্ম করা থেকে বিরত রাখে তা আলোচনা করবো, এবং তারপর সদর্থক আবেগের আলোচনা করবো।

নৈতিক কর্ম সাধনে নঞর্থক আবেগের ভূমিকা

কোনও কোনও আবেগ আমাদের অনৈতিক কর্মকে প্রতিহত করে এবং আমাদের কর্তব্যাভিমুখী করে। যেমন, লজ্জা, ঘৃণা, নিন্দা ইত্যাদি আবেগগুলিকে আমরা বিচক্ষণভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হলে সেগুলি আমাদের অনৈতিক কর্ম সম্পাদনে বাধা দান করে। আমাদের মনে দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা আছে বলেই আমরা দেশদ্রোহিতামূলক আচরণ পালন করি না। আমাদের মনে নৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভীতি উপস্থিত থাকে বলেই আমরা অপরের দ্রব্য বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করি না; আমাদের মনে লজ্জাবোধ থাকার কারণেই আমরা মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি না। অনেক সময় আমরা আমাদের নিজ কর্মের জন্য লজ্জাবোধ করি। অজ্ঞানতাবশত কোন অন্যায় কর্ম করলেও আমরা লজ্জিত হই, ক্ষমা প্রার্থনা করি। যার জন্য আমাদের পারস্পারিক সম্পর্কের পুনর্গঠন সম্ভব হয়। অপরের প্রতি অন্যায় কর্ম করলে যেমন লজ্জিত হই, তেমনি নৈতিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলে নিজেকে ধিক্কার দিই, লজ্জাবোধ করি। আবেগগুলি এভাবেই আমাদের নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে, নৈতিক অনুভূতি গঠনে সহায়তা করে। হেইডট[২২] মনে করেন, নৈতিক সমাজের সদস্যরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কতগুলি নৈতিক অনুভূতি বর্তমান থাকে যার মধ্যে মুখ্য হল অমঙ্গলের আশংকা, ন্যায্যতাবোধ সম্প্রদায়গতবোধ বা সামাজিকতাবোধ, কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শুদ্ধতা বা পবিত্রতাবোধ। এই পাঁচটি নৈতিক অনুভূতির বোধ সমাজে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মনের গভীরে এমনভাবে প্রোথিত থাকে যে, ব্যক্তির নৈতিক কর্ম এই বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই সকল বোধের কারণেই আমরা অপরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকি, অন্যকে সাহায্য করি, হানিকারক চিন্তা করি না, ন্যায্যতার কারণে আমরা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকি, সাম্যের মনোভাব বজায় রাখা উচিত বলে মনে করি। এই ন্যায্যতাবোধের জন্যই আমরা সকলের প্রতি সমান আচরণ করি। একথা সত্য যে, সমাজে সকলের সাথে সখ্যতার সম্পর্ক থাকে না। বৈরিতা বাস্তব জীবন অসম্ভব না হলেও নৈতিক জগতের সদস্যরূপে অপরের প্রতি অসূয় মনোভাব যে পোষণ করা অন্যায় – এই নৈতিক অনুভূতি সকলের মধ্যেই বর্তমান থাকে। ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত নৈতিক সংস্কারকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বাস্তব জীবনে কখনও কখনও মানবিক দুর্বলতাবশত ব্যক্তির মনে অনৈতিক কর্ম পালনের প্রবণতা জন্মালেও, সাধারণত কোন ব্যক্তিই একজন অনৈতিক ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে চায় না। সম্প্রদায়গতবোধ যেমন সমাজে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা আত্মিকবন্ধন গড়ে তোলে, তেমনি সম্প্রদায়গতবোধ স্বার্থত্যাগ করার, অপরের মঙ্গলের জন্য নিজস্বার্থকে উপেক্ষা করার, অপরকে সাহায্য করার মনোভাব জাগ্রত করে।

এভাবে স্বার্থত্যাগের বোধ ধীরে ধীরে সমাজের গণ্ডীকে অতিক্রম করে সার্বিকতায় উত্তীর্ণ হয়। সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করার ফলে সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা---এগুলির প্রতি প্রত্যেকের আনুগত্য অবশ্যস্বীকার্য ধর্ম বলে গণ্য হয়। আবার একই সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মনে যেমন সমরূপ মঙ্গল বা ভালোর ধারণা উপস্থিত থাকে, তেমনি প্রত্যেকের মধ্যে ভালো বা মঙ্গলময় জীবনযাপন করার মনোভাব থাকে, যার জন্য আমরা ভ্রষ্টাচারী ব্যক্তিকে অপছন্দ করি, তার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখি। প্রত্যেকে পবিত্র জীবন যাপন করতে চাই এবং অপবিত্র বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখি। এই নৈতিক অনুভূতিগুলি শৈশবকাল থেকে এমনভাবে আমাদের মধ্যে কর্ষণ করা হয় যে, আমরা এই বোধের পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক কর্ম করে থাকি এবং এগুলির কারণে আমরা অন্যায় কর্ম করা থেকে বিরত থাকি। ব্লেয়ার[২৩] মনে করেন, নঞর্থক আবেগ ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ। নঞর্থক আবেগের অভাব থাকলে ব্যক্তি অনুশোচনা, অনুতাপ, অপরাধবোধের শিক্ষা পেতে পারে না। যেমন, 'হত্যা করা অন্যায়' – কেননা হত্যা করলে অপর ব্যক্তির ক্ষতি করা হয়। 'হত্যা করা' ক্রিয়াটি আমাদের নিকট মন্দ এবং অপরাধমূলক মনে হয়। এই নৈতিক বিশ্বাস বা বোধ আমাদের ঐরূপ কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখে। ব্লেয়ার-এর মতে, নৈতিক উৎকর্ষতার জন্য, নৈতিক কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত মানসিকতা প্রস্তুত করার জন্য নঞর্থক আবেগ উপস্থিত থাকা জরুরী। নঞর্থক আবেগ আচরণের শুদ্ধতা বজায় রাখতে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলির কারণেই আমারা ন্যায্য আচরণ সম্পাদন করি। কিন্তু আবেগগুলির কেবলমাত্র এমন নঞর্থক ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। এমন অভিযোগ কেউ উত্থাপন করতে পারেন যে, এই আবেগগুলি কেবলমাত্র কর্মকে সংশোধন করে, ব্যক্তিকে নয়। কারণ এই আবেগগুলি ব্যবহার করার অর্থই হলো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সদ্‌গুণসম্পন্ন নয় বলেই সে অন্যায় কর্মের প্রতি ধাবিত হতে পারে। এই আবেগগুলির উপস্থিতি তাকে তার অনৈতিক মনোভাব বা অন্যায় চাহিদাকে দমন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করছে। অর্থাৎ ব্যক্তির অপরের দ্রব্য গ্রহণের পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সে লোকনিন্দার আশঙ্কায় ঐরূপ কর্ম পালন করছে না। ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আত্মস্বার্থ পূরণের মানসিকতা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও লোকলজ্জা থেকে মুক্ত থাকার জন্যই সে তার অনৈতিক মানসিক চাহিদা পরিতৃপ্তি থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কান্টের দর্শনে যেমন ব্যক্তির চাহিদাকে অতৃপ্ত রেখে, তার ব্যক্তিগত মনোভাবকে অস্বীকার করে নীতি অনুসরণের প্রতি বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে, এখানেও সমরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ব্যক্তি সমাজের ভয়ে তার চাহিদাকে অস্বীকার করে কর্ম পালন করছে। পার্থক্য এই যে, কান্টের তত্ত্বে বুদ্ধিপ্রসূত নীতির প্রতি শ্রদ্ধার কারণে সেটিকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

বুদ্ধিপ্রসূত নীতির পরিবর্তে নৈতিক আবেগের উপস্থিতির দ্বারা সিদ্ধান্তের নৈতিকমূল্যকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এমন অভিযোগ সঠিক নয়, যেহেতু দার্শনিকেরা নঞর্থক আবেগের সাথে সাথে সদর্থক আবেগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিক, যাঁরা আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানের পক্ষপাতী, তাঁরা মনে করেন, নৈতিক আবেগ ব্যক্তির চরিত্র গঠনেরও সহায়ক। তাঁরা কর্মের বিচারকে গৌণ বলে মনে করেন বলেই নৈতিক চরিত্র গঠনকেই মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চরিত্র গঠনের জন্য কতকগুলি সৎ আবেগ, প্রবণতা তার চরিত্রের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যরূপেই উপস্থিত থাকা কাম্য বলে তাঁরা মনে করেন। এই কারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন।

নৈতিক কর্ম সাধনে সদর্থক আবেগের ভূমিকা

কোনও কোনও সদর্থক আবেগ আমাদের নৈতিক কর্মসাধনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। যেমন, কোন ব্যক্তির সাহসী কর্ম প্রত্যক্ষ করে আমি নিজেও ঐরূপ সাহস অর্জন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি। একজন ব্যক্তিকে পরমত সহিষ্ণু ও সংযমী দেখে আমি নিজেও সেই গুণ অর্জন করতে সচেষ্ট হতে পারি। আবার কোন আবেগ কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও আমাদের মনোভাবকে এমনভাবে গঠন করতে পারে যা সকল কর্মে প্রতিফলিত হয়। যেমন, ভালোবাসা, সমমর্মিতা নামক আবেগ আমাদের মনে প্রবণতারূপে অর্জন করলে তা আমাদের সকল কর্মে প্রতিফলিত হয়। সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিবিদেরা মনে করেন, সৎ ব্যক্তির মনে উপস্থিত আবেগ যেহেতু নৈতিকবোধের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় তাই সেই অনুভূতি বা আবেগের প্রয়োগে গৃহীত সিদ্ধান্তে ব্যক্তিসাপেক্ষতার স্পর্শ থাকলেও তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় না। আমরা দেখি ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউমও অনুভূতি বা ভাবাবেগের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিতাত্ত্বিকেরা আবেগ এবং বুদ্ধির সামঞ্জস্যবিধানকে কাঙ্ক্ষিত মনে করলেও ডেভিড হিউমের মতে, আবেগের দ্বারা বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তাঁর মতে, বুদ্ধি হলো আবেগের আজ্ঞাবহ দাস।[১৪] নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মাদির ভালো-মন্দ বিচারের ভিত্তি যুক্তি বা বুদ্ধি নয়, তা হল অনুভূতি। একথার অর্থ এমন নয় যে, ব্যক্তি তার ব্যবহারিক জীবনে কর্মাদির ক্ষেত্রে যুক্তির বা চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। এর অর্থ সাধারণ মানুষের যুক্তি বা চিন্তা বিশ্বাস নির্ভর। যে বিশ্বাসের মূলে রয়েছে মানুষের অনুভূতি, যুক্তি নয়। তাই শুধুমাত্র বুদ্ধি বা বিচারশক্তি মানুষের নৈতিক কর্মের উৎস হতে পারে না, যদি না তা কোন অনুভূতি

বা ভাবাবেগের সাথে সম্পর্কিত হয়। আবেগ একটি বিশ্বাস গঠন করে---যে বিশ্বাস বিশ্লেষণ করে বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে হিউমের মতে, বুদ্ধি আমাদের কোন বিষয়ে তথ্য প্রদান করে, কিন্তু প্রতিটি নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আবেগই মুখ্য। যখন কোন কর্মকে ভালো বা মন্দ বলা হয় তখন সেই কর্মের প্রতি অনুমোদন বা অননুমোদনের অনুভূতি ব্যক্তির মনে উদিত হয়। যখন আমি কোন বিশেষ কর্মকে ভালো বা মন্দ বলে মনে করি, তখন আমি সেই কর্মটিতে আমার অনুমোদন বা অননুমোদন থাকার কথা বলি।

হিউমের এই মতবাদ থেকে একথা মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিগত অনুভূতি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় তবে সেই সিদ্ধান্ত ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে প্রতিফলিত করবে। কিন্তু হিউমের অভিমত এমন নয়। এখানে তিনি যে নৈতিক অনুভূতির কথা বলেছেন তা ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে নির্দেশ করে না। আমাদের মনে হতে পারে যে, ব্যক্তিগত বিশ্বাসই যখন আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা গঠন করছে তখন সেই বিশ্বাসের কোন বস্তুগত সত্যতা নেই। অন্যভাবে বলা যায়, সেই বিশ্বাস হবে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু ব্যক্তির নৈতিক অনুভূতি যে ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভূতি নয় তা ডেভিড হিউমের আলোচনায় স্পষ্ট। তাঁর মতে, ভালো-মন্দের নির্ধারক মানদণ্ড হলো আমাদের মনে উপস্থিত মঙ্গলের ধারণা। সমাজজীবনে বা গোষ্ঠীজীবনের জন্য শুভ বা মঙ্গল যা তাই হলো ন্যায়। হিউম সর্বজনীন বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক সমাজের মঙ্গল বা ন্যায়ের ধারণা সেই সমাজের জন্যই প্রযোজ্য। সমাজের সদস্যদের নৈতিক চাহিদার দ্বারা মঙ্গল বা শুভর ধারণা গড়ে ওঠে। ফলে ব্যক্তির বিশ্বাসও সেই মঙ্গলের ধারণার অনুরূপ হবে। তাই নৈতিক কর্মে অনুমোদন ব্যক্তির মঙ্গলের ধারণার নিরিখে প্রকাশিত হবে। একই নৈতিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে অনুমোদনযোগ্য বিষয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। কোন ব্যক্তির কর্ম অনুমোদনযোগ্য হলে তাঁকে প্রশংসা করা হবে, অন্যথায় নিন্দা করা হবে। ফলে নৈতিক কর্মে অনুমোদনের বিষয়টি সমাজ নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে বিচার করা হবে, তা কখনই সম্পূর্ণ ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয় হবে না। ফলে এটিকে সেই অর্থে নৈর্ব্যক্তিক বলতে হবে। এমন নৈর্ব্যক্তিক সত্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অপর ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি দানকে হিউম নৈতিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। ব্যক্তি নিজের কর্ম নির্ধারণ করার সময়ে অনুভূতি দ্বারা গঠিত বিশ্বাসকে বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই সিদ্ধান্ত সমাজ নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারী বলে ব্যক্তি আশা করে যে তার সিদ্ধান্ত অপরের দ্বারা অনুমোদিত হবে, প্রশংসনীয় হবে। সমাজের মধ্যে আমরা দেখি আমার কাজের জন্য সমাজে আমি প্রশংসা পাচ্ছি কিনা, অপর ব্যক্তি আমাকে পছন্দ করছে কিনা। হিউমের কথায়, " ⋯ the

truth is that we do not really know who we are until we know how others see us."[২৫] এভাবে হিউম সামাজিক স্বীকৃতির নিরিখে ব্যক্তির অবস্থানকে নির্ণয় করেছেন, যাকে Sympathetic Sociability[২৬] বলা হয়েছে। তবে তাঁর মতে, নৈতিক সিদ্ধান্তের প্রতি অনুমোদন বা অননুমোদন তখনই সম্ভব হয় যখন ব্যক্তি সৎ চরিত্রের অধিকারী হন। অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান হওয়া নৈতিকতার প্রাথমিক শর্ত বলতে হয়। কারণ সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই সামাজিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হিউম সৎ চরিত্রের কথা আলোচনাকালে ব্যক্তির চরিত্রে আবেগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমমর্মিতা নামক আবেগটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আবেগ যা আমাদের সকল নৈতিক বোধের উৎস। এই বোধের জন্যই আমরা একে অপরের সঙ্গে নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যথাযথ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হই।

সমমর্মিতা আবেগ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার সহায়ক

আমাদের অস্তিত্ব কখনই সামাজিক সম্পর্কের উর্ধ্বে নয়। সামাজিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই নৈতিক সিদ্ধান্ত যথাযথ হয় বলে হিউম[২৭] দাবি করেন। অর্থাৎ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত যথাযোগ্য তখনই হবে যখন ব্যক্তি সমমর্মিতার সাথে তার কর্মের ফলভোগকারী ব্যক্তিদের অবস্থানটি বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সমমর্মিতার দ্বারা আমরা যেমন অপরের কর্মকে বিচার করতে সক্ষম হই, তেমনি নিজের কর্মের বিচার করতেও সমর্থ হই। অপরের কর্মকে বিচার করার সময় ব্যক্তি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সমমর্মিতার সাহায্যে অপর ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতিকে অনুধাবন করে। এখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি সমমর্মিতা তখনই বোধ করবে যখন তারা একই নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হবে, সমাজ নির্ধারিত নৈতিকতার মানদণ্ড অনুসরণ করবে। ফলে আমার সিদ্ধান্ত যদি সমাজ স্বীকৃত ন্যায়ের ধারণার অনুরূপ হয় তবে আমার বিচারকে ন্যায়বিচার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে আমার নৈতিক সিদ্ধান্তই সকলের নৈতিক সিদ্ধান্তরূপে বা অপরের সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হয়। হিউমের মতে, হৃদয়ে উপস্থিত অনুভূতি, আবেগগুলির পরিমাণগত তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলি বিরুদ্ধ হবে না। যেহেতু ঐ আবেগগুলি একই নৈতিক কাঠামো অনুমোদিত এবং সহমমর্মিতাবোধে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয় একই নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য। সমমর্মিতার বোধ শুধুমাত্র অপর ব্যক্তির নৈতিক মূল্যায়নেই সহায়তা করে না, চরিত্রে সমমর্মিতার উপস্থিতির কারণে পরিস্থিতি অনুধাবনের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণও সঠিক হয়। আমার কৃতকর্ম অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে মঙ্গল উৎপাদন করছে কিনা বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজের মঙ্গল উৎপাদন করছে কিনা—তাও বুঝতে সমর্থ হই সমমর্মিতাবোধের দ্বারা। কেননা নৈতিক কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমি যেমন অপর ব্যক্তির প্রতি

দায়বদ্ধ, তেমনই সমাজের সকলের প্রতি দায়বদ্ধ। তাই নৈতিক কর্তারূপে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপরব্যক্তির প্রতি দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা একই সমাজের সদস্যরূপে সমাজের মঙ্গল সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি এক। সকলের মঙ্গলের জন্য কোন বিষয়টি সকলের নিকট আনন্দদায়ক, কোন বিষয়টি সমাজের জন্য মঙ্গলজনক—এই বোধ আমাদের থাকে বলেই আমরা একই নৈতিক সমাজের সদস্যরূপে পরিগণিত হই। এইভাবে নৈতিক অনুভূতিগুলি ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির মনে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি আবেগ উপস্থিত থাকলে সে ঐ আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে পরহিতকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার মনে উপস্থিত সহমর্মিতাবোধ তাকে অপরের প্রতি ন্যায্য আচরণ পালনে উৎসাহিত করে। ব্যক্তির মনে এই জাতীয় অনুভূতি উৎপন্ন হওয়ার কারণে ব্যক্তি অপরের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করে। তার মনে এই সকল আবেগ উপস্থিত থাকে বলে, ব্যক্তির কর্মের সিদ্ধান্তে তার প্রতিফলন ঘটে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনও কোনও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের মতে, সমমর্মিতাবোধ কেবলমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় তা না। এমন হতে পারে যে, কোন গোষ্ঠী বা সমাজ সভ্যতার অগ্রগতিতে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে, এমনকি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অপরগোষ্ঠীর থেকে অনেক বেশি উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমমর্মিতা বোধ উপস্থিত থাকলে এই ভিন্ন দুটি গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করে তাদের সমমর্মিতা বোধের কারণে একে অপরের সাথে অভিন্ন বোধ করতে সমর্থ হবে। এইভাবে দুজন ব্যক্তি দুটি নৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একই অবস্থানে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। একারণেই জে। বোনার বলেছেন, "He must have tuned down his high pitch, and I must have tuned up my low one, to 'make one music'."[২৮] এভাবে নৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সংকীর্ণ দেশের সীমাকে, সংস্কৃতির সীমাকে অতিক্রম করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ, কাল নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। তবেই আমরা সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে সক্ষম হবো। অপরের সুখ দুঃখের আবেগকে নিজের আবেগ বলে অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। অপরের সুখে সুখী এবং অপরের দুঃখে দুঃখবোধ করবো। সুতরাং মনের সম্পর্ক ব্যতিরেকে কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। শুধু নিকট ব্যক্তিদের সঙ্গেই নয়, দূরের ব্যক্তিদের সাথেও সম্পর্ক রচনা সম্ভব হবে সমমর্মিতাবোধের দ্বারা। এইভাবেই সমমর্মিতাবোধ ব্যক্তিকে

ব্যক্তিসাপেক্ষতার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করতে সাহায্য করে। এ সকল আলোচনা থেকে বলা যায়, আবেগ আমাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করতে সক্ষম।

ভালোবাসা আবেগ নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার সহায়ক

নৈতিকতায় বিশ্বজনীনতাকে স্পর্শ করার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। বরং পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েই জীবনে সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়। সেই কারণে বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা, সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ককে নৈতিক ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। আমরা আমাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ হই, যার জন্য একে অপরের প্রতি যত্নশীল হই। সেইরকম বন্ধুর সঙ্গে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য যে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হয় তাকে স্বীকার করেই আমরা আনন্দ লাভ করি। যদি নৈতিকতায় কেবলমাত্র বাহ্যিক সম্পর্ককে স্বীকার করা হয় তবে ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করতে হয়। বিষয়টি এমন হয় যে, সব মানুষই এক, ফলে একজন ব্যক্তিকে অন্যজনের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করা যায়। সেখানে বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা মানবিক সম্পর্ক নয়, কর্তব্যবোধের দৃষ্টিতে বন্ধুর জন্য কর্তব্যসাধন করা। কিন্তু কর্তব্যবাদীদের মতবাদ এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে সেই মতবাদের প্রয়োগ দুটি ভিন্ন বিষয়। মাইকেল স্টকার মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে অস্বীকার করার অর্থ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা। তাঁর মতে, ব্যক্তি মানুষ আন্তর সম্পর্কগুলির প্রেক্ষিতে তার জীবনকে গড়ে তোলে। নতুবা সে ব্যক্তি একাকী জগতে বসবাস করবে। সামাজিক সম্পর্কের অভাবের ফলে ব্যক্তি যে একাকীত্ববোধে আক্রান্ত হবে স্টকার তাকে স্কিৎজোফ্রেনিয়া[২৯] নামক মানসিক পীড়ার সাথে তুলনা করেছেন। একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা তার জগতকে গড়ে তোলে। সেখানে কর্তব্যবোধ, বাধ্যবাধকতাবোধ অন্তর থেকেই উৎপন্ন হয়। আমি যাকে বন্ধু বলে বিবেচনা করি তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে, শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকে। এই আবেগসঞ্জাত বোধগুলির জন্যই আমরা অপরের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনুভব করি। যেমন, অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া এবং তার আরোগ্য কামনা করা কেবলমাত্র কর্তব্যবোধের জন্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা নয়। যদি বন্ধু অবগত হন যে, তার বন্ধু শুধুমাত্র কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন, ভালোবাসার জন্য নয়, তাহলে ঐ অসুস্থ বন্ধু তার বন্ধুর ঐরূপ স্বভাবের জন্য নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন না, বরং দুঃখিতই হবেন। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি আমাদের জীবনে আনন্দদায়ক হয়, প্রত্যাশা পূরণে সাহায্য করে এবং এভাবেই

সমাজে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। নৈতিকতায় কেবলমাত্র বাহ্যিক সম্পর্ক নয়, আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বা আন্তর সম্পর্ককেও স্বীকার করতে হয়। নতুবা আমাদের জীবনের চলার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, আমাদের একাকীত্ব বোধ জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই স্টকারের মতে বাহ্যিক সম্পর্ক নৈতিকতার একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু কখনই জীবনে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়।

তবে ভালোবাসা নামক আবেগ কেবলমাত্র সীমিত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয় না, এই আবেগ প্রবণতারূপে অর্জন করলে ব্যক্তি ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজের সকলের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রচনা করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ ভালোবাসার দ্বারা ব্যক্তি বিশ্বের সকলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। বিশ্বজনীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসা নামক আবেগই সম্পর্ক রচনার প্রাথমিক ভিত্তি বলে মনে করেন খ্রীস্টিয়ান সোয়ান্টন।[৩০] তাঁর মতে, বিশ্বের সকলের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন বিনা সকলের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আমরা উদ্বুদ্ধ হতে পারি না। যখন কোন ব্যক্তির কোন না কোন প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্য আমি কর্ম সম্পাদন করি, তখন একথা স্বীকার করতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির সঙ্গে আমি একটি বন্ধনে আবদ্ধ। ঐ বন্ধন উপলব্ধি করার জন্যই ব্যক্তি অপরের মঙ্গলার্থে এবং তার চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য কর্ম সম্পাদন করে। এই সম্পর্কের বন্ধন একজন বন্ধুর ক্ষেত্রে, একজন আত্মীয়ের সঙ্গে, সমাজের যে কোন সদস্যের সঙ্গে অথবা অপরিচিতি কোন ব্যক্তির সঙ্গেও হতে পারে। আমরা এরূপ বন্ধন তৈরি করি ভালোবাসার দ্বারা। তবে একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, অপর ব্যক্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে আমার ওই ব্যক্তির থেকে কোন মানসিক প্রত্যাশা থাকবে না। অর্থাৎ দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক থাকবে না বা আমার তাঁর প্রতি বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা থেকে তার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করা হবে না। কেননা এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে দেখা যায় অপরের কাছ থেকে সাহায্য বা কোন কিছুর প্রত্যাশা ব্যতীত ব্যক্তির মনে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বর্তমান থাকে। বৃদ্ধ পিতা, বন্ধু, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীকে ভালোবাসলেও তাদের নিকট থেকে প্রত্যাশা নাও থাকতে পারে। আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসলেও তার নিকট থেকে কোন প্রত্যাশা থাকে না। আবার ভালোবাসার অর্থ কেবলমাত্র অপর ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে ভালোবাসার মানুষকে আনুকূল্য প্রদর্শন করা নয়। আমরা অনেক সময়ই এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসি বা শ্রদ্ধা করি যেখানে আমার সহযোগিতা বা সাহায্য তাদের প্রয়োজনই হয় না। ব্যক্তিগত পরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে আমরা এমন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারি যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণ বা প্রত্যাশা পূরণের প্রশ্ন অবান্তর। যেমন আমি যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা করি বা ভালোবাসি, আমার জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করি তখন সেখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ পরিতৃপ্তির প্রসঙ্গ অবাস্তব হয়ে যায়। এমনকি

যখন আমি আমার কোন বন্ধুকে ভালবাসি তখন তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি মুহূর্তে তার সহায়তা করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এমন নয় যে, অপর ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। ভালোবাসা কেবলমাত্র আদান-প্রদান বা চাহিদাপূরণের মাধ্যম নয়। ভালোবাসা এমন বিষয়কে বোঝায় না যা কেবলমাত্র সাহায্য প্রাপ্তি বা প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়। এমন বিষয় হলে তাকে অস্বাস্থ্যকর ভালোবাসা বলতে হয়। তাই ভেলেম্যানের[৩১] মতে, যেখানে ভালোবাসা স্বার্থ বা প্রত্যাশা পূরণের সাথে যুক্ত থাকে, সে হলো অন্ধ ভালবাসা। অন্যকে খুশি করার জন্য যেখানে ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয় তাকে অস্বাস্থ্যকর ভালোবাসা বলতে হবে। যেমন, মহাভারতে দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ভালোবাসা ছিল অন্ধ ভালোবাসা, যার জন্য ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের অন্যায় কর্মের বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অন্ধ ভালোবাসা দুর্যোধনকে অনৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ভুবন' গল্পে অনাথ ভুবন মাসীর অন্ধ স্নেহে ও ভালোবাসায় পালিত পাঠশালার বন্ধুদের দ্রব্যাদি চুরি করে আনা সত্ত্বেও মাসী তার অন্যায় কর্মকে নিন্দা না করায় পরিণত বয়সে সে চোর বলে সাব্যস্থ হয়। মাসীর অন্ধ ভালোবাসা ভুবনকে অনৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত করে। ফলে এরূপ অন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর ভালোবাসা বিচারহীন হওয়ায় তাকে নৈতিক আবেগ বলে গণ্য করা যায় না। ভালোবাসা কিন্তু কেবলমাত্র এমন সংকীর্ণ মনোভাবের প্রকাশ নয়।

সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিক ভেলেম্যান বলেন যে , আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসি তখন তার চরিত্রে উপস্থিত সার্বিক, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিক সদ্‌গুণগুলিকে মূল্য প্রদান করি। যে ব্যক্তি সাহসী, পরোপকারী, দয়াবান, বিচক্ষণ সেই ব্যক্তির ওই গুণগুলিকে আমরা মূল্য দিই এবং ব্যক্তির ঐ গুণগুলিকেই ভালোবাসি। ফলে এই সার্বিক, ব্যক্তিনিরপেক্ষ সদ্‌গুণের প্রতি ভালোবাসা হলো বৌদ্ধিক। আমরা অপর ব্যক্তির সদ্‌গুণগুলিতে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি, সেই গুণগুলিকেই মূল্য দিই, তাকে প্রশংসা করি। আমরা নিজেদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সেই গুণগুলি অর্জন করতে চেষ্টা করি। ফলে বলা যায়, ব্যক্তির ব্যক্তিনিরপেক্ষ সদ্‌গুণকেই আমরা পছন্দ করি। এরূপ সদ্‌গুণ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। সূর্যের রশ্মি যেমন সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে, স্থান, কাল পাত্রভেদে সকলের ক্ষেত্রে বর্ষিত হয়, তেমনি ভালোবাসা নামক আবেগ নৈতিক সদ্‌গুণরূপে ব্যক্তির চরিত্রে উপস্থিত থাকলে তা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। সর্বজনীন ভালোবাসা হল নৈর্ব্যক্তিক ভালোবাসা, যেখানে যুক্তিবুদ্ধির কোন অবকাশ থাকে না। কেননা এক্ষেত্রে ভালোবাসার লক্ষ্য কোন ব্যক্তি মানুষ নয়। ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধক গুণকে ভালোবাসা।

সুতরাং ভালোবাসাই সেক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে, উপায় হবে না। একজন শিক্ষক যখন ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসেন তখন শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর একটি বন্ধন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভালোবেসে ছাত্রছাত্রীর উন্নতির জন্য, তাদের ইচ্ছা, চাহিদা, প্রত্যাশাকে পূরণ করার চেষ্টা করে। এই প্রত্যাশা পূরণ কোন সংকীর্ণ স্বার্থবোধ পূরণের জন্য নয়। বিশেষ কোন ছাত্রছাত্রীর প্রতি সংকীর্ণ স্বার্থের বন্ধনে তার উন্নতি করার চেষ্টা নয়। তবেই সেই শিক্ষক হবেন প্রকৃত দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। ফলে বলা যায় ভালোবাসা নামক আবেগ বস্তুগত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়।

সর্বজনীন ভালোবাসা কখনই সংকীর্ণ স্বার্থকে প্রতিফলিত করে না। আমরা বিশ্ব ভালোবাসার দ্বারা বিশ্বের সকল প্রাণীদের প্রতি, এমনকি জড় জগতের প্রতিও ভালোবাসাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারি। এভাবে বিশ্বভালোবাসার দ্বারা ব্যক্তি জীবনকে আনন্দময় পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক, সর্বজনীন, শর্তহীন ও সীমাহীন ভালোবাসার দ্বারা ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এরূপ ভাবনা আমরা দেখতে নাই ভারতীয় চিন্তাবিদ্ বিবেকানন্দের[৩২] চিন্তায়। তাঁর মতে, বিশ্বভালোবাসার বোধ না জন্মালে সার্বিকভাবে পরহিতসাধন করা সম্ভব নয়। এর জন্য তিনি ব্যক্তিকে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে বলেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বভালোবাসায় দীক্ষিত হতে হলে ইহজগতের ক্ষুদ্র স্বার্থের সম্পর্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার অভ্যাস করতে হয়। যখন ব্যক্তি 'আমিত্ব' ও 'মমত্ব' (me and mine)-এই বোধের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে তখনই ব্যক্তির চিত্ত বিশ্বভালোবাসায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। এরূপ ব্যক্তিই আনন্দময় অবস্থা লাভ করতে সক্ষম। সুতরাং ভালোবাসা নামক আবেগ চরিত্রের এমন গুণ যা ব্যক্তিকে সার্বিকভাবে সকলের সঙ্গে যুক্ত করে চরম আনন্দ দান করে। জীবন মঙ্গলময়ভাবে অতিবাহিত করার জন্য ভালোবাসা নামক আবেগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ ভাবনা ভারতীয় বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় আমরা দেখতে পাই। বৌদ্ধদর্শনে[৩৩] পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহার ভাবনার মধ্যে রয়েছে বিশ্বমৈত্রীর ভাবনা। এই মতে, মানবজীবনের চরম লক্ষ্যই হল মৈত্রী ভাবনা। এই ভাবনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন যে, "মা যেমন তার পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত জীবকে তেমনি অপরিমিত প্রেম ভালোবাসায় রক্ষা করতে হবে।" মা যেমন সবকিছু উপেক্ষা করে তার সন্তানের কল্যাণেই জীবনপাত করেন, তেমনি নিজের স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে, মৈত্রী ভাবনায় ও ভালোবাসাকে আশ্রয় করে বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনা করতে হবে। এই প্রকার মৈত্রী ভাবনায় বিভোর অবস্থাই ব্রহ্মবিহার অবস্থা। মানুষের প্রকাশ সত্যে, পূর্ণতা আনন্দে। উপনিষদে বলা হয়েছে যিনি জগতের সব কিছুকে নিজের মতো করে জানেন, সকল জীবকে আত্মবৎ মনে করেন, তিনিই আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি

করেন। এই সত্যকে জানা বা উপলব্ধি বাইরে থেকে নয়, তা হল মর্মমূলে প্রবেশ করে। সকল জীবকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করে জানা বা উপলব্ধি করা। এভাবে মৈত্রীকে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত করে জানাই হল নির্বাণ বা মুক্তি। বুদ্ধমতে, প্রেমেই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ হয়। বিশ্বমানবের দুঃখ অনুভব করতে হলে এবং সেই দুঃখমুক্তির পথ নির্ধারণ করে দুঃখনিরাস সম্ভব করতে হলে কেবল মৈত্রী বা ভালোবাসার মাধ্যমেই সম্ভব। জগতকে হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কলুষমুক্ত করতে হলে তা কেবল প্রেম বা ভালবাসার মাধ্যমেই সম্ভব। প্রেমই আনন্দ, প্রেমই পূর্ণতা। প্রেম প্রত্যাশার অপেক্ষা রাখে না, এ হলো কেবলই অপরকে দেওয়া। যে দেওয়ার মধ্যে নেওয়ার বা প্রত্যাশার কোন যোগ নেই। এই উপলব্ধিই জীবনকে সকল জীবের অভিমুখে প্রসারিত করে। সর্বজীব সুখী হোক, জীব মাত্রই শত্রুহীন হোক, সবাই অহিংস হোক, সর্বজীব আত্মারূপে জীবনযাপন করুক। কোন জীব তার ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক – এই ভাবনাতেই চিত্তকে প্রসারিত করে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে ব্রক্ষবিহার সম্ভব হয়। বৌদ্ধদর্শনে এই ব্রক্ষবিহার ভাবনার মধ্যে রয়েছে অপরকে বোঝা, অপরকে যথাযোগ্য ভাবে অনুধাবন করার প্রেরণা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, একদিকে স্বার্থপর বাসনাকে জয় করা এবং অন্যদিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করে বিস্তার করা – এই দুই-এর শিক্ষা বিশ্বপ্রেমকে জাগ্রত করে। সেই কারণে তাঁর ভাবনাতে দেখতে পাই , ‘‘বিশ্ব সাথে যোগী যেথায় বিহার সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও’’। অর্থাৎ তাঁর মতে ছোট আমি থেকে বৃহত্তর আমিতে নিজেকে পরিণত করলে পরম আনন্দ লাভ করতে ব্যক্তি সক্ষম হবে। ফলে আবেগের বর্জনের প্রয়োজন নেই, বরং সংযত সংকীর্ণ আবেগের পরিশুদ্ধতার দ্বারা শুদ্ধ আবেগ অর্জন করাই ব্যক্তির নৈতিক লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। এই আবেগই নৈতিক আবেগ। নৈতিক আবেগ আত্মতৃপ্তি নয়, বরং আত্মস্বার্থকে অতিক্রম করে বিশ্বজগতের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন স্থাপন করা। অপরকে ভালোবাসলে তবেই ব্যক্তি অন্যের প্রতি কর্তব্যকর্ম পালন করে। সুতরাং ভালোবাসা নৈতিক আবেগ বা বিষয়গত আবেগ। এ কারণে সদ্‌গুণের নীতিদার্শনিক মতে, নৈতিক আবেগের প্রবণতাই হল নৈতিক সদ্‌গুণ। নৈতিকসদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই সংকীর্ণ আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন না। বরং তাঁর চারিত্রিক প্রবণতা বা সদ্‌গুণ থেকে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিষয়গত বা সঠিকভাবে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে ব্যক্তি একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করবেন তা নয় , বরং বস্তুগত সিদ্ধান্ত বা সার্বিক সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আবেগের উপস্থিতি যে কেবল সংকীর্ণ স্বার্থবোধক মনোভাবকে প্রতিফলিত করে তা নয়। বরং যথাযথ নৈতিক আবেগের উপস্থিতিতে ব্যক্তি ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

কর্মের বিচার ব্যক্তির বিচারের জন্য যথেষ্ট নয়

ভালো চরিত্রের অধিকারী হওয়া বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করবেন না। এমন কি কান্টও বলবেন না যে, সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া অন্যায়। কিন্তু নীতিনিষ্ট দার্শনিকেরা ব্যক্তির কর্মের বিচারকে প্রাথমিক বলে মনে করেন বলে তাঁদের মতে, যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে সেই ব্যক্তিই ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নীতি অনুসারে কর্ম করে সেই ব্যক্তিই ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তি। আবার উপযোগবাদ অনুসারে যে ব্যক্তি তার কর্মের মাধ্যমে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক উপযোগিতা উৎপাদনে সক্ষম সেই ব্যক্তিই ভালো ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। কর্তব্যবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা এভাবেই ব্যক্তির চরিত্রকে তার প্রবণতাকে তার ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদিকে গৌণ বলে মনে করেন, যেহেতু তাদের নিকট কর্মের বিচারই মুখ্য। চরিত্র এখানে গৌণ, যেহেতু তা কর্মের বিচার দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নৈতিক আবেগগুলি সর্বদাই কোন নির্দিষ্ট কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় না। যেমন, ন্যায্যতা বোধ যে তাদের নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যেই প্রতিফলিত হয় তা নয়। বরং বলা যায় যে, ব্যক্তি চরিত্রে বর্তমান এই গুণটি তার সব কর্মের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। আবার কর্মের বিচারের দ্বারা সর্বদা ব্যক্তির বিচার সম্ভব হয় না। নৈতিক দ্বন্দ্ব ও নৈতিক ভাগ্যের ক্ষেত্রগুলিতেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যেখানে তার সম্মুখে এমন দুটি বিরোধী বিকল্প উপস্থিত থাকে যে দুটি বিকল্পই তার নিকট কর্তব্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু বিকল্প দুটি বিরোধী হওয়ায় ঐ ব্যক্তি দুটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে উপেক্ষা করতে বাধ্য হন। অথচ বিকল্প দুটি হয়ত এমন যা স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্য পালনীয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে এমন কর্ম সম্পাদন করেন যা তার চরিত্রানুযায়ী হয় না। সেক্ষেত্রে তার কর্মকে বিচার করে তার চরিত্রের বিচার করলে সেটি যথাযথ হবে না, যেহেতু কর্মটি তার চরিত্রানুযায়ী নয়। কারণ ঐ বিকল্পটি অনুসরণ করার অর্থ হল অপর বিকল্পটিকে অস্বীকার করা---যা আরেকটি কর্তব্যকর্মকে অস্বীকার করার নামান্তর। ব্যক্তি যে কর্মই পালন করুক না কেন সে তার একটি কর্তব্যকে অস্বীকার করেছে বলে তাকে অন্যায়কারী বলে বিবেচনা করা হয়। নৈতিক ভাগ্যের ক্ষেত্রে একইরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়। ব্যক্তির ভাগ্য ভালো হলে ব্যক্তির কর্মটি অন্যায় হলেও তার ফল অনিষ্টকর হয় না। আবার বিপরীতভাবে বলা যায়, ব্যক্তির সৎ উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম অনেকসময় হানিকারক ফল উৎপন্ন করে। এভাবেই কর্মের বিচারের দ্বারা ব্যক্তির মূল্যায়ন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে কর্মের বিচারের দ্বারা কোনভাবেই ব্যক্তির বিচার করা কাম্য নয়। ধরা যাক, কোন একজন ব্যক্তি গৃহে আগত অতিথিকে চা পরিবেশন করলেন, যা পান করে ঐ অতিথির মৃত্যু

হলো। মৃত্যুর কারণ অন্বেষণ করে আবিষ্কৃত হলো চা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত দুধ কোনভাবে বিষাক্ত মাকড়সার দ্বারা বিষাক্ত হয়। এই দূষিত দুধ চায়ে মিশ্রিত করার ফলে চা বিষাক্ত হয়ে অতিথির মৃত্যু হয়েছে। এক্ষেত্রে চা পরিবেশনকারী ব্যক্তির নৈতিক ভাগ্য মন্দ বলে সে অতিথির মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এভাবেই অনেক সময় নৈতিক ভাগ্যের কারণে আমাদের কর্ম অন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে। নৈতিক দ্বন্দ্ব বা নৈতিক ভাগ্যের উপস্থিতি ব্যক্তির কর্মকে প্রভাবিত করে বলে বা ব্যক্তির কর্মের উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে বলেই ব্যক্তির কর্মকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিচার করার কথা সমসাময়িক কালের একদল দার্শনিক মনে করলেন। চরিত্রে যদি যথাযথ আবেগ, প্রবণতা, ইচ্ছার উপস্থিতি বর্তমান থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে। ফলে আবেগ আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম একথা স্বীকার করতে হবে।

নৈতিক আবেগের উপস্থিতি কর্তব্য পালনের পূর্বশর্ত

এই কারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা মনে করেন, কর্তব্য কর্ম মনের আবেগকে তৃপ্ত করতে না পারলে আমাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। আচরণ মনের দ্বারা চালিত হলে তবেই তা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ হয়ে ওঠে। আবার আচরণ তখনই মনের দ্বারা চালিত হয় যখন ব্যক্তির মনে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, আভোবাসা, সহানুভূতি উপস্থিত থাকে। ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র নীতির বাধ্যবাধকতার দ্বারা চালিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে তাহলে সেই কৃতকর্ম আপাত কর্তব্য কর্ম বলে বিবেচিত হবে বলে বার্নাড উইলিয়ামস[৩৪] মনে করেছেন। সেই কৃতকর্মের সঙ্গে ব্যক্তির ভালোলাগা বা আনন্দ লাভের প্রশ্ন থাকে না। সমাজের মঙ্গলের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতিহীন কেবলমাত্র কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা হবে। কিন্তু নৈতিকতায় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল নৈতিক যত্ন বা নৈতিকতার প্রতি যত্নশীল হয়ে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করা। এবং তা সম্ভব হয় আবেগের উপস্থিতির মাধ্যমে। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদ্‌দের এমন বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে অবশ্য কর্তব্যবাদী নীতিনিষ্ট দার্শনিকেরা মনে করেন যে, সেক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রকৃত স্বরূপ লঙ্ঘিত হবে। নৈতিক সিদ্ধান্তের বৈধতা বা শুদ্ধতা ক্ষুণ্ন হবে। ফলাফলবাদী এবং কর্তব্যবাদী উভয় মতবাদই নৈতিকতায় সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব পোষণ করে যুক্তি দিতে পারেন। তাঁদের দাবি অনুসারে আবেগভিত্তিক সিদ্ধান্ত নৈতিকতায় পক্ষপাতদুষ্টতা প্রতিষ্ঠিত করাবে। ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। উপযোগবাদী মিল[৩৫] একারণে সর্বজনীন উপযোগিতা উৎপাদনের

লক্ষ্যে এমন সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার কথা বলেন যে নিয়ম সকল বুদ্ধিনিষ্ঠ ব্যক্তি অনুসরণ করে নৈতিকতায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মের উপযোগিতাকেই একমাত্র নৈতিক কর্মের লক্ষ্য বলে নিরূপণ করবেন। সর্বাধিক ব্যক্তির সুখ অন্বেষণ করাকেই কর্তব্য বলে বিবেচনা করবেন। এভাবেই তিনি একটি উদ্দেশ্যবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন--যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমাদের চালিত করবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যটি ব্যক্তির আবেগ বা প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবেই নির্ণীত হবে, কারণ ব্যক্তির লক্ষ্য হবে সর্বাধিক ব্যক্তির উপযোগিতা উৎপাদন যা তাকে নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করতেও প্ররোচিত করতে পারে। অর্থাৎ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হবেন পরের সুখ অন্বেষণে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে বলা যায় উপযোগিতাবাদীদের এ দাবিটি প্রাসঙ্গিক হয় এবং কার্যকরী করা সম্ভব হয় তখনই যদি অপরের সঙ্গে ব্যক্তি মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এই বন্ধন ব্যতীত অপরের সুখ অন্বেষণ করতে ব্যক্তি উদ্যত হবেন কেন? অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ , মায়া , মমতা, সহমর্মিতা না থাকলে অপরের সুখ অন্বেষণ করা যায় না। অপরের সুখবিধানের জন্য অপর ব্যক্তিকে জানা এবং তার মানসিক পরিস্থিতিগত অবস্থাকে অনুধাবন করার প্রয়োজন হয়। তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন। ব্যক্তির মধ্যে যদি সমমর্মিতাবোধ থাকে তবেই সে অপরের জন্য উপযোগিতা উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা যদি ব্যক্তির মনে উপস্থিত থাকে তবেই সে নিয়ম অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তি তখনই অপরের সুখকে নিজের সুখ বলে মনে করে আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকে যদি পরস্পরের সাথে মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। নিয়ম পালন যদি কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক বিষয় হয় তবে ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করলেও তার মানসিক অসন্তুষ্টি তাকে ঐ কর্ম পালনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখে। নিয়ম তার নিকট বাধ্যতাবোধে পরিণত হয়। ফলে যে ব্যক্তি সংযমী চরিত্রের কারণে মনের আবেগকে উপেক্ষা করে নীতি অনুসরণ করছে সে প্রকৃতপক্ষে নৈতিক ব্যক্তি বলে গণ্য হতে পারে না। তার কর্মের উদ্দেশ্যটি তার মনের দ্বারা সমর্থিত নয় বলে ঐ কর্ম তাকে মানসিক প্রশান্তি দান করতে পারেনি। তাহলে বলা যায়, কর্মকর্তার উদ্দেশ্য যদি অনুভূতিহীন, আবেগশূণ্য হয় তবে তা ব্যক্তির সৎ চরিত্রের প্রকাশ বলে গণ্য হবে না। সর্বজনীন সুখ লাভের প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হওয়ার প্রকাশই হল পরের মঙ্গলের জন্য কর্ম পালন করা। এই যুক্তিতে বলা যায় উপযোগিতাবাদ যে অনুভূতিশূণ্য , আবেগশূণ্য নৈতিক নিয়ম সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই নিয়মের পূর্বশর্ত হল অপরের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমত্ববোধ এই মনোভাব ভিন্ন আত্মস্বার্থ ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

কান্টের[৩৬] কর্তব্যবাদী নীতিতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় কান্ট নৈতিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিশুদ্ধ নিয়মকে একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির আবেগ, প্রবণতা, ইচ্ছা, প্রয়োজন এগুলিকে তিনি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। তিনি ব্যক্তির ব্যবহারিক বুদ্ধিকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে নৈতিকব্যক্তি সেই ব্যক্তিগত নীতির (maxim) দ্বারা কর্ম সম্পাদন করবেন যে নীতিকে সার্বিকতায় পর্যবসিত করা যায়। ব্যক্তি এমন কর্ম সম্পাদন করবে যে কর্ম যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো পরিস্থিতিতে বৈধ বলে দাবি করবে। Care বা যত্নশীলতা জাতীয় আবেগ নৈতিকতার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ ব্যক্তিসাপেক্ষ সিদ্ধান্ত গঠন করা। কান্টের দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি অনুসারে কর্ম পালনের সামর্থ্য রয়েছে। কান্ট মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ সামর্থ্যকে প্রয়োগ করে সকলের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। সুতরাং আবেগ, ইচ্ছা, যত্নশীলতার ধারণা নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হবে। এমনকী কান্ট মনে করেন যে, আবেগ দ্বারা চালিত কর্ম যদি নীতি অনুসারী কর্মের সমতুল্যও হয় তা সত্ত্বেও তাকে নৈতিক কর্ম বলা যাবে না, যেহেতু সেটি কেবলমাত্র বুদ্ধি নিঃসৃত নীতির প্রতি কর্তব্যবোধে পালন করা হয়নি। ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রসূত নিয়মকে কর্তব্যবোধ থেকে অনুসরণ করলেই একমাত্র নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বুদ্ধি প্রসূত নিয়মকে সেকারণে শর্তহীন অনুজ্ঞা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত নীতিকে সর্বজনীনতার পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রয়াসী হবেন কেন? ব্যক্তি কেন উদ্যোগী হবেন সার্বিক ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে? যদি ব্যক্তির সঙ্গে অপর সকল ব্যক্তির হৃদয়ের যোগ না থাকে তাহলে এমন প্রচেষ্টার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হয়। ব্যক্তির চরম লক্ষ্য সংকীর্ণ স্বার্থবোধকে তখনই উপেক্ষা করবে যদি ব্যক্তির চারিত্রিক উত্তরণ ঘটে, ব্যক্তি যখন পরম মঙ্গল কামনা করে। নিজের সঙ্গে অপর ব্যক্তির মঙ্গলের ধারণা নৈতিকতায় পূর্বস্বীকৃতি রূপে স্বীকার করতে হয়। মহত্ব অর্জন করলে তবেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উপায়রূপে বিবেচনা না করে লক্ষ্য বলে মনে করবে। অবশ্য ঈশ্বরবাদীরা এক্ষেত্রে বলতে পারেন, ঈশ্বর আদিষ্ট হওয়ায় নৈতিকতায় ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য। কিন্তু রেনেসাঁ পরবর্তী আধুনিক যুগে নৈতিকতা ঈশ্বরের প্রভাব মুক্ত। আধুনিক যুগে ব্যক্তির বুদ্ধিকেই নৈতিক ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নির্দেশ অস্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তির বুদ্ধিই একমাত্র গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু ব্যক্তির বুদ্ধি কোনরূপ ফলাফল আশা না করে কর্তব্যকর্ম পালন করতে পারে না। ব্যক্তির কর্মের উদ্দেশ্যের মধ্যেই, তার লক্ষ্যের মধ্যেই তার ঐ ফললাভের আশা নিহিত থাকে। সর্বজনের প্রতি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এভাবেই সকল ব্যক্তির মঙ্গলসাধনের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে। যখন কান্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্যরূপে

গণ্য করেন তখন তার অর্থ হলো তিনি সমানাধিকারের কথা বলেন। প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সমমনোভাবাপন্ন না হলে অর্থাৎ প্রত্যেকের প্রতি সমান দায়িত্ব, সহমর্মিতা উপলব্ধি না করলে প্রত্যেকের প্রতি প্রকৃতপক্ষে ন্যায্য আচরণ করা সম্ভব হয় না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা থাকার জন্যই আমরা সকলের প্রতি সমান আচরণ করে থাকি। সকল ব্যক্তির প্রতি সমান মর্যাদা বা শ্রদ্ধা অনুভব করলে তবেই সকলের মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য হতে পারে। তাই ফিলিপা ফুট[৩৭] মনে করেন, কান্টের শর্তহীন অনুজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে শর্তযুক্ত অনুজ্ঞায় পর্যবসিত হয়। কেননা ব্যক্তির আশঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন পূরণে সক্ষম না হলে তা কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। 'উচিত' শব্দটি সর্বদাই আমাদের উন্নতির সাথে, মঙ্গলের সাথে উৎকর্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আবার একথাও বলতে হয় যে, ব্যক্তি যখন বাধ্যতামূলকভাবে তার মানসিক সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও নীতি অনুসরণ করে তখন সে নীতিনিষ্ট, কর্তব্যবাদী ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত হতে আগ্রহী হয় বলেই ঐরূপ কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু ব্যক্তি কেন নৈতিক ব্যক্তি হতে সচেষ্ট হয়? তার সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে এবং অবশ্যই লোকনিন্দা, লোকলজ্জা থেকে মুক্ত হতে। কর্তব্যপালন করার জন্যও তাহলে তার আবেগ তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

তাছাড়া কান্ট নীতির প্রতি শ্রদ্ধা বলতে কি বুঝেছেন তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কান্টের মতে শ্রদ্ধার বিষয় হল একটি নৈর্ব্যক্তিক নীতি---যে নীতি অনুসারে আমাদের বিশেষ বিশেষ কর্তব্যকর্ম বা আচরণ চালিত হয়। এখানে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা কোনভাবেই ভালোবাসা বা মানসিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। কেননা নীতির সার্বিকতা ব্যক্তিসাপেক্ষতা মুক্ত, বুদ্ধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ফলে নীতি বলতে তিনি আকারসর্বস্ব বিমূর্ততাকে বুঝিয়েছেন। এই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করে যে ইচ্ছা কান্ট তাকেই সদিচ্ছা বলেছেন। ব্যক্তির ইচ্ছা সৎ হবে তখনই যখন তার ইচ্ছা সার্বিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছা নীতি অনুসারে ক্রিয়া করবে। এখন ঐ নীতিটি যেহেতু ব্যক্তির স্বনির্ধারিত, ইচ্ছাপ্রসূত এবং অন্য কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যক্তির উপর বলপূর্বক প্রযোজ্য হয় না, তাই ব্যক্তির সদিচ্ছাকেই নীতি বলে গণ্য করা যায়। কারণ সদিচ্ছা হলো সার্বিক নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে কর্মপ্রয়াসের ইচ্ছা। অর্থাৎ কান্ট বলেন , যখন ব্যক্তিকর্তা নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বলে স্বীকার করছে তখন তার শুভ কর্মপ্রয়াসের ইচ্ছাই নীতি নির্ধারণ করছে। এখানে কান্ট দুটি জগতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন – বুদ্ধিবৃত্তির জগত এবং অভিজ্ঞতার জগত। কান্ট ব্যক্তিকর্তাকে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিবৃত্তির জগতের সদস্য বলে অভিহিত করছেন। ফলে ব্যক্তি যখন বুদ্ধিবৃত্তির জগতের সদস্যরূপে ইচ্ছাকে সার্বিক নীতির পর্যায়ে উন্নীত করছে তখন বলতে হয় ইচ্ছাই নীতিতে পরিণত হয়। ঐ

সার্বিক নীতিটি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির ইচ্ছা, যে ইচ্ছা বুদ্ধিসঞ্জাত ইচ্ছা। ফলে নীতির প্রতি শ্রদ্ধা মূলত ব্যক্তির বুদ্ধিজাত ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাকেই বুঝতে হবে। ফলে শ্রদ্ধা কেবলমাত্র বিমূর্ত নীতির প্রতি নয়, ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিও, যে ইচ্ছাকে ব্যক্তি নীতির পর্যায়ে উন্নীত করে কর্মে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। এইভাবে ব্যক্তির ইচ্ছাটি আমাদের শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে ওঠে। ফলে কান্টের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে নিজের ইচ্ছার উপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে। এভাবেই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা বলতে ভেলেম্যান[৩৮] বুঝেছেন প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাকেই। সুতরাং নীতির প্রতি শ্রদ্ধা হল ব্যক্তির নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা, আস্থা জ্ঞাপন করা সম্ভব হবে যদি ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসী হয়। সে যদি নিজের কর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়। তার নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে। সুতরাং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে নিজের মনকে, মানসিক গঠনকে, তার নীতিবোধকে জানতে হবে। নৈতিকতাকে মন বা চরিত্রকে আলোচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেই কারণে সদিচ্ছার অধিকারী ব্যক্তির কর্তব্যকর্মের প্রতি মানসিক সমর্থন থাকা জরুরী। চরিত্রবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ঐ নীতিটিকে নিজের জন্য আদর্শরূপে স্বীকার করেন। ব্যক্তির চারিত্রিক দৃঢ়তা, তার আদর্শ অনুসরণের অনুকূল মনোভাব, তার বিচক্ষণতা উপস্থিত না থাকলে ব্যক্তির সদিচ্ছা কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারে না। কেননা এরূপ ব্যক্তির প্রবণতাগুলি বুদ্ধির বিরোধিতা করে না। আবেগ বুদ্ধির উপস্থিতিকে স্বীকার করে বুদ্ধির সাথে সমান্তরালভাবে ক্রিয়া করে। এ কারণে সদ্‌গুণের সমর্থক নীতিদার্শনিকগণ ইচ্ছার উৎস যে চরিত্র সেই চরিত্রকেই নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

বুদ্ধির বিরোধিতা করে না বলেই বলা যায়, নৈতিক আবেগ যা আমাদের কর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে তা সকল প্রকার সংকীর্ণতামুক্ত। সদ্‌চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি যেহেতু দৃঢ়, স্থির, মানসিক অবস্থার অধিকারী, তাঁর মধ্যে প্রবণতারূপে সকল গুণই নৈর্ব্যক্তিক। নৈতিক আবেগ ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিনিরপেক্ষতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থকে উপেক্ষা করে সকলের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হলেও ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক বা নৈতিক আবেগ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন এবং তা সম্ভব হয় চরিত্রটি উন্নত করতে ব্যক্তি সক্ষম হলে। সেকারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিতাত্ত্বিকেরা আবেগকে বুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানসিক বৃত্তি বলে মনে করেননি, বরং তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আবেগ ব্যক্তিকে সমাজস্বীকৃত পথ অনুসরণ করে নৈতিক দায়িত্ব পূর্ণ করতে এবং নৈতিক দায়িত্ববান ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হতে সাহায্য করে। এ আবেগ কখনই অন্ধ আবেগ হতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আবেগ আমাদের নৈতিক জীবনকে সৌন্দর্যময় করে তুলতে যেমন সাহায্য করে তেমনি ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। আবেগ প্রধানত তিনভাবে আমাদের

নৈতিক জীবনের সহায়ক হয়। প্রথমত কোনও কোনও আবেগ বিষয়বস্তুরূপে চরিত্রে উপস্থিত থেকে মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদনের সহায়ক হয়। যেমন-—ভালোবাসা, সমমর্মিতা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত কতকগুলি আবেগ আমাদের অন্যায় কর্ম সম্পাদন করা থেকে আমাদের সংযত রাখতে সহায়তা করে। যেমন—লজ্জা, ঘৃণা ইত্যাদি। আবার কোনও কোনও আবেগ সিদ্ধান্তের ফলরূপে আমাদের নৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণ করে। যেমন শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অনুতাপ ইত্যাদি। এই আবেগগুলি আমাদের চরিত্রে উপস্থিত থেকে সমাজের মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদনের সহায়ক হয়। একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর আবেগের সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবহারের দ্বারা সঠিক আচরণ করতে পারে।

আবেগ বা অনুভূতির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় নৈতিক সিদ্ধান্তের বস্তুনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। দার্শনিকেরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁরা কেবলমাত্র আবেগের উপর নৈতিকতার ভিত স্থাপন করেননি। যে সকল দার্শনিক আবেগের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা আবেগকে নিছক ব্যক্তিসাপেক্ষতার প্রকাশ বলে মনে করেননি। হিউম[৩৯] যেমন আবেগকে সহমর্মিতাবোধের মানদণ্ডে মূল্যায়ন করে নিতে চেয়েছিলেন, সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যকেই অনুমোদন করেছিলেন, তেমনি সমসাময়িককালের যে সকল দার্শনিকেরা কর্মকেন্দ্রিক নৈতিক আলোচনার পরিবর্তে চরিত্রকে নৈতিকতার কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন তাঁরা আবেগকে নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। তাঁরা সকলেই আমদের অনুভূতিগুলির মধ্যে কোনটি নৈতিক আবেগ বলে পরিগণিত হবে সেটিকে প্রজ্ঞা দ্বারা বিচার করতে চেয়েছেন। এমন মনোভাবের উৎস হল এ্যারিস্টটলের-এর Golden Mean-এর[৪০] ধারণা। তাঁর মতে ব্যক্তির অসংযত আবেগ নৈতিক আবেগরূপে পরিগণিত হতে পারে না। আবেগ তখনই নৈতিক আবেগ অথবা সদ্‌গুণরূপে পরিগণিত হয় যখন আবেগের যথাযথ পরিমাণ আমদের মনে উপস্থিত থাকে এবং সঠিক সময়ে সঠিক আবেগটি প্রয়োগ করে আমরা সঠিক আচরণ করতে পারি। ব্যক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা সঠিক আবেগকে নির্বাচন করতে সক্ষম। এই যথাযথ আবেগই হল সদ্‌গুণ যা ব্যক্তির মনে প্রবণতারূপে বর্তমান থাকে। ব্যক্তি সঠিক পরিস্থিতিতে, সঠিক সময়ে কোন পরিমাণ আবেগের ব্যবহার যথাযথ হবে তা নির্ধারণ করবেন বা পছন্দ করবেন। কেননা আবেগের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ আমাদেরকে বিপথে চালিত করে, আবার আবেগের নূন্যতম প্রকাশও আমাদের সঠিক পথের দিশা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। ফলে তিনি অত্যধিক আবেগ এবং অত্যল্প আবেগ---উভয়ের কোনটিকেই নৈতিক বলে স্বীকার করেননি। আবেগের ন্যায্যতা বিচক্ষণতার দ্বারা পরীক্ষিত হলেই সেটি নৈতিক আবেগ বলে গৃহীত হয়। যে কারণেই অ্যারিস্টটল আবেগের মধ্যবর্তী পরিমাণের কথা উল্লেখ

করেছেন। সাহসের অভাব থাকলে ব্যক্তি যেমন ভীরুতার পরিচয় দেয় তেমনি আবার অত্যধিক সাহস প্রদর্শন ব্যক্তির হঠকারিতার পরিচয় দেয়। কোন আবেগটি, কোন পরিস্থিতিতে, কতটা পরিমাণে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন তা ব্যক্তি বিচক্ষণতা সহকারে পরিস্থিতি অনুসারে বিচার করে। তবে এই মধ্যবর্তী পরিমাণ কোনটি তা পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনশীল। যেমন, একজন সাধারণ মানুষের সাহসিকতা প্রদর্শনের মধ্যপন্থা নির্বাচন এবং একজন সৈনিকের সাহসিকতা প্রদর্শনের মধ্যপন্থা নির্বাচনের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। বিচক্ষণ ব্যক্তি সঠিক মাত্রার আবেগ প্রয়োগ করতে সক্ষম। সুতরাং পরিস্থিতি অনুযায়ী সৎ ব্যক্তির নির্বাচনের মাত্রাভেদ হয়। একেই অ্যারিস্টটল পরিস্থিতির 'merit'[৪১] বলেছেন। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন – তাঁর মতে "… the brave man feels and acts according to the merits of the case and in whatever way the rule directs."[৪২] সুতরাং সৎ চরিত্রের ব্যক্তি শুধুমাত্র আবেগ বা শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করেই নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাজেই, আমাদের আবেগগুলির সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক সময়ে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্যই হলো বিচক্ষণ, চরিত্রবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এমন মনে হতে পারে যে, ব্যক্তি যখন কোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সেই পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে বিচক্ষণতার দ্বারা মধ্যমপন্থা নির্বাচন করে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সুগভীর চিন্তা পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিষয়টি এরূপ নয়, অ্যারিস্টটলের মতে, ব্যক্তির মধ্যে সদ্‌গুণ প্রবণতারূপে বর্তমান থাকবে, যে কারণে কোন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তা 'সিদ্ধান্ত-পূর্ববর্তী চিন্তা'[৪৩] (choice-beforehand) নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদ্‌গুণ অর্জনের জন্য ব্যক্তির বুদ্ধি তাত্ত্বিকভাবে কার্যকর হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ব্যক্তি দ্রুত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পৃথকভাবে পর্যালোচনা, যুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তাই ব্যক্তি সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। ব্যক্তির সদ্‌গুণ হল ব্যক্তির সংযত আবেগ বা নৈতিক সদ্‌গুণ। নৈতিক সদ্‌গুণ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থিত থাকার কারণে ব্যক্তি দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। যেমন, কোন ব্যক্তিকে নদীতে নিমজ্জিত হতে দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। ব্যক্তি সেক্ষেত্রে ঐ পরিস্থিতিতে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ ব্যক্তির প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যেত। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি কোনরূপ

চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়, তাঁর চরিত্রে উপস্থিত সাহসিকতা, পরোপকারিতা, অপরের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদির কারণেই সে বিপদে অপরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফলে দেখা যায় ঐরূপ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণটি দ্রুত সংঘটিত হলেও এবং যুক্তিবিশ্লেষণের সচেতন উপস্থিতি না থাকলেও তাঁর ঐরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন নয়। ফলে এমন বলা সঙ্গত নয় যে দ্রুত সিদ্ধান্ত আবেগজাত কারণেই সংঘটিত হয় ফলে তা যুক্তিহীন। বরং বলা যায় আবেগ ও বুদ্ধি উভয়ের সহাবস্থানে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। আমরা যখন নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন বুদ্ধি এবং আবেগের অবস্থান দুটি মেরুতে অবস্থান করে না। উভয়ই আমাদের একই দিকে চালিত করে।[৪৪]

অ্যারিস্টটলের নৈতিক মতবাদকে সমর্থন জানিয়ে সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ, যেমন, বার্নাড উইলিয়াম, রবার্ট ওডি, সুসান সার্ক, মাইকেল স্মিথ মনে করেন, নৈতিক সিদ্ধান্তে বুদ্ধি ও আবেগ উভয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বুদ্ধি একাকী নৈতিক নিয়ম প্রয়োগের দ্বারা নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ নয়। এ সকল দার্শনিকেরা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির গুরুত্বকে অস্বীকার করতে রাজি নন। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তি পরিস্থিতির সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির নৈতিক চাহিদা এবং ব্যক্তিগত চাহিদার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমসাময়িককালের দার্শনিকেরা যুক্তি ও অনুভূতি উভয়কেই গুরুত্ব প্রদান করেন। যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করার অর্থ নৈতিক কর্মকর্তার অবশ্যই সঠিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বর্তমান। কোন বিষয়ে ন্যায্যতা বা যথার্থতার জ্ঞান নির্ভর করে ব্যক্তির ওই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বোধগম্যতা এবং নৈতিক যুক্তি প্রদানের সামর্থ্যের উপর। এসকল দার্শনিকেরা ব্যবহারিক যুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নৈতিক মনোভাবকে অস্বীকার করেন না। কেননা পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার ক্ষমতাই ব্যক্তির আদর্শমূলক সামর্থ্য বলা যেতে পারে। কর্মকর্তা সেই আদর্শকেই অনুসরণ করবেন যা তিনি ওই পরিস্থিতি বিচারের দ্বারা নিজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। যেহেতু কর্মকর্তা তার নিজ সিদ্ধান্তে স্বাধীন, সেহেতু ব্যক্তি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব বৌদ্ধিক চিন্তার দ্বারা উদ্দেশ্য নির্বাচন করবেন। নৈতিকযুক্তি এইভাবে স্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তকে চালিত করবে, ন্যায্য কর্মের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির স্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত কখনই ব্যক্তিসাপেক্ষ সিদ্ধান্তকে প্রতিপাদন করবে না। কারণ নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের এই বোধ বর্তমান যে, আমরা অন্যের ক্ষতি করব না, অপরের মঙ্গলের লক্ষ্যে বিশেষত সমাজের মঙ্গলের লক্ষ্যে নৈতিক কর্ম

সম্পাদিত হবে। নিজ ও অপর ব্যক্তিবর্গের চাহিদা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র নৈতিক যুক্তি প্রয়োগ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে নৈতিক যুক্তির সঙ্গে অপরাপর বিষয়ের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হবে না। ব্যক্তির নৈতিক সিদ্ধান্তে তার মানসিক সমর্থন না থাকায় নৈতিক সিদ্ধান্তের ঔচিত্যের ধারণা কেবলমাত্র নিয়ম পালনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু নৈতিকতার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ সংশোধন করা নয়। ব্যক্তির চারিত্রিক সংশোধন না হলে ব্যক্তির আচরণ স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে, দমনমূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। ব্যক্তির প্রবণতা, ইচ্ছা, আবেগগুলি যদি যথাযথ হয় তবে সেগুলি ব্যক্তির চরিত্রকে সঠিকভাবে গঠন করে। ফলে ঐ চরিত্র অনুযায়ী কৃতকর্ম অবশ্যম্ভাবীরূপে ভালো, ন্যায়সঙ্গত কর্ম বলে গণ্য হয়।

যদি আমরা কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির উপর নির্ভর করে সর্বজনীন সিদ্ধান্ত গঠনের কথা বলি তাহলে এমন কথা বলতে হয় যে, নৈতিক কর্তার সকল প্রকার যুক্তি প্রদানের সামর্থ্য বর্তমান থাকবে। দাবি করতে হয় যে, নৈতিক কর্মকর্তা হল সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বর্তমান এবং তিনি পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, কর্মকর্তার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা বর্তমান। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যায় যে, ব্যক্তির সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। কেননা পরিস্থিতি ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কোন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অপর ব্যক্তি প্রদত্ত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং অপরের উপর নির্ভর করেই ব্যক্তি পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন। ধরা যাক, কোন বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে অপর ব্যক্তি প্রদত্ত তথ্যাবলীর উপর। যদি সেই ব্যক্তি আমাকে প্রতারণা করে এবং যথার্থ তথ্যাবলীকে গোপন করে তাহলে আমার সিদ্ধান্ত সঠিক যুক্তির দ্বারা নির্ণীত হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং আমদের নৈতিক ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়। ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহারিক জীবনের সকল তথ্যকে অবগত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। অডিও[৪৫] মনে করেন যে, নৈতিকতায় আদর্শমূলক যুক্তি প্রয়োগ করার জন্য সকল বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কোন পরিস্থিতিতে সমস্ত কারণগুলিকে অবগত হতে সক্ষম হই না। কেবল পরিস্থিতিতে যে বিষয়গুলিকে জানতে সক্ষম হই তার সপক্ষে আমার যুক্তি থাকার জন্যই আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আদর্শমূলক যুক্তি সেকারণে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আমরা ব্যক্তির নৈতিক সিদ্ধান্তে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, তার অভিপ্রায়, ইচ্ছা ইত্যাদির জন্যই ব্যক্তিকে দায়ী করি। সুতরাং আমরা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণাবলিকেই পরীক্ষা করি, বাহ্যিক যুক্তিকে নয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি সমগ্র পরিস্থিতি ও ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। ব্যক্তির

ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলির দ্বারা কর্মের যথার্থতা যাচাই করাকে বার্নাড উইলিয়ামস্ অভ্যন্তরীণ যুক্তি[৪৬] বলেছেন।

উইলিয়ামস-এর মতে নৈতিকতায় নৈতিক প্রেষণা ব্যতীত ব্যক্তিনিরপেক্ষ আদর্শমূলক যুক্তি দ্বারা চালিত হলে ব্যক্তি কতগুলি বাহ্যিক যুক্তির দ্বারা চালিত হয়ে আপাত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করবে। ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভূতি, জীবনের লক্ষ্য, ইচ্ছা ইত্যাদি ব্যতিরেকেই নৈতিক কর্ম সম্পাদন করা হবে। কিন্তু কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার মানসিক বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে ব্যক্তির প্রেষণা ও যুক্তির মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা যাবে। ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা –এগুলি সব যুক্তিগ্রাহ্য ও যাচাইলব্ধ হবে। এই যাচাইলব্ধ প্রেষণাই তখন ব্যক্তির নিকট আদর্শরূপে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, ব্যক্তির সকল ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা বৌদ্ধিক নয়। আমাদের মিথ্যা বিশ্বাস সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু উইলিয়ামস-এর মতে, যুক্তি যদি আমাদের পছন্দের লক্ষ্যকে নির্বাচন না করে তাহলে সেই যুক্তিকে প্রেষণামূলক যুক্তি বলা সঙ্গত হবে না। আমাদের প্রেষণা গঠিত হয় যুক্তির দ্বারা যাচাই যোগ্য হয়ে। একেই তিনি "a sound deliberative process"[৪৭] বলেছেন। আমাদের সকল প্রেষণা যুক্তিযুক্ত ও যাচাইযোগ্য। সেই যুক্তিযুক্ত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা থেকে ব্যক্তি কর্ম সম্পাদন করবেন। সেই যুক্তিই তখন আদর্শমূলক যুক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আমাদের বিশ্বাস এমন হয় যে, তার সপক্ষে যথাযথ যুক্তি বর্তমান তাহলে সেই বিশ্বাস থেকেই নৈতিকভাবে বাধ্যতাবোধ অনুভব করি। এখানে বাধ্যতাবোধের অর্থ ব্যক্তিকে বলপূর্বক কোন বিষয়ে বাধ্য করা নয়। ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিজ প্রেষণা থেকে নৈতিক কর্মে বাধ্যতাবোধ অনুভব করবে। ফলে ব্যক্তির মনে বুদ্ধি ও আবেগের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নয়, বরং উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থিতিতে ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদনে উৎসাহী হবেন। এরূপ দ্বন্দ্বহীন মানসিক অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি তখনই হবেন যদি তিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হন। অর্থাৎ একমাত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই প্রেষণামূলক যুক্তি দ্বারা নৈতিক কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব বলে জোনাথান ড্যান্সি[৪৮] মনে করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির চরিত্র যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন হয় তবে ব্যক্তি তার নৈতিক বিশ্বাস, নৈতিক চাহিদা থেকে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হবেন। সদ্‌চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে সকল পারিপার্শ্বিক শর্তগুলিকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে। সেগুলিকে অনুভব করে এবং নিজের মানসপটে সমগ্র পরিস্থিতির একটা আকার চিত্রিত করে বুদ্ধির দ্বারা সেগুলিকে বিচার করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করে। বুদ্ধির এরূপ অবস্থানকে তিনি "reason holism"[৪৯] বলেছেন। ব্যক্তির মানসপটে পরিস্থিতির আকারকে তিনি "narrative or mental picture"[৫০] বলেছেন। অর্থাৎ

মানসপটের আকারের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে ব্যক্তি নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। ফলে ব্যক্তি যখন নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন তখন ঐ বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করবেন। তাঁর মতে, "The holist maintains that for the virtuous person, not only do considerations get their reason-giving force from their context, but furthermore, considerations only function as reasons in relation to one another within their particular context."[৫১] সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতি দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে, এরূপ প্রেষণামূলক যুক্তিই নৈতিকতায় গ্রাহ্য হতে পারে। এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই এরূপ যুক্তি দ্বারা চালিত হতে সক্ষম।

সিদ্ধান্তের ফলাফলরূপে আবেগ

আবেগ যে কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার আবেগ অনুভব করে। এই অনুভূতিই নৈতিক কর্মের অঙ্গ বলে বিবেচ্য হয়। আমরা শিশুকাল থেকে বাড়ির গুরুজনদের নিকট থেকে সামাজিকতার ধারণা লাভ করি। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, গুরুজনদের সম্মান করা, সৎ মনোভাব প্রকাশ করা ইত্যাদি। এই সামাজিকতা বোধের প্রভাবেই ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধ জাগ্রত হয়। কোন কর্ম যখন ন্যায্য বলে বিবেচিত হয় তখন আমাদের মনে একটি প্রীতিকর ভাব জেগে ওঠে। আবার একটি সম্পাদিত কর্ম যখন আমাদের নিকট অন্যায় বলে বিবেচিত হয় তখন আমাদের মনে একটি অপ্রীতিকর ভাব উপস্থিত হয়। ভালো, ন্যায্য কর্ম সম্পাদনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অপর ব্যক্তির জীবনে এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজে মঙ্গলজনক ফল উৎপন্ন হয়, ফলে কর্মকর্তার মনে আনন্দের অনুভব হয়। অপরের চোখে নৈতিক ব্যক্তিরূপে, নৈতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্যরূপে পরিগণিত হওয়ার কারণেও তার বিবেকবোধ তৃপ্ত হয়। তার ভালো কর্মের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির মনেও আনন্দানুভূতির সঞ্চার হয়। আবার বিপরীতপক্ষে, কোন ব্যক্তি অন্যায় কর্ম পালন করলে অপর ব্যক্তির মনে অপ্রীতিকর বোধ জাগ্রত হয়, কারণ ঐ কর্ম সমাজের পক্ষে এবং অন্য ব্যক্তির পক্ষে হানিকারক ফল উৎপন্ন করে। ফলে কর্মকর্তা নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য বলেও গণ্য হয় না। কারণ ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নৈতিক প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থ হই অর্থাৎ ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির কারণে চরিত্রবিরোধী কোন কর্ম পালনে বাধ্য হলো। তখন বিচার্য বিষয় হলো ব্যক্তির

মনোভাব। যে ব্যক্তি তার জন্য দুঃখিত, অনুতপ্ত, অনুশোচনা বোধ করে তাকে ভালো ব্যক্তি বলেই আমরা মনে করি। পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণে এ্যাগামেমনন[৫২] নিজের কন্যাকে রক্ষা করতে পারেননি, অর্থাৎ তিনি তাঁর একটি দায়িত্ব পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও তাঁর এই অবস্থার জন্য পরিস্থিতি দায়ী, তবুও এখানে এ্যাগামেমননকে নিন্দা করা হয়। এই নিন্দা তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য নয়, কারণ তিনি পরিস্থিতি বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে সঠিক যুক্তি প্রদান করেছেন। কিন্তু তাঁকে নিন্দা করা হয়েছে তাঁর সিদ্ধান্ত পরবর্তী মনোভাবের জন্য। তিনি কন্যাকে বিসর্জনের জন্য কোনভাবেই অনুতপ্ত, দুঃখিত হন না। ফলে তাঁর চরিত্রে দুঃখ, অনুতাপ ইত্যাদি যে সকল আবেগের প্রকাশ আশা করা হয়েছিল সেগুলির অভাব দেখেই সকলে তাঁকে নিন্দা করাই যথোচিত বলে মনে করে। কর্মের ফল যদি আশানুরূপ না হয় তবে ব্যক্তি কতটা বিচলিত বোধ করে তাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সুতরাং চরিত্রে আবেগের উপস্থিতি এবং ব্যবহারে তার প্রকাশ অত্যন্ত আবশ্যক। নুসবাম-এর মতে, অনুশোচনা, অনুতাপ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা –এগুলি নৈতিক অনুভূতি বা আবেগ, যেগুলি সমাজকে শান্তিপূর্ণ, পূর্নাংগ সমাজে পরিণত করতে সহায়তা করে। এই সকল আবেগের সামর্থ্যের অভাব থাকার অর্থ হলো অপর ব্যক্তির নৈতিক ভাবনাগুলিকে অনুধাবন করার অক্ষমতা, যার জন্য নৈতিক ভাব বিনিময় অসম্ভব হয়। এই ভাববন্ধনের জন্য প্রয়োজন আবেগের মেলবন্ধন। নৈতিক আবেগ যথা শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা এগুলি আমাদের চরিত্রে উপস্থিত থাকা এবং প্রয়োজন অনুসারে তা আমাদের আচরণে প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আবেগ আমাদের নৈতিক জীবন যাপনের সহায়ক। আবেগ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে সাহায্য করে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো এই সম্পর্কগুলির প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা। এই কর্তব্য পালন করার জন্য আবেগের উপস্থিতি জরুরী। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে। এ্যান্তিগোনে[৫৩] নাটকে রাজা ক্রেয়ন ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিকে অস্বীকার করে তার রাজধর্ম পালনকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবেগকে বিসর্জন দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। দেশকে রক্ষা করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। ফলে দেশদ্রোহিতা করার শাস্তিস্বরূপ তিনি পলিনিকাস-এর মৃতদেহকে সৎকার না করার আদেশ দেন। তাঁর যুক্তি ছিল এজাতীয় শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকেও দেশদ্রোহিতার ন্যায় ঘৃণ্য অপরাধ থেকে প্রতিহত করা। পলিনিকাস-এর ভগিনী এ্যান্তিগোণে এমন শাস্তির বিরোধিতা করে। কারণ তাঁর (এ্যান্তিগোনের) নিকট মৃতদেহের সৎকার না করা মৃত ব্যক্তির প্রতি অসম্মান জ্ঞাপন এবং সেই অর্থে ঈশ্বরের নিকটও অপরাধ। সেই কারণে রাজার আদেশ থাকা সত্ত্বেও এ্যান্তিগোণে তাঁর সীমিত ক্ষমতা অনুসারে ভ্রাতার

সৎকারের প্রচেষ্টা করে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজা ক্রেয়ন রাজ আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে এ্যান্তিগোণেকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু এ্যান্তিগোনে কেবলমাত্র পলিনিকাসের ভগিনী নয়। তিনি রাজা ক্রেয়নের ভাবী পুত্রবধূ। সেই অর্থে ক্রেয়নের স্নেহভাজনও বটে। কিন্তু ক্রেয়ন পারিবারিক সম্পর্ককে কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করাকে কর্তব্যচ্যুত বলে মনে করেন। তাঁর নিকট কর্তব্য হল একমাত্র দেশ-মাতৃকাকে রক্ষা করা । এখন কেউ দাবি করতে পারেন, ক্রেয়ন কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে লক্ষ্য নির্ণয় করার জন্যই এবং ব্যক্তিগত আবেগকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরূপ মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হননি। তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন। সেই অর্থে বলা যায়, তিনি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছেন। যেহেতু তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি পলিনিকাসের মৃতদেহ সৎকারে প্রয়াসী হবেন তাকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদন্ডাদেশ দান করা হবে। তাই তিনি দ্বিধাহীনভাবে আন্তিগোনেকে হত্যা করার আদেশ দান করেন। তিনি এমন আদেশ দান করে গর্ব অনুভব করেন যে, তিনি রাজধর্ম পালন করেছেন, কোনরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণ করেননি। সাধারণ প্রজা ও ভাবী পুত্রবধূর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। অর্থাৎ এই অর্থে এ্যান্তিগোণে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন পক্ষপাতমূলক আচরণ করেননি। অর্থাৎ সার্বিকতা রক্ষায় তিনি সক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর এই সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ তাঁর আবেগহীন আচরণ আমাদের নিকট প্রশংসিত হয় না । তাঁর চরিত্রে যে জাতীয় আবেগ উপস্থিত থাকা উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি এ্যান্তিগোনেকে মৃত্যুদন্ডাদেশ ঘোষণার পরেও সেই জাতীয় আবেগের উপস্থিতি তাঁর আচরণে না থাকায় তাঁকে নিন্দা করা হয়। সুতরাং বুদ্ধি আমাদের নৈতিক দ্বন্দ্বের থেকে মুক্ত করলেও আবেগহীনতাকেও যথাযথ বলা যায় না। এখন মূল্যাবধারণ যদি আবেগের আবশ্যিক অঙ্গ হয় তবে তাকে কেবলমাত্র কর্ম সম্পাদনের প্রেষণারূপেই নয়, অন্ততঃপক্ষে কোনও কোনও আবেগকে সিদ্ধান্ত পরবর্তীরূপে সহায়ক বলেও গণ্য করা যাবে। আবার আবেগকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করার অর্থ হলো সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র নীতি অনুসরণের বাধ্যতাবোধ দ্বারা সীমিত হবে না। আবেগ মনের একটি স্তর বলে এমন অবধারণই গঠন করবে যা ঐ ব্যক্তির নিকট স্বীকৃত হবে। সুতরাং ব্যক্তির পরিস্থিতি, তার বিশ্বাস, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গঠিত হবে। একারণে সদ্‌গুণসম্পন্ন নীতিদার্শনিকদের মতে, ব্যক্তির চরম কাম্য বিষয় হল আনন্দময় অবস্থা লাভ করা। এর জন্য সদ্‌গুণ লাভ করা প্রয়োজন। সদ্‌চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির মানসিক অবস্থা আবেগ ও বুদ্ধির সাম্যাবস্থা। যেখানে কোন কর্মের নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন কর্তব্যবোধ, বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। বুদ্ধির ও আবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন করেই ব্যক্তি পরমমঙ্গলময় জীবন লাভ করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র

১। বানার্ড, উইলিয়মস, ২০১১

২। ঐ

৩। মারকোভিস্ট, জুলিয়া, ২০১৪, পৃ ৯

৪। জেমস, উইলিয়মস, ১৯৫০

৫। হিউম, ডেভিড, ১৯৭৮

৬। ঐ, পৃ ৪১৭

৭। ফ্রয়েড, এস, ১৯১৫

৮। সিয়াস, জেমস, ২০১৪

৯। ঐ, পৃ ৫৪২

১০। ঐ, পৃ ৫৪৩

১১। বস্টক, ডেভিড, ২০০০, পৃ ২৫

১২। প্রিঞ্জ, জেসী, ২০০৬

১৩। ঐ, পৃ ৩২

১৪। নুসবাম, মার্থা, সি, ২০০৬, পৃ ২৩

১৫। বস্টক, ডেভিড, ২০০০,পৃ ৩৮

১৬। নরম্যান, রিচার্ড, ১৯৯৮, পৃ ৫৪

১৭। ঐ

১৮। হিউম, ডেভিড, ২০০৭,পৃ ৩৬৫

১৯। ফ্রয়েড, এস, ১৯১৫

২০। সিজউইক, হেনরী, ১৯৪১, পৃ ২৪৪

২১। বস্টক, ডেভিড, ২০০০, পৃ ৩৯

২২। হেইডিট, জে, ২০০১

২৩। ব্লেয়ার, আর. জে, আর. ই. কোলেজ, এল. মুররে এবং ডি. জে. মিটচেল, ২০০১

২৪। হিউম, ডেভিড, ২০০৭, পৃ ৪১৫

২৫। ঐ, পৃ ৩৬৫

২৬। অক্সলে, জুলিন্না, সি, ২০১১, পৃ ১৮

২৭। হিউম, ডেভিড, ২০০৭

২৮। বোনার, জে, ১৯২৬, পৃ ৩৩৬

২৯। স্টকার, মাইকেল, ১৯৭৬

৩০। সোয়ানতন, খ্রিষ্টাইন, ২০০৩

৩১। ভেল্লেম্যান, ডেভিড, ১৯৯৯

৩২। বিবেকানন্দ, স্বামী, ১৯৬৪

৩৩। চৌধুরী, সুকোমল, ১৯৯৭

৩৪। বানার্ড, উইলিয়ামস, ১৯৯৭

৩৫। মিল, জন. স্টুয়ার্ট, ১৯৭৯

৩৬। কান্ট, ইমানুয়েল, ১৯৭৯

৩৭। ফুট, ফিলিপা, ১৯৭২

৩৮। ভেল্লেম্যান, ডেভিড, ১৯৯৯

৩৯। হিউম, ডেভিড, ২০০৭

৪০। বস্টক, ডেভিড, ২০০০, পৃ ৩৮

৪১। স্টার্ক, সুসান, ২০০১, পৃ ৪৫০

৪২। ঐ, পৃ ৪৫০

৪৩। বস্টক, ডেভিড, ২০০০,পৃ ৩৯

৪৪। ঐ, পৃ ৪৫

৪৫। অডি, রবার্ট, ২০১০

৪৬। উইলিয়মস, বানার্ড, ১৭৭৯

৪৭। ঐ, পৃ ২৭

৪৮। ড্যান্সি, জোনাথান, ২০০৬

৪৯। স্টার্ক, সুসান, ২০০১, পৃ ৪৪২

৫০। ঐ, পৃ ৪৪২

৫১। ঐ, পৃ ৪৪৩

৫২। নুসবাম, মার্থা. সি, ১৯৮৬, পৃ ৩২

৫৩। ঐ, পৃ ৫৭

সূত্রনির্দেশ

১। অক্সলে, জুলিন্না, সি, (২০১১), *দি মরাল ডাইমেনশানস অফ এ্যাম্পাথি,* প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, নিউ ইয়র্ক

২। অডি, রবার্ট, (২০১০), 'রিজিনস ফর এ্যাকশান্স', কোরুপস্কি, জন সম্পাদিত, *দি রুটলেজ কোম্পানীয়ন টু এথিক্স,* রুটলেজ, লণ্ডন

৩। উইলিয়মস, বানার্ড, , (২০১১), *এথিক্স এণ্ড দি লিমিটস অফ ফিলোজফি,* রুটলেজ, লণ্ডন

৪। উইলিয়ামস,বানার্ড, (১৯৯৭), 'মরালিটি, দি পিকিউলিয়র ইন্সটিটিউশন', ক্রিস্প, রজার এবং স্লট মাইকেল সম্পাদিত, *ভারচু এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

৫। উইলিয়মস, বানার্ড,(১৭৭৯), 'ইন্টারন্যাল এণ্ড এক্সটার্ন্যাল রিজনস', *স্টাডিস ইন ফিলোজফিক্যাল এণ্ড সোস্যাল সাইন্সেস,* কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, লণ্ডন

৬। কান্ট, ইমানুয়েল (১৯৭৯), *দি মরাল ল, গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দি মেটাফিজিক্স অফ মরালস,* (ট্রান্স), প্যাটন, এইচ, জে, বি, আই পাবলিকেশন, ইন্ডিয়ান এডিশান, নিউ দিল্লী

৭। চৌধুরী, সুকোমল, (১৯৯৭), *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা

৮। জেমস, উইলিয়মস, (১৯৫০), *দি প্রেন্সিপ্যালস অফ সাইকোলজি,* ভলিউম-এস ১২২, ডোভার, নিউ ইয়র্ক

৯। ড্যান্সি, জোনাথান, (২০০৬), *এথিক্স উইদাউট প্রিন্সিপ্যালস,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১০। নরম্যান, রিচার্ড, (১৯৯৮), *দি মরাল ফিলোজফার্স, এন ইনট্রোডাকশানস টু এথিক্স,* দ্বিতীয় এডিশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

১১। নুসবাম, মার্থা, সি, (২০০৬), *হাইডিং ফ্রম হিউম্যানিটি: ডিসগাস্ট, সেম এন্ড দি ল,* প্রিন্সিটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সিটন

১২। নুসবাম, মার্থা. সি, (১৯৮৬), *দি ফ্রাজাইলিটি অফ গুডনেস,* কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেম্ব্রিজ

১৩।প্রিঞ্জ, জেসী, (মার্চ, ২০০৬), 'দি ইমোশানাল বেসিস অফ মরাল জাজমেন্টস', *ফিলোজফিক্যাল এক্সপ্লোরেশান্স,* ভলিউম-৯, নং-১, পৃ ২৯-৪৩

১৪। ফুট, ফিলিপা, (জুলাই, ১৯৭২), 'মরালিটি এজ এ সিস্টেম অফ হাইপোথেটিক্যাল ইম্পারেটিভস', দি ফিলোজফিক্যাল রিভিউ, ভলিউম-৮১, নং-৩, পৃ ৩০৫-৩১৬

১৫। ফ্রয়েড, এস, (১৯১৫), *দি আনকনসিয়াস, দি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন অফ দি কমপ্লিট সাইকলোজিক্যাল ওয়ার্কস অফ সিগমণ্ড ফ্রয়েড,* (এস, ই), ভলিউম-১৪, জে, স্ট্রাচে অনূদিত এবং সম্পাদিত, (১৯৮১), হোগার্থ প্রেস, লণ্ডন

১৬। ফ্রয়েড, এস, (১৯১৫), *দি আনকনসিয়াস, দি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন অফ দি কমপ্লিট সাইক্লোজিক্যাল ওয়ার্কস অফ সিগমণ্ড ফ্রয়েড,* (এস, ই), ভলিউম-১৪, জে, স্ট্রাচে অনূদিত এবং সম্পাদিত, (১৯৮১), হোগার্থ প্রেস, লণ্ডন

১৭। বস্টক, ডেভিড, (২০০০), *এ্যারিস্টটল'স এথিক্স,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

১৮। বিবেকানন্দ, স্বামী, (১৯৬৪), *দি কম্পপ্লিট ওয়ার্কস,* ভলিউম -১, অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা

১৯। বোনার, জে, (জুলাই, ১৯২৬), 'দি থিয়োরী অফ মরাল সেন্টিমেন্টস বাই এডাম স্মিথ ১৯৫৯', *জার্নাল অফ ফিলোজফিক্যাল স্টাডিস,* ভলিউম-১, নং-৩, পৃ ৩৩৩-৩৫৩

২০। ব্লেয়ার, আর. জে, আর. ই. কোলেজ, এল. মুররে এবং ডি. জে. মিটচেল, (২০০১), 'এ সিলেকটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট ইন দি প্রসেসিং অফ স্যাড এণ্ড ফিয়ারফুল এক্সপ্রেশান্স ইন চিল্ড্রেন উইথ সাইকোপ্যাথিক টেন্ডেন্সিস', *জার্নাল অফ এ্যাবনরম্যাল চাইল্ড সাইকোলজি,* ভলিউম-২৯, পৃ ৪৯১-৪৯৮

২১। ভেল্লেম্যান, ডেভিড, (জানুয়ারী, ১৯৯৯), 'লাভ এজ আ মরাল ইমোশান', *এথিক্স,* ভলিউম-১০৯, নং-২, পৃ ৩৩৮-৩৭৪

২২। মারকোভিস্ট, জুলিয়া, (২০১৪), *মরাল রিজন,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক

২৩। মিল, জন. স্টুয়ার্ট, (১৯৭৯), *ইউটিলিটারিয়ানিজম,* সের, জি সম্পাদিত, ইন্ডিয়ানাপোলিস: হ্যাকেট পাবলিশিং কোম্পানী

২৪। স্টার্ক, সুসান, (সেপ্টেম্বর, ২০০১), 'ভারচু এন্ড ইমোশান', *নৌস,* ভলিউম-৩৫, পৃ ৪৪০-৪৫৫

২৫। সিয়াস, জেমস, (২০১৪), 'এথিক্যাল ইনটুইশানিজম এণ্ড দি ইমোশানস: টুওয়ার্ড এন এমপিরিক্যালি এডিকোয়েট মরাল সেন্স থিওরী', *দি জার্নাল অফ ভ্যালু ইনক্যয়ারী,* ভলিউম-৪৮, নং-৩, পৃ ৫৩৩-৫৪৯

২৬। সিজউইক, হেনরী, (১৯৪১), *দি মেথডস অফ এথিক্স,* ইণ্ডিয়ানাপোলিস, হ্যাকেট

২৭। সোয়ানতন, খ্রিষ্টাইন, (২০০৩), *ভারচু এথিক্স,* এ প্লুরালিসটিক ভিউ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

২৮। স্টকার, মাইকেল, (আগষ্ট, ১৯৭৬), 'দি সিজোফ্রেনিয়া অফ মডার্ণ এথিক্যাল থিয়োরীস', *দি জার্নাল অফ ফিলোজফি,* ভলিউম-৭৩, নং-১৪, পৃ ৪৫৩-৪৬৬

২৯। হিউম, ডেভিড, (১৯৭৮), *এ ট্রিটিজ অফ হিউম্যান নেচার,* পি, এইচ, নিউটেক অনূদিত, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড

৩০। হিউম, ডেভিড, (২০০৭), *এ ট্রিটিজ অফ হিউম্যান নেচার,* নরটন, ডেভিড. ফেট এবং নরটন. মেরী সম্পাদিত, ক্লেরেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড

৩১। হেইডিট, জে, (২০০১), 'দি ইমোশানাল ডগ এণ্ড ইটস র‍্যাশেন্যাল টেইলঃ এ সোস্যাল ইন্সটিটিউশানিস্ট এ্যাপ্রোজ টু মরাল জাজমেন্ট' *সাইকোলজিক্যাল রিভিউ,* নং-১০৮, পৃ ৮১৪-৮৩৪

সিদ্ধান্ত

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আবেগকে নৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কান্ট মনে করেছিলেন, ইচ্ছা বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত হলে এবং নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত নীতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হলে তবেই তাকে নৈতিক কর্ম পালনের উপযুক্ত এবং স্বতঃমূল্যবান বলা যায়। এরূপ ইচ্ছাকে তিনি সদিচ্ছা বলেছেন। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি যে ইচ্ছাকে ব্যবহার করার কথা বলেছেন সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ বুদ্ধিচালিত এবং আবেগনিরপেক্ষ। তিনি অবশ্য নৈতিক কর্ম পালনের ফলে উৎপন্ন মনের আনন্দকে ক্ষতিকারক বলেননি। এমনকি কর্মকর্তার নিজের সুখকে বজায় রাখার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন, যেহেতু তিনি মনে করেছেন সুখী ব্যক্তিই অপরের সুখ উৎপাদনে সমর্থ। তিনি কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইচ্ছাকে বুদ্ধি দ্বারা এবং কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন। নীতির ব্যবহার যেহেতু তাঁর দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে তাই সেই বুদ্ধিনিঃসৃত নৈর্ব্যক্তিক নীতিকে স্বীকৃতি দানের জন্য এবং নিঃশর্তভাবে অনুসরণের জন্য তিনি ইচ্ছাকেও বুদ্ধির সমতুল্য করে তুলতে চেয়েছেন। আবার সমসাময়িককালের দার্শনিক জন রলস এবং অন্যান্যরা বুদ্ধির সাথে সাথে ভয়, লজ্জা, অপরাধবোধ ইত্যাদি আবেগকে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তির চরিত্রে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বলে মনে করলেও বুদ্ধির নির্দেশ পালনের সহায়করূপে এই আবেগগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, দুভাবে আবেগ আমাদের সাহায্য করে। লোকলজ্জার কারণে আমরা অন্যায় কর্ম পালন থেকে বিরত থাকি। আবার সহযোগিতা, সহমর্মিতা উপস্থিত থাকে বলে আমরা ভালো কর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ হই। এই সকল দার্শনিকেরাও কর্মে প্রণোদিত করার ক্ষেত্রেই কেবল আবেগের ব্যবহারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাহলে এই সকল দার্শনিকেরা দুটি বিষয়কে স্বীকার করেছেন বলা যায়। প্রথমত পরিস্থিতির ভূমিকা থাকলেও ব্যক্তির উদ্দেশ্যই ব্যক্তির কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ ব্যক্তির কর্মটি নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির কর্মটি ব্যক্তির উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল দার্শনিকেরা নীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে নীতিগুলিকেও সর্বজনীন ও আবশ্যিক বলেই মনে করেছেন। তাই তাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্বকে বিশেষ স্বীকার করেননি। কান্ট এমন সর্বজনীন নিয়ম অনুসরণ করতে বলেছেন যা সকলের ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য। রলস সমাজের প্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণের কথা বললেও নির্ধারিত নীতিটি ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে পারে না বলে মনে করেছেন। তিনিও মনে করেছেন যে, নীতিটি ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীরূপেই অনুসরণ করবে, যেহেতু নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্মতি প্রদান করেছে।

এর থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিঃসৃত হয় তা হলো কোন কর্ম সম্পাদনের অর্থাৎ দৈহিক কর্মের পূর্বে থাকে একটি মানসিক কর্ম। আমরা যে কর্ম পালন করি তার কারণ হলো মানসিক কর্ম। ব্যক্তি কর্মটি পালন করার পূর্বে একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং এই উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে। কর্মটি সে কারণেই শর্তসাপেক্ষ। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের যদি স্বাধীনতা থাকে তবে সে অবশ্যই কর্মপালনে সক্ষম হবে। যেহেতু কর্মটি সিদ্ধান্ত নির্ভর। এই সকল দার্শনিকেরা নৈতিক ভাগ্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার না করার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর, অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের প্রতি এবং সেটি অনুসরণের সদিচ্ছার উপস্থিতিকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন। তাহলে নৈতিক কর্ম উদ্দেশ্যকে (intention) বিচার করে এবং ব্যক্তির ইচ্ছার প্রকৃতি বিচার করে। অর্থাৎ ইচ্ছাটি উদ্দেশ্যমুখী না উদ্দেশ্যবিরোধী তা নির্ণয় করে। তাহলে আমরা যদি মানুষের নৈতিক কর্মের কারণ অনুসন্ধান করি তবে লক্ষ্য করব এর দুটি কারণ বর্তমান। একটি হলো এর নিমিত্ত কারণ, যা কর্মটিকে সমাধা করছে। আমরা জানি ঘটের নিমিত্ত কারণ হলো কুম্ভকার, যার প্রযত্নে ঘট নির্দিষ্ট আকার লাভ করে। আর গঠনগত কারণ হলো ঘটের নির্দিষ্ট আকার। অর্থাৎ ঐটি যে ঘটই হবে, কলসি বা কুঁজো নয়—তা পূর্বে নির্ধারণ করলে তবেই কুম্ভকার সেই অনুযায়ী সৃষ্টি করবে। নৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা হলো নিমিত্ত কারণ, যেহেতু এটিই সিদ্ধান্তটিকে কার্যকর করে, উদ্দেশ্যটিকে বাস্তবায়িত করে। অপরদিকে বুদ্ধি হলো গঠনগত কারণ —যা কর্মের লক্ষ্যটি নির্ধারণ করে। বুদ্ধি লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং আমাদের ইচ্ছা সেটি অর্জন করতে উদ্যমী হয়। নীতিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, আমাদের ইচ্ছা কর্মটি পালনে সমর্থ হয়, যেহেতু তার পূর্বে বুদ্ধি লক্ষ্যটি কাম্য বলে বিবেচনা করে। ইচ্ছার ক্রিয়া সম্ভবই নয় যতক্ষণ বুদ্ধি ইচ্ছার বিষয়টি নির্ণয় না করবে। কারণ 'আমি ইচ্ছা করি' বা 'আমি কামনা করি' কথাটি অর্থহীন হয়ে যাবে যদি কামনার বিষয়টি নির্দিষ্ট না হয়। বুদ্ধি প্রথমে আমাদের লক্ষ্য নির্ণয় করে এবং সেটিই লাভ করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির ভূমিকা লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং ইচ্ছার দায়িত্ব সেই লক্ষ্যটি পূরণে সচেষ্ট হওয়া। এভাবেই তারা বুদ্ধিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এবং ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কর্মপালনের শক্তি বা প্রেষণারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন ইচ্ছা যদি সৎ, নৈতিক ইচ্ছা হয় তবে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ব্যতীত সেটি বুদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যটি অনুসরণ করে। কিন্তু যদি সেই ইচ্ছা ভাবাবেগের আধিক্যে চালিত হয় তবে অবশ্যই সেটি বুদ্ধির নির্দেশ পালন করে না। ব্যক্তির বিচক্ষণতা, বিশ্লেষণী শক্তি যদিও তার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা নির্ণয় করে, কিন্তু তার আবেগ ইচ্ছাকে বুদ্ধির বিরোধিতা করতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নৈতিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করে এবং অনৈতিক ব্যক্তি বলে গণ্য হয়। কিন্তু ব্যক্তির চরিত্রে যদি লজ্জা, ভয়, সহযোগিতা ইত্যাদি যথাযথ পরিমাণে উপস্থিত থাকে তবে সেই

আবেগগুলি ব্যক্তির ইচ্ছাকে সঠিক লক্ষ্য লাভে প্ররোচিত করে। এভাবেই দার্শনিকেরা প্রেষণাশক্তিরূপে আবেগকে স্বীকার করলেও লক্ষ্য নির্বাচনে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে উপেক্ষা করেছেন এবং বুদ্ধিতেই সম্পূর্ণভাবে আস্থা রেখেছেন। ইচ্ছা এবং আবেগের উপস্থিতি আবশ্যক কেবলমাত্র বুদ্ধিকর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য, লক্ষ্যটি বাস্তবায়িত করার জন্য। সুতরাং নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং ইচ্ছা যৌথভাবে ক্রিয়া করে। কিন্তু কারণশক্তিরূপে উভয়ই ক্রিয়া করলেও তাদের কার্যকারিতার প্রকৃতি ভিন্ন। লক্ষ্য নির্বাচন ও লক্ষ্য লাভের কারণ দুটি ভিন্ন। সুতরাং দেখা গেল, এই সকল দার্শনিকেরা আবেগের ভূমিকাকে নৈতিক ক্ষেত্রে স্বীকার করলেও কেবলমাত্র কর্ম সম্পাদনে প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে আবেগের উপস্থিতি প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। এমনকি তাঁরা কর্মের ফল অনুযায়ী আবেগ প্রদর্শনকেও যুক্তিযুক্ত ও কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু তাঁরা কর্ম সম্পাদনের পূর্ববর্তী স্তরটিতে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেগকে ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা আবেগের ব্যবহারকে সিদ্ধান্তের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য ক্ষতিকারক বলেই মনে করেছেন।

দার্শনিকেরা আবেগকে ব্যক্তির কর্মপালনের ইচ্ছাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মঙ্গলজনক বললেও সেই আবেগের পরিমাণকে সংযত রাখার কথা বলেছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, আবেগ যদি অত্যধিক মাত্রায় ব্যক্তি মনে উপস্থিত থাকে তবে তা বুদ্ধির ক্রিয়াকে ব্যহত করবে। ফলে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ায় ব্যক্তির কর্মকে স্বাধীন কর্ম বলা যাবে না। অত্যধিক ভয়ে ভীত ব্যক্তি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হবে, যেহেতু তার বিচার ক্ষমতা ব্যবহার করতেই সে অপারগ হবে। ভালোবাসায় অন্ধ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না, যেহেতু ব্যক্তির আবেগ তাকে সকল বিকল্পগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে বাধা দান করবে। তার পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ তাকে বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহারে বাধা দান করবে ফলে ব্যক্তির কর্মকে আর নৈতিক কর্ম বলা যাবে না, যেহেতু তার কর্মের সিদ্ধান্ত বিচারপ্রসূত হবে না। ব্যক্তির আবেগ যদি বিচার বিবেচনার পূর্বে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধির ক্রিয়াকে প্রতিহত করে তবে ব্যক্তির কর্মটিকে আর প্রকৃত অর্থে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলা সম্ভব হবে না। কারণ সেখানে স্বাধীনতাই থাকে না। কিন্তু যদি আবেগ পরিমিত পরিমাণে উপস্থিত থাকে এবং সেটি সিদ্ধান্ত বিবেচনার পরে উপস্থিত হয় তবে বিচারবুদ্ধির ক্রিয়া কোনভাবেই তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এক্ষেত্রে আবেগের উপস্থিতি স্বাভাবিক, আবশ্যক এবং মঙ্গলজনক বলে গ্রাহ্য হয়। ভয় যদি সঠিক পরিমাণে মনে উপস্থিত থাকে তবে সেটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে না বলে আমাদের বুদ্ধি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা আবেগের দ্বারা ব্যহত হয় না, যেহেতু বুদ্ধি ব্যবহার কর্তারূপে

সেটির নিয়ন্ত্রক হয়। ফলে আবেগ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে না। এই কারণেই কান্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণেই ব্যক্তির নিকট স্বাধীন নির্বাচনের মূল্য সুখলাভের জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক। কারণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থপূরণের জন্য, আত্ম-প্রেমে তাড়িত হয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রযোজ্য ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তিরূপে আবেগের উপস্থিতিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই আবেগের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিতে হবে। নৈতিক কর্ম যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে তার অন্যতম হলো তাত্ত্বিক জ্ঞান, যা ব্যক্তির নৈতিক অভিমত তৈরী করে। এই জ্ঞান হলো নৈতিক নিয়মের জ্ঞান, তার জীবনবোধ। কারণ জ্ঞান না থাকলে বিচারবিবেচনা সম্ভব নয়। ফলে বিচার করার পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। নৈতিক জ্ঞান যে আমরা সর্বদা সচেতনভাবে অর্জন করি তা কিন্তু নয়। জগতের প্রতিটি ব্যক্তি নীতিবিদ্যা পাঠ করে তার নিয়মগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, সেগুলির সর্বজনীনতা রক্ষা করার লক্ষ্যে কর্মের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করে না। অধিকাংশ ব্যক্তিই বস্তুগত নৈতিক জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়েই প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিক কর্ম পালন করে। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও ব্যক্তি হয়ত ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তি ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়, যেহেতু সে শিশু বয়স থেকে ঐ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা লাভ করে। আমরা ছোটবেলা থেকেই আমাদের অভিভাবক, শিক্ষক, গুরুজনদের থেকে নৈতিক কর্মের শিক্ষা লাভ করি। ক্রমাগত অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা অসচেতনভাবেই কতকগুলি অভ্যাস গঠন করি। এই অন্ধ অনুসরণের দ্বারাই জীবনের প্রথমে আমরা নৈতিকতার জ্ঞান অর্জন করি কোনরূপ সচেতন প্রয়াস ব্যতীতই। পুরস্কার বা প্রশংসা লাভের জন্যই আমরা নিজের মিষ্টি অন্য ভাই বোনের সাথে ভাগ করি, আমরা সহপাঠীর প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করি না, সহযোগিতামূলক আচরণ করি। এই সময়ে কিন্তু আমাদের সম্পাদিত কর্ম কোন সচেতন নির্বাচনের ফল হয় না। এমন নয় যে, আমরা আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে কোন একটি বিকল্পকে সুবিধাজনক বা মঙ্গলজনক বলে নির্বাচন করি। আমরা আমাদের জ্ঞানকে তখনই প্রয়োগ করতে সক্ষম হই যখন সেটি আমার হৃদয়ঙ্গম হয়, আমি সেটি আত্মস্থ করতে সমর্থ হই।

সুতরাং অভ্যাস আমাদের নৈতিকবোধকে তীক্ষ্ণ করে এবং নৈতিক জ্ঞানের উন্নত প্রয়োগে সহায়তা করে। সে কারণেই নৈতিক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো মন্দ অভ্যাসগুলিকে উৎপাটন করা এবং ভালো অভ্যাস কর্ষণ করা। যখন ব্যক্তি অভ্যাসকে আত্মস্থ করে তখন কিন্তু এটি আর অসেচতন কোন অন্ধ অনুকরণ নয়।

সেক্ষেত্রে নৈতিক অভ্যাস আমাদের চরিত্রগত গুণ বলেই গণ্য হয় যার একটি নিজস্ব চালিকা শক্তি থাকে। আমাদের অভ্যাসের কারণেই আমরা দ্রুততার সাথে, সঠিকভাবে, আনন্দের সাথে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করি। নৈতিক কর্ম পালন ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হলে ব্যক্তির আবেগ কোনভাবেই ঐ কর্মের বিরোধিতা করে না। ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কর্মটি চয়ন করে এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা পালন করে। আনন্দের সাথে কর্ম পালন করা তখনই সম্ভব হয় যখন ব্যক্তির আবেগ তৃপ্ত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, নৈতিক ব্যক্তির সৎ অভ্যাস আবেগ ও বুদ্ধির সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে সমর্থ। তাহলে অভ্যাসজাত যে নৈতিকবোধ ব্যক্তির নৈতিক জ্ঞান গঠন করে তা কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত নয়, সঠিক আবেগও নৈতিক জ্ঞান গঠনের একটি উপাদান। কারণ যখন আমরা এই নৈতিক অভ্যাসগুলি গঠন করি তখন কিন্তু কোন বিশেষ নীতি অনুসরণের দ্বারা বিশেষ কর্ম সমাধা করার উপদেশ আমাদের দেওয়া হয় না। আমরা শিশুদের উদারতা, সহযোগিতা, সাহস, সহানুভূতির মনোভাব গঠনের উপর গুরুত্ব দান করি। কারণ আমরা জানি সৎ অভ্যাসের দ্বারা তার এ জাতীয় মনোভাব গঠিত হলে সে যথাযথ নৈতিক নিয়ম অনুসারে কর্ম পালনে সক্ষম হবে। বলা যায় এমন আবেগগুলি চরিত্রের উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য ভালো বলে মনে করায় আমরা এগুলি অর্জনকে আবশ্যক বলে মনে করি। আবার আমাদের কর্মের মধ্যেও এই আবেগগুলির প্রতিফলন দেখতে চাই। এই আবেগগুলি চরিত্রে থাকলে এবং আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যটি আমাদের চরিত্রানুযায়ী হলে, অর্থাৎ আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যটি আমাদের বিরোধিতা না করলে তবেই কর্মটি আনন্দদায়ক হওয়া সম্ভব। নৈতিক সিদ্ধান্ত গঠনের ভিত্তি বলেই আবেগগুলি সদ্‌গুণ বলে বিবেচিত হয়। আবার এইগুলি চরিত্রে উপস্থিত সদ্‌গুণ বলেই আমাদের কর্মের সিদ্ধান্ত গঠনে নীতিরূপে ক্রিয়া করে।

আমরা জানি স্বাধীন ইচ্ছার উপস্থিতির কারণেই ব্যক্তির গৃহীত সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করার প্রশ্ন ওঠে। ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার স্বরূপ কি? মনোবিদগণ এই স্বাধীন ইচ্ছাকে আত্ম-শক্তি বা ego-strength বলেছেন। সাধারণভাবে বলা যায় এ হলো এমন সামর্থ্য যা আমাদের আবেগকে সংযত করে বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। এখন বিচার করার অর্থ যদি হয় পরিস্থিতি অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করে সেই অনুসারে আমাদের কর্মের লক্ষ্য নির্ণয় করা তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণবাদকে সমর্থন করতে হয়। নীতিই আমাদের সিদ্ধান্তকে নির্ধারণ করবে এবং সেই সিদ্ধান্ত আমাদের কর্মের কারণ বা নিয়ন্ত্রক হবে। এরূপ নিয়ন্ত্রণবাদী মতামত স্বীকার করার অপর কারণ হলো প্রতিটি সিদ্ধান্ত সমরূপ হবে, যেহেতু তা সর্বজনীন নীতি থেকে নিঃসৃত হবে। এখন সিদ্ধান্ত যদি সর্বজনীন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত নীতি অনুসরণের দ্বারাই গৃহীত হয় তবে সকলের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও এক

হবে। আমরা জানি যে, কান্ট মনে করেছেন সেই ব্যক্তিগত নীতি অনুসারে কর্ম পালন করা কর্তব্য—যা সকলেই গ্রহণ করবে। তাহলে সিদ্ধান্ত যদি আবশ্যকভাবে নীতির দ্বারাই নির্ধারিত হয় তবে ব্যক্তির বিচার করার আর প্রয়োজনই থাকে না। যেহেতু সিদ্ধান্ত আপতিক নয়। ব্যক্তির দায়িত্ব কেবলমাত্র কোন পরিস্থিতিতে কোন নীতিটি প্রযোজ্য তা বিচার করা। সিদ্ধান্ত বা লক্ষ্য নির্ণয়ের কাজটি নীতিই পালন করে। কিন্তু এমন কথা স্বীকার করলে নৈতিক কর্ম পালনের ব্যর্থতার দায় কেবলমাত্র ব্যক্তির বৌদ্ধিক ক্ষমতার অভাবকেই বলতে হবে। কারণ ব্যক্তি যদি পরিস্থিতি বিচারে অসমর্থ হয়, তার যদি নীতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব থাকে তবেই সে নৈতিক কর্ম পালনে অক্ষম হবে। তাহলে বিচারক্ষমতাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী, জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রই নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করবেন। প্লেটোও মনে করেছেন নৈতিক দুর্বলতা (*akrasia*) কোন চারিত্রিক ত্রুটিজনিত নয়। এটির কারণ হলো অজ্ঞানতা। ব্যক্তি কোনটি মঙ্গলজনক তা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হলে তার নৈতিক ত্রুটি বা নৈতিক দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয় তবে সে নৈতিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারবে। ব্যক্তি যখন তার আত্মসুখের কারণে অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সে তাৎক্ষনিক আনন্দের ফলশ্রুতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় বলেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত গঠন করে। অর্থাৎ তার যথার্থ জ্ঞানের অভাবই তার অনৈতিক কর্ম সম্পাদনের কারণ। একইভাবে এ্যারিস্টটলও নৈতিক দুর্বলতার কারণ বলতে আমাদের সার্বিক অথবা বিশেষ জ্ঞানের অভাবকেই দায়ী করেছেন। কোন একটি রাসায়নিক দ্রব্য আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক— এরূপ জ্ঞানের অভাব থাকার জন্যই আমরা ঐ রাসায়নিক দ্রব্য উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পাঁউরুটি ব্যবহার করতে পারি। আবার ঐ রাসায়নিক ক্ষতিকর জানলেও পাঁউরুটিতে তার উপস্থিতির জ্ঞান না থাকায় আমাদের সিদ্ধান্ত গঠনে ভ্রান্তি ঘটে। তবে এ্যারিস্টটল মনে করেছেন যে, ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত যেমন নৈতিক কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, তেমনি তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ হলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেমন, মদ্যপান যে লিভারের জন্য ক্ষতিকারক বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে সেই জ্ঞান না থাকার কারণে ব্যক্তি মদ্যপান করতে পারে। আবার দুঃখে জর্জরিত হয়ে ব্যক্তি ঐরূপ আচরণ করতে পারে। তবে প্লেটো এবং এ্যারিস্টটল উভয়ই মূলত বৌদ্ধিক সামর্থ্যের অভাবকেই নৈতিক দুর্বলতার কারণ বলে অভিহিত করেছেন। তাহলে বলতে হয় যথাযথ তথ্যের অভাব থাকার জন্য, পরিস্থিতি অনুধাবনের অভাব থাকার কারণে, অভিজ্ঞতার অভাবে ব্যক্তি ভুল করে। কিন্তু তাহলে ব্যক্তিকে তার এই অক্ষমতার জন্য দোষারোপ করা যায় না। কারণ ব্যক্তিকে এই তথ্যগুলির জন্য অপর ব্যক্তির উপর, অর্থাৎ জগতের উপর নির্ভর করতে হয়। বহু কারণেই ব্যক্তি ঐ তথ্য লাভ করতে সমর্থ

না হতে পারে। এমনকী তথ্য যদি সঠিক না হয় তবেও তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু ব্যক্তির নৈতিক মূল্যায়ন যদি তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে তবে তার নৈতিক দায়িত্বের সম্ভাবনা বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। ব্যক্তির নৈতিক সিদ্ধান্ত যদি কেবলমাত্র কতকগুলি জগত থেকে আহরিত তথ্য নির্ভর হয় এবং তথ্যের অসম্পূর্ণতার কারণে সিদ্ধান্ত যথাযথ না হয় তবে তার জন্য ব্যক্তির নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকে না।

তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করি ব্যক্তির সিদ্ধান্ত আবশ্যিক হয় না, আপতিক হয়। একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং তাদের সিদ্ধান্তের ভিন্নতা অনুসারে তাদের কর্মও ভিন্ন হয়। এমনকী তাদের সিদ্ধান্ত একরূপ হলেও কোন ব্যক্তি তার গৃহীত সিদ্ধান্তে আনন্দ লাভ করে, আবার কোন ব্যক্তি কর্তব্য বলে তা নির্বিকার চিত্তে পালন করে। আবার কোন ব্যক্তি নৈতিক কর্ম পালন না করতেও পারে। তাহলে আমাদের সিদ্ধান্তের ভিন্নতা এবং সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনুভূতির ভিন্নতা ব্যক্তিসাপেক্ষতার উপস্থিতিকে প্রমাণ করে। ব্যক্তি যেহেতু নৈতিক কর্মের সচেতন কর্তা তাই তার নিজস্বতা, স্বাধীনতা অবশ্যই সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়। কেবলমাত্র বাহ্যজগতের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি তার ঐচ্ছিক কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় না, কারণ বাহ্যজগতের শর্তাবলী সর্বদা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ব্যক্তি তার নিজস্ব যুক্তি দ্বারাই যখন সিদ্ধান্ত গঠন করে তখন তার ইচ্ছা, আবেগ, নিজস্বতা কর্মের লক্ষ্য নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিকে যখন আমরা তার লক্ষ্য নির্ধারণের কারণ বলে ব্যাখ্যা করি তখন কিন্তু ব্যক্তি কেবলমাত্র কোন ঘটনা নয়, এবং সেই কারণে তার নিরপেক্ষ উপস্থিতি দ্বারা কর্মের লক্ষ্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। ব্যক্তি অনুভূতিসম্পন্ন সচেতন কর্তা বলেই তার নিজস্ব চিন্তা, তার নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগে সে সক্ষম। নিজস্বতার প্রতিফলন ঘটাতে সমর্থ বলেই লক্ষ্য নির্বাচনে ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই কারণেই যে যুক্তি ব্যক্তি তার লক্ষ্যের মূল্যায়ন করার কালে ব্যবহার করে তা কেবলমাত্র বাহ্যজগতের সত্যতা নির্ভর নয়। ঐ যুক্তি গঠিত হয় ব্যক্তির নিজের নৈতিক অনুভূতির মাপকাঠিতে, তার নৈতিকবোধের মানদণ্ডে। ফলে এই যুক্তিটি ব্যক্তির অন্তরের নৈতিকবোধের মাধুর্যে ঋদ্ধ হয়ে তার নিজস্ব যুক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু নিজস্ব যুক্তি হলেও এই যুক্তিটি কেবলমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য হবে—এমন সাপেক্ষতবাদকেও সমর্থন করে না। কারণ ব্যক্তি যেহেতু একইসাথে বুদ্ধির প্রয়োগে সমর্থ তাই তার যুক্তিটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বজনীনতাকে স্পর্শ করে। যে আবেগগুলি ব্যক্তির লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় সেগুলি নৈতিক বলেই ব্যক্তিস্বার্থ পূরণকেই লক্ষ্যরূপে নির্বাচন করে না। ব্যক্তি তার নিজের উন্নত মনের আলোকে সৎ লক্ষ্য নির্বাচনে সমর্থ হয়। সুতরাং লক্ষ্য নির্বাচনে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির আবেগ ব্যবহার আবশ্যক।

আবেগ সম্পর্কে এরূপ একটি ব্যাখ্যা স্বীকার করলে আমাদের তাকে গ্রহণ করা এবং নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সহজ হয়। কারণ দার্শনিকেরা আবেগকে উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করলেন। এমন মনে করা হলো যে, বিচারমূলক অবধারণ গঠনের ক্ষেত্রে আবেগকে আবশ্যক উপাদান বলা যায়। আবেগ চিন্তাশূণ্য নয়। আবেগ উদ্দেশ্যমূলক, কারণ সেটি বিষয়ের মূল্যনির্ধারণ করে, সেটি সম্পর্কে অবধারণ গঠন করে। আমরা যখন ভালোবেসে আনন্দ লাভ করি তখন যে বস্তুটি আমাদের নিকট আনন্দদায়ক বলে গণ্য হয় সেটির প্রকৃত বিচার করেই আমরা সেটিকে সুখজনক বলে মনে করি এবং সেই কারণেই বস্তুটিকে ভালোবেসে আনন্দ অনুভব করি। এর থেকেই বলা যায়, আবেগের প্রকাশক অনুভূতিগুলি নিছক কোন সংবেদন থেকে ভিন্ন। কারণ সংবেদনগুলি আমাদের শারীরিক কোন সুবিধা বা অসুবিধা থেকে অকস্মাৎ উৎপন্ন হতে পারে। হঠাৎ করে গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে আমরা চিৎকার করে উঠি। এখানে আমাদের শারীরিক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখের অনুভূতি ব্যক্ত করি। কিন্তু আবেগ সর্বদাই কোন বিচারমূলক সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ উৎপন্ন মানসিক অবস্থা। সুতরাং প্রতিটি আবেগই আবশ্যিকভাবে কোন বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে। প্রথমে আবেগের বিষয়টি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হলেও আবেগ তাঁর যুক্তিবিচারের দ্বারা বিষয়টি নির্দিষ্ট করে। সুতরাং মূল্যাবধারণের সামর্থ্য আবেগের আবশ্যিক অঙ্গরূপে বিদ্যমান। তাহলে আবেগকে ব্যবহারের অর্থ হলো মনের একটি জ্ঞানাত্মক স্তরকে ব্যবহার করা যা যুক্তিপূর্ণ, বিচারমূলক, উদ্দেশ্যমূলক। আবেগ জ্ঞানাত্মক স্তররূপে বৌদ্ধিক চিন্তনেরই সমান। এ্যারিস্টটলের ভাবনাতেও আমরা লক্ষ্য করেছি এমনই ব্যাখ্যা। তিনি 'ভালো' ব্যক্তি বা *eudaimon* এর চরিত্র চিত্রণের সময় বুদ্ধি ও আবেগের সমান্তরাল অবস্থান এবং যুগ্ম কার্যকারিতার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন।

সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিবিদগণ নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিশ্বাস, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সে কারণে তাঁদের মতে নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোভাব গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। এই মতবাদে চরিত্র নৈতিকতায় মুখ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা এঁদের মতে, মনের প্রতিফলন নির্দ্বিধায় ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হবে। এ সকল দার্শনিকগণ ব্যক্তির সমগ্র মনোভাবের প্রতিফলনকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাই তাঁদের নিকট ব্যক্তির কর্মের বিচার গৌণ হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তির কর্ম ব্যক্তির প্রকৃতি অনুরূপ হবে। সেখানে ব্যক্তির মনের কোন অংশকে দমন করে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এর ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যেটি নৈতিক বিচারের পূর্বশর্ত, সেটিকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম করবে। সুতরাং অপর ব্যক্তির কর্মকে বিচার করার প্রয়োজন নেই, অপর ব্যক্তি নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করছে কিনা তা মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। ভালো-মন্দ,

ন্যায়- অন্যায়ের ধারণা ব্যক্তির স্বভাব থেকেই নিঃসৃত হয়। ব্যক্তির চরিত্র সৎ হলে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। কেননা তাঁর প্রকৃতি থেকে কর্ম নিঃসৃত হবে। সেকারণে সদ্‌গুণসংক্রান্ত মতবাদীদের দাবি হলো, নৈতিক আবেগের কারণে আমরা কোনরূপ বাধ্যতাবোধ ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালোলাগার অনুভূতিতে আনন্দ সহকারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে থাকি। কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আমরা দায়বদ্ধতা অনুভব করলেও সেটিকে পক্ষপাতিত্ব বলা যাবে না। যেহেতু আমরা ন্যায্যতার অনুশীলন করি নৈর্ব্যক্তিকভাবে, বাস্তব জীবনের প্রয়োজন অনুসারে। আবেগের কারণে ব্যক্তি নিজস্ব স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, বরং এমনও হতে পারে যে, ব্যক্তিকে প্রয়োজনে তার নিজস্বার্থ বিসর্জন দিতে হতে পারে তার আবেগ অনুসারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কারণে। নৈতিক কর্মের উদ্দেশ্যটি নির্ধারিত হয় আমাদের মনে নিহিত সদ্‌গুণ যেভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা গঠন করে তার দ্বারা। তাহলে কোন বিষয়ে ধারণা আমরা গঠন করি বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের আবেগ দ্বারা। অর্থাৎ আমাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ঐ বিষয়টি কীরূপ গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করে। এই আবেগগুলি যদি নৈতিক হয় তাহলে আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য হবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা। কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য সেক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করার প্রয়োজন হবে না। কারণ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনে সকল ব্যক্তির প্রতি সমান আচরণ করতে হবে, সকল ব্যক্তিই আমাদের মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠবে। তাহলে আবেগ নৈতিকতার বিরোধী এমন দাবি যুক্তিযুক্ত নয়। আবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও গ্রাহ্য নয়। কারণ সকলের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হওয়ার কারণে সার্বিকতা ক্ষুণ্ন হয় না।

বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, আমাদের জীবনের সকল পরিস্থিতিতে নীতিগুলি আমাদের কর্ম নির্ধারণের সহায়ক হয় না। নীতি থাকা সত্ত্বেও আমরা বহু লোকগাথা, মনিষীদের জীবন, ঐতিহাসিক চরিত্র ইত্যাদি থেকে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। এই সকল গল্পের নায়কদের চারিত্রিক গুণাবলি আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা ভাল-মন্দের ধারণাটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি ঐ সকল ব্যক্তিদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বিভিন্ন উপদেশাবলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র অনুসরণকেও তাই আমরা কর্তব্য বলে মনে করি। নৈতিক শিক্ষা তাই কেবলমাত্র কর্মসংক্রান্ত নয়, জীবনসংক্রান্তও হয়—যা আমাদের কীভাবে নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব সেই বোধ গঠন করতে সাহায্য করে।[১] কোন ব্যক্তির আদর্শ যদি হন মাদার টেরিজা তাহলে সে মাদার টেরিজার চরিত্রে উপস্থিত সেবাপরায়ণতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, প্রশান্তির মনোভাব অর্জন করতে ইচ্ছুক হবে। বলা যায়, মাদার টেরিজার চারিত্রিক গুণাবলিই নৈতিক নিয়মের মত ঐ ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যেহেতু

সেই ব্যক্তি মাদারকে অনুসরণ করাই কর্তব্য বলে মনে করে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে যে ব্যক্তি তার জীবনের আদর্শরূপে বিবেচনা করবেন, তিনি নেতাজীর জীবনের মহৎ গুণগুলিকে অনুসরণ করা কর্তব্য বলে মনে করবেন। নেতাজীর বীরত্ব, দেশাত্মবোধ, সহানুভূতিশীলতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি গুণগুলিকে নিজে অর্জন করে তাঁর মতই জীবনকে পরিচালিত করবেন। যা কিছু দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে প্রভাবিত হই তা কেবলমাত্র কতগুলি বিমূর্ত আকারসর্বস্ব নীতি নয়। এই উদাহরণগুলি বাস্তব জীবনের ঘটনার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা প্রচার করে বলেই এগুলি আমাদের নিকট সহজবোধ্য হয়। কারণ ঐসব উদাহরণগুলি থেকে আমরা কতকগুলি চারিত্রিক সদ্‌গুণ অর্জনের শিক্ষা গ্রহণ করি। বলা যায়, কর্মসংক্রান্ত নীতিগুলি আমাদের জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করে, তার থেকে আমরা অনেক বেশি আলোড়িত হই এই সকল কাহিনীগুলির দ্বারা। তার মূল কারণ হলো এই কাহিনীগুলি আমাদের মনকে স্পর্শ করে। আমাদের মনে বিভিন্ন আবেগের সঞ্চার করে। নেতাজীর বীরত্বের কাহিনী আমাদের মনে সাহস আবেগ উৎপাদন করে এবং ঐ আবেগটিই আমরা আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যবহার করি। ঐ আবেগটি আমাদের মনে উপস্থিত থাকে বলেই আমরা দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করি। ঐ আবেগটি হৃদয়ে থাকার জন্যই আমরা ঐরূপ আচরণ পালন করতে সক্ষম হই। আমাদের কর্মের লক্ষ্যটি এক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে নিঃসৃত হয় বলে লক্ষ্যের সাথে ব্যক্তির কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। আমাদের মনে উপস্থিত আবেগকে আমরা first order আবেগ বলে ব্যাখ্যা করতে পারি--যা আমাদের কর্মে প্রতিফলিত হয়। এই first order আবেগ বা চরিত্রগত আবেগই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। সিদ্ধান্ত যখন চরিত্রের বিরোধী হয় না তখনই মনে প্রশান্তি বজায় থাকে। ব্যক্তি আনন্দের সাথে নৈতিক কর্ম পালন করে। আনন্দের অভিব্যক্তি থাকলেই ব্যক্তির নৈতিক কর্মে মাধুর্যের প্রকাশ ঘটে।

আমাদের চরিত্রে উপস্থিত আবেগগুলি যেহেতু সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয় তাই বলা যায় আবেগ যে কেবলমাত্র আমাদের নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে তাই নয়, এগুলি নীতিরূপে ক্রিয়া করে। যে ব্যক্তির মনে সমমর্মিতাবোধ উপস্থিত সেই ব্যক্তি সমমর্মিতামূলক আচরণ পালনকে আবশ্যিক বলে মনে করবে। যে ব্যক্তি সাহসী সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহসী কর্মই পালন করবে। এখানে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যাবে। ব্যক্তি যখন মূল্যায়ন করছে তখন সেই মূল্যায়নে ব্যক্তি তাঁর নিজের পরিস্থিতি বিচার করে, আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, ইচ্ছা অনুসারে মূল্যায়ন করে। তার ফলে সেই অবধারণ ব্যক্তি সানন্দে পালন করে। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, লজ্জা—এই সকল আবেগ চরিত্রে প্রবণতারূপে অর্জন করলেই আমি অপরের প্রতি ভালোবাসা

প্রদর্শনে সক্ষম হবো। ‘প্রতিবেশীকে ভালোবাসো’—বাইবেলে উল্লিখিত এই আদেশটি মনে পড়ে বলেই আমি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসবো এমন নয়। আমার প্রীতিসুলভ ভাবনাই আমার অপরের প্রতি প্রীতিসুলভ আচরণের কারণ হবে। অর্থাৎ নীতিগুলি যেমন আদেশ বা অনুজ্ঞারূপে ব্যক্ত হয়, সদ্‌গুণ বা নৈতিক আবেগ সেরূপ নয়। অনুজ্ঞা বা আদেশের বাধ্যতাবোধ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা আমাদের ভালোলাগা, আনন্দের অনুভূতি দিয়ে নৈতিক জীবনকে গ্রহণ করতে চাই। যেমন পথমধ্যে যখন কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ অসুস্থতায় তাকে চিকিৎসকের নিকট নিতে সচেষ্ট হই, তখন ঐ অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা আমাদের অন্যান্য বিষয়কে, যেমন নিজের দুঃখ, শারিরীক অসুস্থতা, প্রতিজ্ঞা রক্ষার দায়িত্ব ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে ঐ ব্যক্তির প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে সহমর্মিতা, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগগুলি আমাদের কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। এই আবেগগুলি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিষয় বিচার করে বিষয়টি সম্পর্কে সুবিবেচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। পথমধ্যে ঐ অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহচর্য দেওয়াকে তখন আমরা কর্তব্য বলে গণ্য করি। সেখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের আশা থাকে না। ঐ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আমাদের ন্যায্য আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। একটি স্বর্গীয় ভালোলাগায় আমাদের মন পূর্ণ হয়। ফলে এখানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি আবেগগুলিই ঐ ব্যক্তির প্রতি সঠিক আচরণ পালনে আমাদের প্ররোচিত করে। সুতরাং সঠিক আবেগ চরিত্রে অর্জন করার শিক্ষা লাভ করাও অত্যন্ত জরুরী। নৈতিক আবেগগুলি এভাবেই সদ্‌গুণরূপে আদর্শ বলে চিহ্নিত হওয়ায় নৈতিক নিয়ম বলে গণ্য করা যায়।

আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে আদর্শ বলে গণ্য করি তখন তাঁর বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই মর্যাদা প্রদান করি। বৌদ্ধিক সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি আমাদের নিকট প্রশংসনীয় হতে পারে, এমনকি ঈর্ষনীয় হতে পারে। কিন্তু তাকে অনুসরণ করে তাঁর বৌদ্ধিক সামর্থ্যের অনুরূপ সামর্থ্য অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র তার বৌদ্ধিক সামর্থ্যের জন্য তাকে আমরা প্রশংসা বা ঈর্ষা করি। কিন্তু যে ব্যক্তি চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করেছেন, যার হৃদয় ভালোবাসা, সমমর্মিতা, দয়া, করুণা, পরোপকারিতা ইত্যাদি আবেগেপূর্ণ তিনি সর্বত্র আমাদের নিকট অনুসরণীয় হন। তাঁর এই সামর্থ্য তাঁর জীবনের বিশেষ কোন একটি সামর্থ্য নয়। বরং একটি সর্বাঙ্গীণ সামর্থ্য। যাকে আমরা অনুসরণ করার যোগ্য বলে মনে করি। কারণ বৌদ্ধিক সামর্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যায় না। ব্যক্তি তাঁর জন্মসূত্রেও এই সামর্থ্যের অধিকারী হয়, তবে নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁর সেই সামর্থ্য বা দক্ষতাকে সে উন্নত করতে পারে। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা সৎ আবেগগুলি ব্যক্তির নিজের অর্জিত সম্পদ--- যা ব্যক্তি

স্বেচ্ছায় অনুশীলনের মাধ্যমে সারাজীবনব্যাপী সঞ্চয় করেন। সুতরাং এইরূপ সামর্থ্য অর্জন করার কৃতিত্ব ব্যক্তির নিজের। ব্যক্তির চরিত্রের কারণেই ব্যক্তি আমাদের নিকট অধিক শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেন।

এমন আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, নৈতিক ক্ষেত্রে যে দায়বদ্ধতা, বাধ্যবাধকতা, কর্তব্যবোধের কথা বলা হয় আবেগের উপস্থিতি সেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করবে, যেহেতু আবেগ কোন মনোবৃত্তিকে দমন করে ব্যক্তিকে বুদ্ধি অনুসরণে বাধ্য করবে না। কিন্তু আবেগের সমর্থনকারী দার্শনিকেরা এমন দাবি করেন না। তাঁরা নৈতিক দমনমূলক বাধ্যতাবোধের প্রয়োজনকে অস্বীকার করলেও ব্যক্তির বাধ্যতাবোধের অনুভূতিকে অস্বীকার করেন না যা বিচক্ষণ ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে নিঃসৃত হয়। এখানে যে বাধ্যতাবোধের কথা বলা হয় তা সমাজ অনুসৃত নীতির প্রতি বাধ্যবাধকতা নয় বা সামাজিক বাধ্যবাধকতা নয়। সেই বাধ্যতাবোধ বা দায়িত্ববোধ হলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত, স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত বাধ্যবাধকতাবোধ। চরিত্রে সদ্‌গুণ এবং সৎ আবেগের উপস্থিতি থাকলে ব্যক্তি স্বাভাবিক বাধ্যতাবোধ অনুভব করবেন। ব্যক্তির মনে পরোপকারিতা, সমমর্মিতা, ভালোবাসা, অপরের জন্য কিছু করার আনন্দের আবেগ থাকার জন্যই ব্যক্তি সেগুলিকে অনুসরণ করে যথাযথ কর্ম পালনের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করবে। ফলে এখানে যে বাধ্যবাধকতা তা আবেগ অনুসারে স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগতভাবে কর্মপালনের বাধ্যবাধকতা। আমরা কোন কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থ হলে অনুশোচনা করি, কেননা আমাদের আবেগের পরিতৃপ্তি হয় না বলেই অনুশোচনা বোধ করি। আমার দায়িত্ববোধ পরিতৃপ্ত হয় না বলেই কষ্ট পাই। ফলে বাধ্যবাধকতা আসে আমার দায়িত্ববোধ থেকে। সেই দায়িত্ববোধ আমার আবেগের কারণে সম্ভব হয়। বিমূর্ত নীতি পালনের মধ্যে ব্যক্তি তৃপ্তি লাভ করে না। এই মূর্ত আবেগগুলি কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ নয়, বরং বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক আবেগ। এই আবেগের কারণে ব্যক্তি নৈতিক ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা অনুভব করে, নৈতিক কর্মে আন্তর বাধ্যতাবোধ অনুভব করে। ব্যক্তির মনে যদি কোন দ্বন্দ্ব থাকে, যদি যুক্তি ও আবেগ ভিন্নমুখী হয় তবে ঐ ব্যক্তির মানসিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবে এবং কখনও সে ভালোব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বাহ্যিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে কর্ম করবে। কারণ লোকনিন্দার ভয় তার স্বার্থপরতাকে দমন করতে পরামর্শ দেবে। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা চতুর ব্যক্তি বললেও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলতে পারি না। আবেগের অবদমন বা অনুভূতির অবহেলা কখনও তার চরিত্রকে উন্নত করতে সাহায্য করবে না। স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ইত্যাদি আবেগকে আমাদের দায়বদ্ধতা, কর্তব্যবোধের মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে। কর্তব্য অপেক্ষা সহমর্মিতা,

পরোপকারিতা, ভালোবাসা প্রভৃতি আবেগের ভূমিকাকে উদ্দেশ্য নির্ণয়ে যথাযথ মর্যাদা দিলে ব্যক্তি আন্তর বাধ্যতাবোধে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে।

বুদ্ধিপ্রসূত নীতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতার অন্তরালে আমাদের মানবিকবোধ উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই মানবিকবোধ অনুপস্থিত থাকলে আমরা নীতিগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং সেটি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা কখনই অনুভব করতে পারতাম না। সেজন্য নীতিনিষ্ঠ দার্শনিকগণ যখন বুদ্ধিনিঃসৃত নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলেন তখন তা সম্ভবই হয় না যদি আমাদের মনে শ্রদ্ধা, পরোপকারিতা, সহযোগিতা, উদারতার মানসিকতা না থাকে। কান্ট যখন সর্বজনীন নীতিগুলিকে আদেশরূপে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হন তখন অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থনিরপেক্ষভাবে নীতিগুলিকে প্রয়োগ করা। তিনি যখনই সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তখন অবশ্যই তাঁর লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যখন সকলের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন হয়ে কর্তব্য পালনের আদেশ দিয়েছেন তখন তিনি অবশ্যই পরোপকারিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। আবার তিনি যখন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র উপায়রূপে ব্যবহার না করে উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করতে বলেছেন তখন তিনি সকল মানুষের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবেই সকলের প্রতি সমমনোভাব পোষণ করার অর্থ হলো সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস। অর্থাৎ আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অপরের মঙ্গলে নিযুক্ত হওয়া—এমন উদ্দেশ্য আমাদের মনে তখনই উপস্থিত হতে পারে যদি আমরা অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হই। তাহলে কান্ট যদিও বুদ্ধির নির্দেশে নিয়মনিষ্ঠ পথে কর্তব্যপালনের উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য মানবিকবোধশূন্য—এমন কথা প্রমাণিত হয় না। আবার জন স্টুয়ার্ট মিল যখন উপযোগিতার নীতি অনুসরণ করে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক উপযোগিতা উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছেন তখনও সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুদ্ধিপ্রসূত একথা আমরা বলতে পারি না। অপরের উপযোগিতা উৎপাদনে আমরা তখনই সচেষ্ট হই যখন আমরা অপরের মঙ্গল উৎপাদনকে মর্যাদা দান করি। অপরের মঙ্গল আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ হবে তখনই যখন আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারি, যদি উদার মানসিকতা অর্জন করতে পারি। সুতরাং বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা নীতি নির্ধারণ এবং সেটি অনুসরণ তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা অন্তর থেকে সেটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। ফলে ব্যক্তির আবেগকে কেবলমাত্র নীতি অনুসরণের দ্বারা কর্ম পালনের প্রেষণার জন্যই নির্দিষ্ট করলে হবে না। নীতি নির্ধারণের জন্যও আমাদের আবেগের উপস্থিতি প্রয়োজন। নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য এবং ন্যায়সঙ্গত নীতি নির্ণয় করার জন্য উদারতা, পরোপকারিতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা উপস্থিত থাকা জরুরী। জন রলস মনে করেছেন, ন্যায়ের নীতি নির্ধারণ

কালে ব্যক্তিদের অবস্থার মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। তিনি এই অবস্থাটিকে প্রকৃতির রাজ্যের সাথে তুলনা করেছেন যেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন বিভেদ ছিল না, একটি সাম্যের অবস্থা বজায় থাকত। এমন অবস্থা বাস্তবে থাকে না বলেই তিনি নীতি নির্ধারণের অবস্থাকে একটি কাল্পনিক (hypothetical situation) অবস্থা বলেছেন। রলস বুঝেছিলেন যে, জন্মসময় থেকেই ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। কারণ ব্যক্তির জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক অবস্থা অনুসারে ব্যক্তির জীবনের পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বৈষম্য যদি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় তবে অবশ্যই সেই নীতি শক্তিশালী সম্প্রদায়ের জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং দুর্বলদের শোষণ করার পথ প্রশস্ত করবে। নীতিগুলিকে তিনি বুদ্ধিপ্রসূত বললেও তার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য কিন্তু আবেগের উপরই নির্ভর করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তিনি দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রথমত, নীতি নির্ধারণকালে ব্যক্তি যেন তার নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন না থাকে তার জন্য তিনি অজ্ঞানতার আবরণে থেকে নীতি নির্ধারণ করার কথা বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি নীতি বিষয়ে সকলের সহমত দাবি করেছিলেন। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষাকারী জনকল্যাণমূলক নীতিগুলির বিষয়ে সকলে সমমনোভাব পোষণ করবে। এমন মনোভাব থাকা এবং নিজের সামাজিক অবস্থানকে উপেক্ষা করা সম্ভব যদি সকলের মনে সহযোগিতা নামক আবেগ উপস্থিত থাকে। সুতরাং নীতি নির্ধারণের জন্যই আবেগ থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র কর্মপালনে আবেগের ভূমিকা নেই, উদ্দেশ্য গঠনের দায়িত্বও সে পালন করে। এভাবেই নীতি গঠনের ভিত্তিরূপে আবেগকে স্বীকার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

আমরা আলোচনা করেছি যে, প্রাক-সক্রেটিক যুগ থেকে আধুনিকযুগ পর্যন্ত যে সকল নীতিদার্শনিক নৈতিক ক্ষেত্রে আবেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁদের মতবাদে একথা স্পষ্ট যে, নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আবেগ কোন সংকীর্ণ ক্ষুদ্র স্বার্থবোধক আবেগ নয়। আবেগ আমাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে বা সামাজিক মঙ্গল অর্জনের জন্যই প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, যাঁরা নৈতিকতাকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেছেন, তাঁরা জীবনের চরমলক্ষ্য যে পরমশান্তি তা অর্জনের জন্য এমন কতকগুলি আবেগের কথা বলেছেন যেগুলি ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সহায়ক। এই সকল আবেগ চরিত্র গঠন এবং কর্তব্য পালন অপেক্ষা ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রেই অধিক কার্যকরী হয়। যেমন, ভালোবাসা, আস্থা, বিশ্বাস— এই সকল আবেগ ঈশ্বর লাভ করার নিমিত্ত ব্যক্তিজীবনে অর্জন করাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িককালের দার্শনিকদের চিন্তায় ব্যক্তি চরিত্রে আবেগের প্রয়োজনীয়তা কোন ঈশ্বর সান্নিধ্য বা একাত্মতা অর্জনের

আবশ্যিক শর্ত নয়। ব্যক্তির জীবনের প্রয়োজনে, সামাজিক বন্ধনের জন্য, সর্বোপরি সামাজিক অগ্রগতির জন্য আবেগগুলির প্রাধান্য নৈতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সকল নীতিবিদেরা ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, ব্যক্তিমনকে প্রস্তুত করার জন্য আবেগগুলি ব্যক্তিজীবনে অর্জন করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা ব্যক্তির মানসিক প্রেক্ষাপট প্রস্তুত থাকলে ব্যক্তি নৈতিক জীবন যথাযথভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

আমরা দেখি প্লেটোর মতবাদে বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি নৈতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর মতে, সদ্‌গুণগুলির পর্যাপ্ত জ্ঞানই ব্যক্তিকে নৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত করে। অপর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যক্তিকে অনৈতিক ব্যক্তিরূপে পরিগণিত করে। অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তি সদ্‌গুণ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে নৈতিক বিষয়ের যথাযথতা নিরূপণে ব্যর্থ হবেন। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি যে, সদ্‌গুণের অথবা সৎ আবেগের পর্যাপ্ত জ্ঞানই কেবলমাত্র নৈতিক ব্যক্তির চরিত্র নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। অর্থাৎ পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করলেই আমরা তার ব্যবহারিক আচরণে সর্বদা তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যে সর্বদা নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন—এমন নিশ্চয়তা দাবি করা যায় না। কেননা তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পূর্ণ পৃথক। তাত্ত্বিক জ্ঞান আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির আচরণে সেই জ্ঞানের প্রতিফলন হবেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতিরেকেও যথার্থ নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। ফলে পর্যাপ্ত জ্ঞান নয়, জ্ঞানকে কর্মে প্রকাশ করার জন্য আমার উদ্যম থাকা বাঞ্ছনীয়। কর্মের এই প্রেষণা আমরা লাভ করি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহানুভূতি—এই সকল আবেগগুলি থেকে। এগুলির উপস্থিতি ব্যতীত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। সে কারণে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য চরিত্রে আবেগের উপস্থিতি প্রয়োজন। ব্যক্তির মনে সৎ আবেগ প্রবণতারূপে বর্তমান থাকলে ব্যক্তি সৎ কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এ্যারিস্টটল ব্যক্তির চরিত্র গঠনকে গুরুত্ব দিলেও, যেহেতু তিনি নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের সামর্থ্য কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত বলে মনে করেছিলেন তাই বলা যায়, তাঁর নীতিতত্ত্বে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব লাভ করেনি। তাছাড়া তিনি আবেগ ও বুদ্ধির সমান্তরাল অবস্থানকে কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করলেও সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির আবেগ বুদ্ধি নির্দেশিত পথকে অনুসরণ করবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কারণ তিনি মনের সেই অংশের সামর্থ্যের নৈতিক বিচার করেছেন যে অংশটি বুদ্ধিকে অনুসরণ করে। এ কথা থেকে আমরা বলতে পারি যে, তিনি বুদ্ধি ও আবেগ উভয়ের ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ বললেও বুদ্ধিকেই মূলত গুরুত্ব

দিয়েছেন এবং আবেগকে গৌণ বলে মনে করেছেন। এ্যারিস্টটলের নীতিতত্ত্বে আমরা দেখি বুদ্ধি এবং আবেগের মেলবন্ধনের কথা স্বীকৃত হলেও তাঁর মতবাদে আবেগ যেন বুদ্ধির অধস্তনরূপে বিবেচিত হয়েছে। আবেগ বুদ্ধি দ্বারা পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়ে বুদ্ধিকে সর্বদা অনুসরণ করবে। তিনি যে প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন তাকে বৌদ্ধিক সামর্থ্য বলেছেন। ফলে সেটি সকলের সমান পরিমাণে না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই হয়ত কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীকেই নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বলে মনে করেছেন।

কিন্তু সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ বুদ্ধি এবং আবেগের মধ্যে কোন সামর্থ্যের বা ক্ষমতার বিভেদ স্বীকার করেননি। উভয়ই যেন একে অপরের পরিপূরক। বুদ্ধির প্রাবল্য এবং আবেগের একাধিপত্য—কোন একটির প্রাধান্যকে না স্বীকার করে উভয়ের সমান অবস্থানকে স্বীকার করা হয়েছে। বুদ্ধি এবং আবেগের মিশ্রণ যেন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণতা প্রদান করছে। যেমনভাবে আমরা নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের তাল, লয়, ছন্দের সাথে বিভিন্ন বাদকের বাজনার তাল, লয়, ছন্দের একটা সুসমঞ্জস্য রূপ দেখতে পাই। এবং তবলচীর তবলা অকস্মাৎ স্তব্ধ হলে নৃত্যও যেমন মাধুর্য হারায় তেমনি বুদ্ধি ও আবেগও একে অপরের জন্য অপরিহার্য। বুদ্ধি ও আবেগের মধ্যে বিরোধ থাকলে অথবা একে অপরকে দমন করার চেষ্টা করলে তার মাধুর্যপূর্ণ ফল উৎপাদন করতে পারে না। কারণ তারা একে অপরকে সম্পূর্ণতা দান করে। এদের কোনটি অপরটি থেকে অধিক শক্তিশালী নয় বলে একে অন্যকে দমন করার চেষ্টা করে না। অথচ তারা একে অপরের সহায়ক— যেহেতু বুদ্ধি কোন আবেগ নৈতিক আবেগ তা যেমন চিহ্নিত করতে সাহায্য করে তেমনি আবেগ বুদ্ধিকে ক্রিয়া করতে, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মধ্যেই এমন একটি মানসিক বৃত্তি উপস্থিত থাকা সম্ভব যেখানে আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে কোন বিভাজন সম্ভব না। সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণ বিচক্ষণতা বলতে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষমতাকে বুঝেছেন— যা বুদ্ধি ব্যতীত সম্ভব নয়। এই বুদ্ধি অবশ্য কোন তাত্ত্বিক বুদ্ধি বা বুদ্ধিমত্তা নয়; এ হলো ব্যবহারিক বুদ্ধি, যা অভিজ্ঞতাকে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তির অন্তরে আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এমন ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধি ও আবেগের মেলবন্ধন এমনভাবে থাকে যে, দুটি সত্তাকে পৃথক করা যায় না। সেহেতু বলা যায় যে, বিচক্ষণতা এমন বৃত্তি যার মধ্যে না কেবলমাত্র বুদ্ধির একাধিপত্য, না আবেগের একাধিপত্য বর্তমান। বরং উভয়ের সম্মিলিত এক মানসিক অবস্থা, যেখানে এই দুটি বৃত্তিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। একটি পৃষ্ঠার দুটি দিক যেমন পৃথক হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের সাথে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে তাদের বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয় না, তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে বুদ্ধি ও আবেগ

এমনভাবে যুক্ত থাকে যে তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না। তারা যৌথভাবে ক্রিয়া করে, যেহেতু তারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এমন একটি অবস্থা যাকে আমরা আবেগ বা বুদ্ধির অতিরিক্ত একটি তৃতীয় মনোবৃত্তি বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ এক্ষেত্রে কোন একটির অভাবে অপরটির কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এই বৃত্তি অর্জন করলে ব্যক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা চালিত হবেন না, আবার কেবলমাত্র আবেগ দ্বারা চালিত হবেন না। উভয়ের সামঞ্জস্য এমনভাবে সেই ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান থাকবে যে বুদ্ধি দ্বারা আবেগকে দমনের কোন প্রশ্ন সেখানে অবান্তর হবে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি দ্বন্দ্বহীন মানসিক অবস্থায় বিরাজ করবেন এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন। ফলে নৈতিকতায় বুদ্ধি ও আবেগের যে দ্বিকোটি বিভাজনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সেটির বিপরীতে বলা যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই দ্বিবিভাজন অপ্রয়োজনীয় কেবল নয়, অসম্ভবও বটে।

এই আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, কান্টের মতাদর্শে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা যেমন সদ্‌গুণসংক্রান্ত ধারণাগুলিকে বর্জন করেছেন, তেমনি সদ্‌গুণের সমর্থক দার্শনিকেরা কান্টের বুদ্ধিনির্ভর ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এই দুটি দার্শনিকমত তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। আমার মনে হয়েছে নৈতিক ব্যক্তি হওয়ার জন্য নীতি অনুসরণও যেমন প্রয়োজন, চরিত্রের উৎকর্ষতা অর্জনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কোন কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রদত্ত যুক্তিটি ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তি হয়ে উঠবে এবং আবেগ যুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। ব্যক্তি যখন কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন যে কেবলমাত্র অন্ধভাবে, বাধ্যতামূলকভাবে কোন নীতি অনুসরণ করে তা নয়, তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সে ঐ কর্মটি কেন সম্পাদন করল অথবা কোন নীতি সে অনুসরণ করল না—সে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা'— এই অনুজ্ঞা অনুসরণ করে কর্ম পালন করা নয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে অপর ব্যক্তির প্রত্যাশা পূরণ করছে কিনা, ব্যক্তির উপকার হবে কিনা, সামাজিক দায়িত্ব পালন করছি কিনা—এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়। আবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করার অর্থই অন্যায় কর্ম পালন নয়। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে যুক্তি প্রদানের অবকাশ দিতে হবে। ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে তা জানা জরুরী। সিদ্ধান্তের সপক্ষে কারণ দেখানোর অর্থ কতগুলি নিয়ম উল্লেখ করা নয়, বা শর্তমূলক অনুজ্ঞা বলেই তা পালন করছি তা নয়। আমার সিদ্ধান্ত যাদেরকে প্রভাবিত করবে আমারা তাঁদের বিষয়ে যদি সমমর্মী না হই, তাহলে নৈতিকতা জীবন বহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য হবে। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা এবং তার সঙ্গে মঙ্গলের চিন্তা যুক্ত করে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তাহলেই তা জীবনের জন্য উপযোগী

হয়ে উঠবে। বিচক্ষণ ব্যক্তির যুক্তির মধ্যে বুদ্ধি এবং আবেগ উভয়ই পরস্পর সম্পর্কীত হয়ে থাকে। কারণ তার প্রদত্ত যুক্তিতে নীতির উপস্থিত যেমন থাকে, তেমনি পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যক্তির ইচ্ছা এবং আবেগের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে বলা যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি নীতি এবং আবেগ কোনটিকেই বর্জন করেন না। এখানে এসেই আমার মনে হয়েছে কান্ট এবং সদ্‌গুণ সমর্থক দার্শনিকদের মধ্যে বৈপরীত্য নেই। কারণ কান্ট যখন আবেগকে অস্বীকার করে বুদ্ধিকে অনুসরণ করতে বলেছেন, বাধ্যতাবোধকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের আবেগকে বুঝেছেন, যারা বুদ্ধিকে অস্বীকার করে আবেগ দ্বারা চালিত হন। কিন্তু কান্ট যখন divine will এর কথা বলেছেন তখন কিন্তু তিনি আবেগকে দমনের কথা বলেননি। এমন কি বাধ্যতাবোধের প্রসঙ্গও সেখানে উত্থাপন করেননি। কিন্তু আমরা যখন সদ্‌গুণবাদীদের আলোচনায় আবেগের কথা লক্ষ্য করছি, তখন সেই আবেগ বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবে, অর্থাৎ তা হলো নৈতিক ব্যক্তির আবেগ। সদ্‌গুণবাদীদের বক্তব্য অনুসারে তাহলে বলতে হয় যে, নৈতিক ব্যক্তি বা বিচক্ষণ ব্যক্তির ইচ্ছা হলো divine will, যেখানে আবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। অপূর্ণ ব্যক্তি বা সাধারণ ব্যক্তি নৈতিক ক্ষেত্রে নীতির বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করলেও পূর্ণ সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন বাধ্যবাধকতার উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নীতি অনুসরণের অভ্যাস মনে এমনভাবে প্রোথিত হবে যে সেগুলি ব্যক্তি স্থায়ী প্রবণতারূপে মনে অর্জন করবে। ব্যক্তি এভাবেই ধীরে ধীরে পরমলক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবে এবং পূর্ণসদ্‌গুণ হয়ে উঠবে। ফলে দুটি মতবাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য লক্ষ্য করলেও বৈপরীত্য আছে—এমন বলা যায় না বলেই আমি মনে করি। এই দুটি মতবাদকে একই মুদ্রার দুটি দিক বলা সঙ্গত। উভয় মতবাদই নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুসরণযোগ্য। কান্টের মতবাদ নৈতিক অভ্যাস গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য হলো সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া। সুতরাং আমার মনে হয় কান্টের মতবাদকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং দুটির সমন্বয় সাধন যদি করা যায় তাহলে সেটিই হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদ। নৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি কেবল বুদ্ধি বা কেবল আবেগ দ্বারা চালিত না হয়ে আবেগ ও বুদ্ধির মিশ্রবৃত্তি বা তৃতীয় বৃত্তিকে অর্জন করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী নৈতিক কর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ হন তাহলে প্রকৃতপক্ষে নৈতিক জীবনযাপন করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র

১) মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা, ২০১৫

সূত্রনির্দেশ

১) মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা, (২০১৫), *ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা

Bibliography

1. Alderman, Harold. (1997), “By Virtue of a Virtue”, Statman, Daniel. (ed.), *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
2. Annas Julia, (2007), “Being Virtuous and Doing the Right Thing”, (ed.), Landau, Russ, Shafer, *Ethical Theory: An Anthology*, Blackwell Publishing, USA
3. Annas, Julia, (2002), “My Station and Its Duties: Ideals and the Social embeddedness of Virtue”, *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, Vol. 102, No. 2, pp. 109-123
4. Anscombe, G, E, M. (Jan. 1958) “Modern Moral Philosophy”, *Philosophy*, Vol.33, No. 124, Cambridge University Press pp.1-19
5. Aquinas, Saint. Thomas, (1998), “Summa Contra Gentiles”, (ed), Cahn, Steven. M, and Markie,Peter, *Ethics, History, Theory and Contemporary Issues*, Oxford University Press, Oxford
6. Aquinas, Thomas. St. (2014), *Summa Theologica*, Freddoso, J. Alfred. (trans), University of Notre Dame
7. Aristotle, (2007), “The Nature of Virtue”, (ed.), Landau, Russ, Shafer, *Ethical Theory: An Anthology*, Blackwell Publishing, USA
8. Aristotle. (1962), *Nicomachean Ethics*, Oswald, Martin.(trans), Macmillan Publishers Limited, London
9. Arpaly, Nomy, (2003), *Unprincipled Virtue, An Inquiry into Moral Agency*, Oxford University Press, New York
10. Athanassoulis, Nafsika. (2000), ‘A Response to Harman: Virtue Ethics and Character Traits’, *Proceedings of the Aristotelian Society*, Vol.100, pp.215-221
11. Audi Robert, (2009), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Second Edition, Cambridge University Press, New York
12. Audi, Robert, (2010) “ Reason for Action”, (ed.) John Skorupski, *The Routledge Companion to Ethics*, Routledge, London and New York

13. Audi, Robert, (ed.) (1999), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge
14. August, Saint, (1998), " Enchiridion on Faith, Hope, and Love", (ed) Chan, Steven, M and Markie, Peter, *Ethics, History, Theory and Contemporary Issues*, Oxford University Press, Oxford
15. Augustine, St. (2004), "Of the Morals of the Catholic Church", (ed), Oliver, A. Jhonson & Reath, Andrews, *Ethics, Selections from Classical and Contemporary Writers*, Ninth Edition, Thomson, Wadsworth, Canada
16. Baicke, John, (1996), *Mind and Morality*, Clarendon Press, Oxford
17. Baron, Marcia, (Jan, 1985), "Verities of Ethics of Virtue", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 22, No. 1 pp. 47-53
18. Bastons, miqual, (Mar, 2008), "The Role of Virtue in the Framing of Decisions", *Journal of Business Ethics*, Vol. 78, No. 3, pp. 389-400
19. Ben ze'ev Aaron, (1997)"On Emotion", *The Journal of Value Inquiry O*: Kluwer Academic Publishers, Netherlands. Pg-1-15
20. Bennett, Christopher. (2013), "Blame, Remorse, Marcy, Forgiveness", (ed.) by Skorupski, John. *The Routledge Companion to Ethics*, Routledge, London and New York
21. Ben-Ze'ev, Aaron,(2010), "The Thing Called Emotion", (ed.), Goldie, Peter, *Philosophy of Emotion*, Oxford University Press, Oxford
22. Beoad, C, D. (1956), *Fives Types of Ethical Theory*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London
23. Berys, Gaut, (2014), "Mixed Motivation: Creativity as a Virtue", *Philosophical Aesthetics and the Sciences of Art*, Vol. 13, No. 75, pp. 203-231
24. Bhandari, D. H. Sethi, (1974), *Studies in Plato and Aristotle*, Schndra Co (Pvt.) Ltd, New Delhi
25. Blair, R, J. R, E. Colledge, L, Murray, and D. G. Mitchell, (2001), "A Selective

impairment in the processing of sad and fearful expressions in children with psychopathic tendencies", *Journal of Abnormal Child Psychology*, Vol-29, P 491-498

26. Boner, J, (July, 1926), " The Theory of Moral Sentiments', by Adam Smith 1759", *Journal of Philosophical Studies*, Vol-1, No-3, P 333-353
27. Borges, Maria, (March, 2004), "What Can Kant Teach us about Emotions?", *The Journal of Philosophy*, Vol-101, No-3, P 140-158
28. Bostock, David. (2000), *Aristotle's Ethics*, Oxford University Press, Oxford
29. Brandt, R, B. (July.1981), "W. K. Frankena and Ethics of Virtue", *The Monist*, Vol. 64. No. 3,pp. 271-292
30. Brandt, R. B, (1959), *Ethical Theory*, Englewood Eliffs, N.J. Prentice Hall
31. Burtt, Edwin, A. (Jul. 1921), "Present-Day Tendencies in Ethical Theory" *International Journal of Ethics*, Vol. 31, No. 4, pp.432-438
32. Calcutta Club, The Indian Express, Subyasachi Bondopadhayay, Kolkata Published on: July 18, 2014, 11.22am
33. Carse, Alisa, L, "The Moral Contours of Empathy", *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 8. No. ½, (Apr. 2005), pp-169-195
34. Chan, Steven. M and Markie, Peter. (ed.) (1998), *Ethics: History, Theory, And Contemporary Issues*, Oxford University Press, Oxford
35. Choudhuri, Sukomol, (1997), *Goutam Buddher Dhorma O Darsana*, Mohabodhi Book Egency, kolikata
36. Conly, Sarah, (Oct, 1985), "The Objectivity of Morals and the Subjectivity of Agents", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 22, No. 4, pp. 275-286
37. Crisp, Roger and Slote, Michael. (ed.) (1997), *Virtue Ethics*, Oxford University Press, Oxford
38. D'arms, Justin and Jacobson, Daniel, (2014), *Moral Psychology & Human Agency* Oxford University Press, Oxford

39. Dancy, Jonathan, (2006), *Ethics Without Principles*, Oxford University Press, Oxford
40. Dancy, Jonathan, "Intuition and Emotion", *Ethics*, Vol. 124, July 2014, No. 4, pp. 787-812
41. Das, Rasbihari, (1995), Kanter Dorsana, Poschimbonga Rajjopustaka Porrsada, Kolikata
42. Driver, Julia. (1992), "The Suberogatory", *Australasian Journal of Philosophy*, Vol. 70, pp.286-295
43. Firjda, Nico. H. (1988), *The Laws of Emotion*, University of Amsterdam, The Netherlands
44. Foot, Philippa. (1978), *Virtue and Vices*, Oxford: Blackwell
45. Foot, Phillippa, (Jul, 1972), "Morality as a System of Hypothetical Imperatives", *The Philosophical Review*, Vol. 81, No. 3, pp. 305-316
46. Frankena, William, K. (2003), *Ethics*, Prentice Hall of India, New Delhi
47. Freeman, Kathleen, (1948). *Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers*, Oxford, Basil Blackwell, pp-89
48. Freud, S, (1915), *The Unconscious. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, (S.E), Vol-14 ed and tr. By J. Strachey, Hogarth Press, London
49. Gallop, David, (April, 1999), "Jane Austen and the Aristotelian Ethics", *Philosophy and Literature*, Vol-23, No-1, P 96-109
50. Goldie, Peter. (2010), *Philosophy of Emotion*, Oxford University Press, Oxford
51. Graham, Peter, A, (Jan-1999) "A Sketch of a Theory of Moral Blameworthiness", *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 6, No-4, pp. 388-409
52. Greenspan, Patricia, (2010), "Learning Emotions and Ethics", (ed.), Goldie, Peter, *Philosophy of Emotion*, Oxford University Press, Oxford
53. Greenspan, Patricia. (April, 2000), "Emotional Strategies and Rationality", *Eth-*

ics, Vol.110, No. 3, pp. 469-487

54. Gurney, Edmund, (Jul. 1884), "What is Emotion?", *Mind*, Vol. 9, No. 35, Oxford University Press, pp. 421-426
55. Haidt, J, (2001), "The emotional dog and its rational tail, A social intuitionist approach to moral judgment", *Psychological Review* 108(4), pp. 814-834,
56. Hampshire, Stuart, (1983), *Morality and Conflict*, Basil Blackwell, England
57. Harman, G. (1999), 'Moral Philosophy Meets Moral Psychology: Virtue Ethics and the Fundamental Attribution Error', *Proceedings of the Aristotelian Society*, Vol. XCIX, Part 3.
58. Harman, Gilbert, (1977), *The Nature of Morality*, Oxford University Press, New York
59. Harris, James, A. (2009), "A Compleat Chain of Reasoning: Hume's Project in "A Treatise of Human Nature", Books One and Two", *Proceedings of the Aristotelian Society, New Series*, Vol. 109, pp. 129-148
60. Held, Virginia, (2007) "The Ethics of Care", (ed.) Copp David, *Ethical Theory*, Oxford University Press, New York, pg-537-566
61. Hemingway, Ernest, (2003), *Death in the Afternoon*, Charles Scribner's Sons, New york, P-305
62. Hill, Thomas, E. (2007) "Kantian Normative Ethics", (ed.) Copp, David. *The Oxford Handbook of Ethical Theory*, Oxford University Press, New York
63. Holmes, Robert, L. (Jan. 1974), "Is Morality a system of Hypothetical Imperatives?", *Analysis*, Vol. 34, No. 3, pp. 96-100
64. Homiak, Marcia, L. "Does Hume Have an Ethics of Virtue? Some Observations on Character and Reasoning in Hume and Aristotle", *homiak@oxy.edu*
65. Hume, David, (1978), *A Treatise of Human Nature*, P.H. Niddtch, (ed), Oxford University Press, Oxford
66. Hume, David, (2000), *A Treatise of Human Nature*, (trans), Oxford University

Press, Oxford

67. Hume, David, (2007), *A Treatise of Human Nature*, (ed.), Norton. David. Fate and Norton. Mery, Clarendon Press, Oxford
68. Hume, David.(1960), *A Treatise of Human Nature*, Selby-Bigge, L.A (ed.), The Clarendon Press, Oxford
69. Hursthouse, Rosalind, (2004), "Normative Virtue Ethics", (ed), Johnson, Oliver. A & Reath, Andrews, *Ethics, Selections from Classical and Contemporary Writers*, Ninth Edition, Thomson, Wadsworth, Canada
70. Hursthouse, Rosalind, (2007), "Normative Virtue Ethics", (ed.), Landau, Russ, Shafer, *Ethical Theory: An Anthology*, Blackwell Publishing, UK
71. Hursthouse, Rosalind. (1997), "Virtue Ethics and the Emotions", Statman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
72. Immanuel, Kant, (1964), *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, (Trans), H. J. Paton, Harper & Row Publishers, New York
73. Immanuel, Kant, (1971), *The Metaphysics of Morals*, Gregor, Mery (trans), Pennsylvania Press, Philadelphia
74. J, B. Schneewind, (Oct, 1998), "The Invention of Autonomy: A History of Modern Philosophy", *Journal of the History of Philosophy*, Vol-36, No-4, P 627-668
75. Jackson, Reginald, (1942-1943), "Kant's Distinction between Categorical and Hypothetical Imperatives", *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, Vol. 43, pp. 131-166
76. James, Williams, (1950), *The Principles of Psychology*, Vol-122, Dover, New York
77. Johnson, Oliver, A. and Reath, Andrews, (2004), *Ethics Selections from Classical and Contemporary writers*, Thomson, Wadsworth
78. Kant, Immanual. (1948), *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Paton. H.J. (trans.) Hutchison University Press, London

79. Kant, Immanual. (1979), *The Moral Law, Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Paton. H.J. (trans.) B. I. Publication, Indian Edition, New Delhi
80. Kant, Immanuel. (1929), *Critique of Pure Reason*, Smith, Kemp.(trans) Macmillan Publishers' Limited, London
81. Kant, Immanuel.(1996), *The Metaphysics of Morals*, Gregor, Mary.(trans.) Cambridge University Press, Cambridge
82. Katsafanas, Paul, (2013), *Agency and the Foundations of Ethics, Nietzschean Constitutivism*, Oxford University Press, United Kingdom
83. Keown, Damien, (2001), *The Nature of Buddhist Ethics*, Palgrave, New York
84. Kierkegaard, Soren, (2009), *Concluding Unscientific Postscript to the Philosophical Crumbs*, (ed.), Hannay, Alastain, Cambridge University Press, UK
85. Knuutila, S & Siholva, J (1998) "How the Philosophical Analysis of Emotions was Introduced," In Sihvola, J & Engberg Perdersen, T (ed.) *The Emotion in Hellenistic Philosophy*, Netherland, Kluwer, pg-1-19.
86. Leighton, Stephen, R, "Aristotle and the Emotion", *Phronesis*, Vol. 27. No. 2 (1982), pp. 144-174
87. Louden, Robert, B. (1997), "On some Vices of Virtue Ethics", Statman, Daniel, (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
88. Machenzie, J. S, (1929), *A manual of Ethics*, University Tutorial Press, Oxford
89. MacIntyre, Alasdair. (1985), *After Virtue*, Duckworth, London
90. MacIntyre, Alasdair. (1997), "The Nature of the Virtues", Crisp, Roger and Slote, Michael.(ed.), *Virtue Ethics*, Oxford University Press, Oxford
91. Markic, Olga, " Rationality and Emotions in Decision Making", *NDCCS*, 9 Dec 2009
92. Markovits, Julia, (2014), *Moral Reason*, Oxford University Press, New York
93. Marks, Joel, (Sep, 1982) "A Theory of Emotion", *Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition*, Vol. 42 No. 2,

pp. 227-242

94. McAlleer, Sean. (August, 2010), “Four Solutions to the Alleged Incompleteness of Virtue Ethics”, *Journal of Ethics & Social Philosophy*, Vol. 4, No. 31, pp. 1-20
95. Mele, Alfred, R. and Rawling, Piers, (2004), *Rationality*, Oxford University, New York
96. Mill, Jhon. Stuart. (1979), *Utilitarianism* Sher, G. (ed.) Indianapolis: Hackett Publishing Company
97. Montague, Phillip, (Jan. 1992), “Virtue Ethics: A Qualified Success Story”, *American Philosophical Quarterly*, Vol. 29, No. 1, pp. 53-61
98. Montague, Phillip. (1997), “Virtue Ethics: A Qualified Success Story”, Statman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
99. Mukherjee, Ranjona, (1413), “Noitik Bicharer Kshetre Noitikbodher Vumika”, *Dorshana*, Vol-48, Second Edition, P3-25
100. Mukhopadhyay, Aparajita. (2008-2009), “Explaining the Notion of Inconsistency in a Moral Context”, *Journal of Philosophy*, Rabindra Bharati, pp. 70-81
101. Mukhopadhyay, Aporajita, (2015), Vyaticaritra Ebong Naitikata, Jadavpur University, Kolkata
102. Mulligan, Kevin, (2010), “Emotions and Values”, (ed.), Goldie, Peter, *Philosophy of Emotion*, Oxford University Press, Oxford
103. Norman, Richard, (1998), *The Moral Philosophers*, Second Edition, Oxford University Press, New York
104. Norman, Richard. (1998), *The Moral Philosopher*, Oxford University Press, Oxford
105. Nussbaum, Martha, C, “ The Feminist Critique of Liberalism”, (ed.) Cahw, Steven, M, *The Essential Text*, (2005), The City University of New York Graduate Centre, Oxford University Press

106. Nussbaum, Martha, C. (2006), *Hiding from Humanity Disgust, Shame, and the Law*, Princeton University Press, United Kingdom

107. Nussbaum, Martha. C. (1986), *Fragility of Goodness Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge

108. Oliver, A, Jhonson, & Reath Andrews, (2004) *Ethics, Selections from Classical and Contemporary Writers*, Ninth Edition, Thomson, Wadsworth, Canada

109. Oxley, Julianna, C, (2011), *The Moral Dimensions of Empathy, Limits and Applications in Ethical Theory and Practice*, Palgrave Macmillan

110. Pally, Marcia, (2016), *Religion & Ethics Article Sums Up Common Wealth and Convent*, Marciapally, Eerdmans Publishing, New York

111. Patterson, Charles, H. (Spring, 1942), "Sources of Moral Obligation", *Prairie Schooner*, Vol. 16, No. 1, pp. 24-33

112. Pink, Thomas, (2004), "Moral Obligation", (ed.) Anthony O' Hear, *Modern Moral Philosophy*, Cambridge University Press, United Kingdom

113. Pink, Thomas, (2004), *The Will and Human Action: From Antiquity to the Present Day*, Rouledge, New York

114. Pizarro, David, "Nothing More than Feeling? The Role of Emotions in Moral Judgment", *Journal of the Theory of Social Behavior*, Dec-2002, Vol. 3, pp. 355-375

115. Pojman, Louis, P, (1990) *Ethics, Discovering Right And Wrong*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California

116. Prasad, Rajerdra, "On Preserving For Order Among Valuing Patterns of Man's Social Existence"

117. Prinz, Jesse, (March, 2006) "The Emotional Basis of Moral Judgments", *Philosophical Explorations*, Vol. 9. No. 1 pp. 29-43

118. Prinz, Jesse, J. (2010), "The Moral Emotion", (ed.), Goldie, Peter, *Philosophy of Emotion*, Oxford University Press, Oxford

119. Quillian, William, F. (Oct, 1949), “The Problem of moral Obligation”, *Ethics*, Vol. 60, No. 1, pp. 40-48
120. Rachels, James, (1998), “The Ethics of Virtue”, (ed), *Ethics, History, Theory and Contemporary Issues*, Steven, M. Cahn & Markie Peter, Oxford University Press, Oxford
121. Rachels, James, (1998), *Ethical Theory*, Oxford University Press, New York
122. Rachels, James.(1978), *The Elements of Moral Philosophy*, Mcgraw-Hill, New York
123. Rawls, John, *A Theory Of Justice*, (1999), Oxford University Press, New York
124. Robert, Nozick, (1981), *Philosophical Explanations*, Cambridge, Massa Harvard University Press
125. Roberts, Robert, C. (2010), “ Emotions and the Canons of Evaluation”, (ed.), Goldie, Peter, *Philosophy of Emotion*, Oxford University Press, Oxford
126. Roberts, Robert. C. (June, 1991), “ Virtue and Rules”, *Philosophy and Phenomeno -logical Research*, Vol. 51, No, 2, pp. 325-343
127. Russo, S. Michael, (1997), *Socratic*, Philosophy Archives. Introduction to Socratic Ethics. SophiaOmni. www.SophiaOmni.org.
128. Salmela, Mikko, (Jul. 2006), “True Emotion”, *The Philosophical Quarterly*, Vol. 56. No. 224 pp. 382-405
129. Schlick, Moritz, (1939), *Problems Of Ethics*, (trans.) Rynin, David, Dover Publications, INC. New York
130. Schneider, Herbert, M. (Oct, 1939), “Moral Obligation”, *Ethics*, Vol. 50, No. 1, pp. 45-56
131. Shoemaker, David. (Oct, 2007), “Moral Address, Moral Responsibility, and the Boundaries of the Moral Community”, *Ethics*, Vol. 118, No. 1, pp. 70-107
132. Sias, James. (2014), “Ethical Intuitionism and the Emotions: Toward an Empirically Adequate Moral Sense Theory”, *The Journal of Value Inquiry*,

Vol. 48, No. 3, pp. 533-549

133. Sidgwick, Henry, (1967). *Outlines of the History of Ethics,* Macmillan, St Martin's Press New York
134. Sidgwick, Henry, (1981), *The Methods of Ethics,* Indianapolis, Hackett
135. Sidgwick, Henry, (Oct, 1893), "My Station and Its Duties", *International Journal of Ethics*, Vol. 4, No. 1, pp. 1-17
136. Singha, Kaliprasanna, *Mahabharata*, (trans), Sakharata Prakasana, Kolkata, Vol-4
137. Slote, Michael, (1997), "Agent-Based Virtue Ethics", (ed.), Crisp, Roger, & Slote, Michael, *Virtue Ethics*, Oxford University press, New York
138. Slote, Michael, (Oct. 1982), "Morality Not a System of Imperatives", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 19, No. 4, pp. 331-340
139. Slote, Michael. (1997),"From Morality to Virtue", Statman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
140. Snow, Nancy, E, (Jan. 2000), "Empathy", *American Philosophical Quarterly*, University of Illinois Press , Vol. 37. No. 1, pp-65-78
141. Solomon, David.(1997), "Internal Objections to Virtue Ethics", Statman, Daniel.(ed.), *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
142. Solomon, Robert, (1977), *The Passion*, Doubleday, New York
143. Stark, Susan,(Sep. 2001), "Virtue and Emotion", *Nous*, Vol. 35, No. 3, pp. 440-455
144. Statman, Daniel. (1997), (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
145. Stephens, Williams. O, *Stoic Ethics*, Internet Encyclopaedia of Philosophy, Creighton University Press, USA
146. Stocker, Michael, (1997), "The Schizophrenia of Modern Ethical Theories", (ed.), Crisp, Roger, & Slote, Michael, *Virtue Ethics*, Oxford University press,

New York

147. Stocker, Michael, (Aug. 12, 1976), “The Schizophrenia of Modern Ethical Theories”, *The Journal of Philosophy*, Vol. 73. No.14, , pp. 453-466
148. Stocker, Michael. (1997), “Emotional Identification, Closeness and Size: Some Contributions to Virtue Ethics”, Stateman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
149. Swanton, Christine, (2003), *Virtue Ethics A Pluralistic View*, Oxford University Press, New York
150. Swanton, Christine, (2007), “A Virtue Ethical Account of Right Action”, (ed.), Landau, Russ, Shafer, *Ethical Theory: An Anthology*, Blackwell Publishing, USA
151. Swanton, Christine. (1997), “Virtue Ethics and Satisficing Rationality”, Statman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
152. Taylor, Jacqueline, (2002), “Hume on the Standard of Virtue”, *The Journal of Ethics*, Vol. 6, No. 1, pp. 43-62
153. Taylor, Richard.(2007), “Determinism and the Theory of Agency”, Shafer-Landau, Russ. (ed.) *Ethical Theory: An Anthology*, Blackwell Publishing Ltd, USA
154. *The Counter-Enlightenment*, webmaster@press,princeton,edu
155. Trianosky, Gregory, Velazco. Y. (1997) “What is Virtue Ethics All About?”, Statman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh
156. Trianosky, Gregory, W. (Jan, 1988), “ Rightly Ordered Appetites: How to Live Morally and Live Well”, *American Philosophical Quarterly*, Vol. 25, No. 1, pp. 1-12
157. Trianosky, Gregory. Velazco. Y. (Oct, 1990), “ What is Virtue Ethics All About?”, *American Philosophical Quarterly*, Vol. 27, No. 4, pp.335-344
158. Velleman, David, J. (January 1999), “Love as a Moral Emotion”, *Ethics*, Vol-

109. No-2, pp-338-374

159. Vivekananda, Swami, (1964), *The Complete Works*, Advaita Ashrama, Calcutta, Vol-1

160. Wall, Thomas, F, (2003) *Thinking Critically About Moral Problems,* Thomson Wadsworth, Canada

161. Wallace, James.D. (1978), *Virtue and Vices*, Cornell University Press, Ithaca

162. Watson, Gary.(1997), "On the Primary of Character", Statman, Daniel. (ed.) *Virtue Ethics*, Edinburgh University Press, Edinburgh

163. Westermarck, Edward, (1932), *Ethical Relativity*, New York, Harcourt Brace and Co

164. Whisner, William, (Oct-2003) "A New Theory of Emotion: Moral Reasoning and Emotion", *Philosophia,* Vol.31, NOS. 1-2, pp.4-30

165. Williams, Barnard. (1973), *Problems of the Self: Philosophical Papers 1956-1972*, Cambridge University Press, Cambridge

166. Williams, Barnard. (1979), *Internal and External reason*, (ed.) Harrison, Ross, *Rational Action*, Cambridge University Press, Cambridge, New York

167. Williams, Bernard, (1997), "Morality, the Peculiar Institution", (ed.), Crisp, Roger, & Slote, Michael, *Virtue Ethics*, Oxford University press, New York

168. Williams, Bernard, (2006), *Ethics and the Limits of Philosophy*, Routledge, New York

169. Williams, Gardner, (June, 24, 1943), "Universality and Individuality in Ethics", *The Journal of Philosophy*, Vol. 40, No. 13, pp. 348-356

170. Wolf, Susan. (1988) "Sanity and the Metaphysics of Responsibility", (ed.) Laudan, Russ Shafer, Ethical Theory, Blackwell Publisher